জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বাংলাদেশের
মাটিতে, নয়তো আকাশে-বাতাসে —পঞ্চভূতে
মিশে আছে। তার হৃদয়টা বাংলাদেশের
বাঙালী হৃদয়ে মিশে থাক।
বাংলার মুনীর চৌধুরী, আর মোফাজ্জলকে যে
পাওয়াই গেল না। অনেক সাংবাদিক সাহিত্যিকের লাশও
তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের পেতে হলে সারা
বাংলাদেশের মাটি চষতে হতো।
নদীতে তো লাশ এক জায়গায় থাকে না।
তাঁদের কংকাল কি তাহলে নদীমাতৃক বাংলাদেশ
ছেড়ে নীল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে?
অসীম নীল আকাশের নীচে নীল জলে তলিয়ে গেছে?
এই কি নীল নক্‌শার পরিণতি?


ISBN 984 05 01 09 7
9 879840 501097

একাত্তরের স্মৃতি
বাসন্তী গুহঠাকুরতা



একাত্তরের স্মৃতি

বাসন্তী গুহঠাকুরতা

ইউ পি এল–এর বই

একাত্তরের স্মৃতি

বাসন্তী গুহঠাকুরতা (জ. ১৯২২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শহীদ অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী, পেশায় শিক্ষিকা, ঢাকার গেণ্ডারিয়ার মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়টির উন্নয়ন ও বর্ধনের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিতা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সমাজকর্মে নিজস্ব আগ্রহ ও অবদান তাঁকে বিশিষ্টতা দান করলেও, বন্ধুপ্রিয় মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধির ছাত্রবৎসল তুখোড় অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার যোগ্য সহধর্মিনী হিসেবে সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে কারো বৌদি, কারো দিদি হিসেবে ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে ওঠেন।

তাঁর স্বামী লেখার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলনের কারণে বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমে প্রায় বর্জিত ছিলেন বলেই বাসন্তী গুহঠাকুরতা বিবাহিত জীবনে লেখালিখি ত্যাগ করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে স্বামী তাঁকে একান্ত অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ইতিহাস লেখেন।

স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূরণের অভিলাষে তাঁর এ বই লেখা।

লেখিকা প্রত্যক্ষ করেছেন পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাত, স্বামীর মৃত্যু। পরবর্তী ন'মাস লড়াই করেছেন বেঁচে থাকতে এবং একমাত্র কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে। নিজ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সেই বন্ধুর সময়ে অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু শুনেছেন। আপন অভিজ্ঞতার সেই কথকতা জীবন সায়াহ্নে নৈবেদ্য করে তুলে দিয়েছেন এ–বইতে, আগামী প্রজন্মের কাছে।

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বা. এ.
পোস্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৯৫৬ ৫৪৪৩
E-mail: upl@bttb.net.bd, upl@bangla.net
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ১৯৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৫

প্রচ্ছদ
হাবিবুর রহমান

ISBN 984 05 0109 7

শিল্পী হাশেম খানের 'পূর্ববঙ্গের গীতিকা' চিত্র অবলম্বনে পুস্তানী অলঙ্করণ করেছে সামারুখ মহিউদ্দিন (বয়স ১১ বৎসর)

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। টাইপ সেটিং: ডেস্কটপ কম্পিউটিং কোম্পানী, শান্তিনগর, ঢাকা। মুদ্রণ: দি লেমিনেটরস, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।
Ekattarer Smriti by Basanti Guhathakurta, published by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C.A., Dhaka 1000, Bangladesh.





শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

যিনি একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে

আমাকে বলেছিলেন

স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে

আজ তাঁর ও মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের স্মরণে

বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তুলে দিলাম

কিছুকথা

সম্পূর্ণ রচনাটি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের কালো রাতে একজন পাকিস্তানী সেনা অফিসার সদল বলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামী জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাসার সামনেই গুলী করে এবং তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে যায়। জ্যোতির্ময় তখনই মারা যাননি। তাঁর ঘাড়ে গুলী করা হয়। সর্বাংগ অবশ হয়ে শুধুমাত্র কথা বলার মতো ক্ষীণ শক্তি নিয়ে মৃত্যু শয্যায় তিনি আরো কয়েক দিন শায়িত থেকে ৩০শে মার্চ তারিখে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যু শয্যায় আমার প্রতি তাঁর একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল আমি যেন ইতিহাস লিখি। আমি তাঁকে কথা দিতে পারিনি, কখনোও যে তাঁর কথা রাখতে পারবো, তাও ভাবিনি।

ঘটনার আঠার বছর পরে সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক আবুল হাসনাত আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখিয়ে ছাড়লেন। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় ডঃ এ এফ সালাহ্উদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ওরাল হিষ্ট্রি প্রজেক্টে কাজ করে স্মৃতিচারণমূলক রচনা লেখায় নিজের উপর কিছুটা আস্থা এসেছে, অপর দিকে হাসনাতের পুনঃপুনঃ তাগিদে, ডাইরী দেখে ছক কেটে কেটে পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার মতো করে লিখতে থাকলাম। নিজের লেখার ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা ছিল না, কিন্তু পাঠকরা লেখাটি গ্রহণ করলেন। কেউ চিঠি লিখে, কেউ দেখা করে আমাকে লিখে যেতে উৎসাহ দিতে থাকলেন। মীরপুরের অনুপমা শেখ, যাঁর জন্ম ১৯৭১-এর আগষ্ট মাসে, দৈনিক সংবাদের পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানাতে খোলাচিঠি দিয়ে আমাকে এমনই অনুপ্রেরণা দিলেন যে, মনে হলো লেখাটা শেষ করা আমার কর্তব্য।

আরো উৎসাহ পেলাম, ঐ সময় ইউপিএল থেকে মহিউদ্দিন আহমেদ সাহেব যখন চিঠি লিখে জানালেন, লেখাটি শেষ হলেই আমি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, তিনি এই লেখা বই করে ছাপতে প্রস্তুত আছেন। আমার শুভার্থীরা বললেন, এবং আমিও জানি, বাংলাদেশে প্রকাশকরা সচরাচর এধরনের আগাম প্রতিশ্রুতি দেন না, তাছাড়া ইউপিএল খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এরপর লেখা না চালিয়ে যাবার আর অজুহাত থাকলো না।

যখন লিখছি তখন অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, যাঁর যাঁর মতো সাহায্যও করেছেন। আমার প্রাক্তন ছাত্রী নিলুফারের স্বামী ব্রিষ্টলের ডাক্তার শওকত আলী, লণ্ডনের বন্ধু বেবীর (রাজিয়া) স্বামী ডাঃ আবদুল ওয়াহাব দু'জনে দু'খানা পার্কার কলম উপহার দিলেন। সুরাইয়া হাকিমদের গুলশানের বন্ধু মশিয়ুর রহমান, যিনি একাত্তরে আমাকেও প্রচুর সাহায্য করেছেন, সংবাদে রচনা প্রকাশিত হলেই সেটা নিয়ে সুরাইয়াদের বাসায় হাজির হতেন এবং সবাইকে নিয়ে পাঠ করতেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মূর্তজার স্ত্রী পলা আমাকে লেখার শেষ পর্বে সাহায্য করেছেন। আমার প্রতিবেশী ওমর হায়াৎ (মনুভাই) যিনি মীরপুরের নিধনযজ্ঞস্থলের বর্ণনা দিয়েছেন, বলতে গেলে ঘটনাটি আমি তাঁর চোখেই দেখেছি, তাঁর অনুভবেই আমি অনুভব করেছি।

আর সুরাইয়া হাকিমের কথা কি বলবো! শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্যে আমাকে ও আমার মেয়েকে বারবার আস্তানা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমাদের জন্যে আশ্রয়দাতারা শুধু নিজেদের ওপর ঝুঁকি নেননি, আমাদের ভালোমন্দের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকতেন। সুরাইয়ার বাসায় আমাকে আশ্রয় নিতে হয়নি, কিন্তু বিপদে আপদে তিনি ও তাঁর স্বামী এস এ হাকিমকে সবসময় শেষ ভরসাস্থল জেনে এসেছি। ঐ দুর্দিনে একমাত্র সুরাইয়ার কাছেই নিজেকে হাল্কা করতে পারতাম। ডাঃ ওয়াহিদ, প্রয়াত আব্দুল গনি হাজারী ও তাঁর স্ত্রী জেলীর কাছেও ঋণের কি শেষ আছে? আরো কতজনের কাছেই যে আমি ঋণী! বইটিতে তাঁদের অনেকের কথা আছে।

এই বই প্রকাশের লগ্নে আমার ঐ সব পরম সুহৃদ এবং শুভার্থীকে অশেষ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। দুঃখ হয়, মশিয়ুর রহমান সাহেব লেখা শেষ হবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মারা গেলেন, বইটি তাঁর দেখা হলো না।

বই প্রকাশের সময় আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইউ পি এল–এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদকে। ওঁর স্ত্রী, এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা মেহতাব খানম (মলি), গেণ্ডারিয়া মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী ছিল। একেও এক কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়।

কল্যাণীয় বদিউদ্দিন নাজির অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পাণ্ডুলিপিটির আগাগোড়া পরিমার্জনা ও সংশোধন করেছেন। প্রচুর খাটতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু বইতে যাঁদের কথা লিখেছি তাঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থাকায় তিনি কখনো এই কাজকে পরিশ্রম মনে করেননি। আর আমাকেও বইটি নিয়ে একটুও দুঃশ্চিন্তা করতে দেননি। তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং আশীর্বাদ জানাই।

আমার মেয়ে দোলা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়ায়, পি এইচ ডি – টাও সেরে নিয়েছে। বইটির চূড়ান্ত প্রুফ সে সংশোধন করে দিয়েছে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে। তারও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জ্যোতির্ময় আমাকে ইতিহাস লিখতে বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস লেখার সামর্থ আমার কোথায়। আমি লিখে গেলাম ন'মাসের কাহিনী, তাও তার সর্বাংশ জুড়ে আমারই অভিজ্ঞতার কথা। জ্যোতির্ময়ের শেষ অনুরোধ আমি পালন করতে পারলাম কী? পাঠকেরা বিচার করবেন।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ বাসন্তী গুহঠাকুরতা

আমার চেতনায় "পঁচিশ" মানেই একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাত আর "একুশ" মানেই বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা শহীদদের স্মৃতির মিনার, যদিও বছরের বারটি মাসেই এ তারিখ দুটো আসে। সেই একাত্তরের স্বাধীনতা দিবস আমি স্মরণ করছি আঠার বছর পরে। যা দেখেছি নিজের চোখে, যা শুনেছি নিজের কানে, তাই লিখতে চেষ্টা করছি। ছাব্বিশ আমাদের বাঙালীর স্বাধীনতা দিবস, কিন্তু সে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো আমার দুয়ারে পঁচিশে মার্চের রাত বারটার পরেই। পঁচিশে মার্চের শেষ বসন্তের কোকিল ডাকা ভোরে শিশির ভেজা হাওয়ায় শহীদ মিনারের পাশের চত্বরের সুউচ্চ বৃক্ষরাজির ফাঁক দিয়ে যখন লাল সূর্য দেখা দিল, তখন কি ভেবেছি এই "রক্তসূর্য" আমাদের পতাকা হবে।

পঁচিশের সকালে প্রথমেই আমরা দু'জনে আমাদের বাগানে গেলাম। ফুল গাছগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাগানের গেটে হলের ছেলেরা কাগজের পতাকা দুটো লাগিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা উঠে এলাম। আমার স্বামীর হাতে কাঁচি ছিল, মরা ফুল কাটার জন্যে। বারান্দায় একটা আগুনি ডালিয়ার টব ছিল, তাতে তিনটা ফুল তিন সাইজের। যে ফুলটা ম্লান হয়ে আসছে, সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে জ্যোতির্ময় হেসে বললো, "দিলাম বড় ফুলটা কেটে তোমারটাই না আমারটা কাটলাম, কে জানে। তুমিই বড়, না আমি বড় কে জানে! ছোটটি 'দোলার', মাঝারিটি তুমি বা আমি।"

চা খেতে বসবো এমন সময় আমার মেয়ে হাসতে হাসতে এলো। লজ্জিত হয়ে বললো, "মা আমি আবারও আজ রাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।" আমি বললাম, "তুই স্বপ্ন বিশারদ হয়ে গেছিস। কী দেখলি?" বলে, "মা ঘুম থেকে উঠে আমি যেই ট্র্যানজিস্টারের নব ঘুরিয়েছি ঢাকা রেডিওতে শাহনাজ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে — তারপর কলকাতা ধরেছি তো সন্ধ্যা সে গানটাই গাইছে। আমি বারবার নব ঘুরাচ্ছি, যখন শাহনাজ থেমে যায় তখন সন্ধ্যা চালিয়ে নেয়, সন্ধ্যা থেমে গেলে শাহনাজ গেয়ে যায়।"

আমার স্বামী বললে, "যা। তা হলে তো দেশ স্বাধীন করেই দিলি।" পত্রিকা দুটো এলেই বাপ-মেয়েতে কাড়াকাড়ি। "ব্যানার" কোন পত্রিকায় কেমন হবে তাই নিয়ে। আগের রাতে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনে ওরা বাজি ধরতো–কার কথা ঠিক হয়।

পত্রিকা পড়া শেষ করে জ্যোতির্ময় লম্বা বারান্দায় পায়চারী করে, আর বলে, "পত্রিকায় বলে সমঝোতা হচ্ছে, হবে। কিন্তু আমার পলিটিক্স–এর বিদ্যায় তো বলে না। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যত মিছিল যায় তারাতো সমঝোতায় কথাই বলে না। তবে কি হবে?" ফোন করলো আব্দুল গণি হাজারীকে, "তোমার কি মনে হয়?" ফোন করলো রাজিয়া খান আমীনকে, "তোমার শ্বশুর কি বলেন?" ফোন করে আরো কয়েক জনকে। তেইশ-চব্বিশ তারিখে যাদের বাড়ি গেছে, দেখেছে তারা কাপড়ের ফ্ল্যাগ তৈরি করছে। তারপর আবার পায়চারী করছে আর গুনগুন করে গাইছে, "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।" কখনও আমি বলছি, "সেই যে সরস্বতী পুজার অনুষ্ঠানে মৃন্ময়কে তোমার প্রিয় গান গাইতে বললে, সেই থেকে গুনগুন করেই গাচ্ছো।" এ কথায় কিন্তু সে রাগলো না। বরং বললো, "কি করবো? করার কিছু নেই। এখন আবু সাঈদ চৌধুরী দেশে নেই, সহপাঠী বন্ধু একটা দায়িত্ব দিয়েছে। 'না' বলতে পারলাম না। এ অবস্থায় রিজাইন দিতে পারিনে, অমনিই তাহলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে। তুমি তো সামনেই ছিলে, যাবার আগে কত সাবধান করে দিয়ে গেলেন। ভিসি ফিরে এলেই এবার রিজাইন দেবো, যদি ভাগ্যে থাকে।" আমি বলি, "কি সব বাজে ভাবছো? খাতা দেখতে বসো। গোপালকে বাজারে পাঠাই।"

গোপাল অনেক কিছু বাজার করে আনলো। ছাব্বিশ তারিখে রাতে বা দিনে নব-বিবাহিত হিমাংশু বৌ নিয়ে খেতে আসবে। তাই আয়োজন ভালই হলো। বাজার এলে জ্যোতির্ময় রান্না ঘরের পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি কি মাছ এনেছ?" আমি নামগুলো বললাম। শুনেই চটে গেলো, ভুলেই গেছে যে কাল হিমাংশুরা খাবে। বললো, "সব মাছ এসেছে। কিন্তু ইলিশ মাছ আসেনি – আমি যে ভালোবাসি, তাই।" এক পাক ঘুরে এসেই বললো, "দাদু বলতেন, ধন্যরে তুই মাছের মধ্যে ইলশা, পদ্মা মেঘনার গভীর জলে তোর বাসা" –সেই ইলিশ মাছই আমার ভাগ্যে ঘটে না।" তখন আমি গোপালকে ইশারা করলাম। গোপাল গাড়ি বের করলো। আমরা তাকে না জানিয়েই পলাশীর বাজারে গেলাম। সেখানে ইলিশ পাওয়া গেল না। সেখান থেকে নিউমার্কেটে গিয়ে একটা ইলিশ নিয়ে এলাম। এর আগে কখনও আমি মাছের বাজারে যাইনি। যাই হোক ভাপে ইলিশ রান্না হলো। বেলা বারটার দিকে আমাদের আর্টিষ্ট বন্ধু বজলে মওলা এলেন গেণ্ডারিয়া থেকে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম, "কি! আপনে আহেন, না যান?" তিনি হেসে জবাব দিলেন, "আমি আসছি সবার খোঁজ নিতে।" আমি তাকে বললাম, "আমাদের সঙ্গে দুপুরে খেয়ে যাবেন।" তিনি একবাক্যে রাজী।

আজ আঠার বছর পরে আমার মনে পড়ছে না কি কি রান্না হয়েছিল। শুধু মনে আছে "ইলিশ মাছ ভাপে।" জ্যোতির্ময়ের রাগ বোধহয় কমেনি। তাই খেতে খেতে বললো, "জানেন মণ্ডলা সাহেব, এ বাড়িতে আমি যা ভালোবাসি তা রান্না হয় না।" আমি তখন মণ্ডলা সাহেবকে ভাপে মাছটার ঢাকনা তুলে দেখালাম। তিনি মুচকি হাসলেন। যখন ইলিশ মাছ দিলাম দু'টুকরা করে জ্যোতির্ময় বোধহয় অপ্রস্তুত হয়েছে। একটু থেমেই বললো, "দেখুন মণ্ডলা স্যার, রাগ করেছি বলেই মাছটা পেলাম।"

সবাই আনন্দে খেলাম, কথা বাড়ালাম না। খাবার পরে তো ড্রইং রুমে বেশ জমলো – এদিক সেদিকের গল্প। আমি বললাম, "আজ মণ্ডলা সাহেবের ডিউটি, টাই বাঁধার।" বিলেতে সাড়ে তিন বছরেও জ্যোতির্ময় টাই বাঁধা শেখেনি বা শিখতে চেষ্টা করেনি। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অভাব ছিল না। তারাই রবিবারে সব টাই বেঁধে দিতো। যে কজন আসতো সবাই রাতে খেয়ে যে যার আস্তানায় যেত। দোলা কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিল না। হঠাৎ বললো, "জানেন মণ্ডলা স্যার। আমি কেমন মজার মজার স্বপ্ন দেখি।" ওর প্রথম স্বপ্ন সতের–আঠার তারিখে, "আমার মামাবাড়ি ফতুল্লায় বোমা পড়ে মশারি ছিদ্রি হয়ে গেছে।" একটা হাসির রোল উঠলো। দোলা আবার বললো, "এই তো বাইশ–তেইশ তারিখে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমরা সবাই এক জেলে আছি।" মণ্ডলা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কে?' দোলা বলে চলল, "বাবা, মা, আমি, জ্যেঠু (মানে সন্তোষ ভট্টাচার্য), মানি (তাঁর স্ত্রী), বুলু দি (তাদের মেয়ে), আরো অনেকে – শেখ মুজিব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো। আর ইন্দিরা গান্ধীও। তিনি আবার হুইল চেয়ারে।" মণ্ডলা সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি তো সবাইকে জেলে ঢুকিয়েছো।"

তখন জ্যোতির্ময় গম্ভীর হয়ে বলছে, "ওদের বলছি গেণ্ডারিয়ায় বাসন্তীর কোয়ার্টারে চলে যেতে। সবাই আমাকে সাত দিন দূরে থাকতে বলছে। আমি হলের প্রভোষ্ট। আমি কি করে ছাত্রদের ফেলে যাবো? ওদের জন্যেই তো এ কোয়ার্টার আমাকে দিয়েছে, ফোন দিয়েছে। আমি জানি কিছু হলে আমাকেই আগে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাবে।" একটু থেমেই জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলে তোরা কি করবি?" আমি বললাম যে তাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। জ্যোতির্ময় দোলাকে বললো, "তোরা তোর মামার কাছে কলকাতায় চলে যাস।" দোলা বললো, "কলকাতায় বেড়াতে যেতে ভালো লাগে, কিন্তু থাকতে ভালো লাগে না।" তখন জ্যোতির্ময় আমার উপরেই রেগে যেন বললো, "তোর মাকে তো Miss A. G Stock লণ্ডনে থেকে যেতেই বলেছিলেন। এতদিনে একটা বাড়িও হয়ে যেতো।" আমার মেয়ে বললো, "আমরা তিন জনে একখানেই থাকবো।"

কথাবার্তা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে – গোপাল বিকেলের চা–টা নিয়ে এলো। এদিকে আমার দোতলায় ডঃ আনিসুর রহমানের ঘরে গানের রিহার্সেল চলছে। কে যেন গান লিখেছে, "আমরা বীর বাঙালী।" কে যে সুর দিয়েছেন জানিনে। কয়েকদিন ধরে কিছু ছেলে মেয়ে

বিকেলে আসে, গান শেখে। গানটা নাকি পয়লা বৈশাখে কোথায় যেন গাওয়া হবে। "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা"র সুর। তাই আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। পদের সঙ্গে ভাব ও সুরের মিল হয় না বলে। প্রয়াত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান সেখানে খোল বাজাতেন।

আমাদের আসর শেষ হলো, ওদের গানের পালাও সাঙ্গ। ওরা H.M.V-র গাড়িতে চলে গেল। মণ্ডলা সাহেবকে এগিয়ে দিতে আমরা গেট পর্যন্ত এলাম। তখন জ্যোতির্ময় অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেবের দোতলা বাসার পূব দিক থেকে আওয়ামী লীগের সিটি সেক্রেটারী চলে যাচ্ছিলেন। জ্যোতির্ময় তাঁকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনিও কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। আর ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছিল চলছে, অনবরত আর শ্লোগান দিচ্ছে "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

আমরা জগন্নাথ হলের পূব দিকের গেট – আমাদের গেটের বিপরীতে – দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্যারেড দেখতে গেলাম। হলের ছেলেরাই শেখাচ্ছে। বয়স্ক রামবিহারী দাসকে প্রভোষ্ট জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বললো, "এবার যদি তোমার পেটের ব্যথা ঠিক হয়।" সবাই হেসে উঠলো। তারপর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে হলের ভাষা শহীদ মিনারের কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন। "যারা পারো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে চলে যাও। তোমরা যারা চলে গিয়েছিলে, তারা কেন ২৩ তারিখে আবার এলে? তোমাদের তো আমি আইনত হল ছাড়তে বলতে পারি না। যারা রাতে থাকবে, খুব সজাগ থাকবে। শব্দ শুনে যেন পালাতে পারো। ছ'ফুট লম্বা মৃণালকান্তি বোস অর্থনীতিতে এম, এ পাস করে শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে (পুরানো রেডিও অফিস) পড়ায়, সে এই হলেই থাকে। তাকে বললো, "কই তুমি বিমানের পাইলট হতে চেষ্টা করলে না?" সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলে আমরা বাসায় এলাম।

এসে দেখি বনোজ বসে অভিধানের কাজ করছে। ছেলেটি ইংরেজীতে এম, এ পাস করে হলের টিনের ঘরে থাকে, একটা চৌকি কিনে নিয়েছে। জ্যোতির্ময় আবদুল গণি হাজারীকে বলে "অবজারভার" পত্রিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ইংরাজী-বাংলা অভিধান সংশোধন করতে সে সাহায্য করতো। কাজের পর খেয়ে চলে যেতো। সেদিন কাজ আর অগ্রসর হলো না, কি হচ্ছে কি হবে'র আলোচনাই বেশি হলো। আমি বাগানের আলো জ্বালিয়ে পাইপ দিয়ে বাগানে রাত নয়টা পর্যন্ত জল দিলাম। মিসেস মনিরুজ্জামান তেতলা থেকে দেখছিলেন। এবার বনোজকে নিয়ে খাওয়া। আবারও টেবিলে সেই পদ্মার ইলিশ ভাপে। দশটায় বনোজ হলে চলে গেল, গেটের তালা বন্ধ হলো। সেদিন সন্ধ্যায় খবরাখবর নিয়ে কেউ আর এলো না। সেই "যশোরের পাগলা কাশেম তো আর এলোনা," জ্যোতির্ময় বললো, সে খবর দিয়ে গিয়েছিল দিন সাতেকের জন্যে এখান থেকে সরে যান। ক্যান্টনমেন্টে চাইনিজ ট্রুপ প্যারাশুটে নামছে। গুহঠাকুরতা বলেছিল, "তুমি কি নিজের চোখে দেখেছ? কোথায় শুনলে? তুমি কি স্পাই?" কাশেম ব্যর্থ হয়ে মনে দুঃখ নিয়ে চলে গিয়েছিল।

রাত দশটার দিকে খবর শোনার পর জ্যোতির্ময় অনার্স বা এম, এ প্রথম পার্টের খাতা দেখতে বসলো। মাঝে মধ্যে বিদেশী খবর ধরতে চেষ্টা করলো। রাত সাড়ে দশটায় মোড়ের মাথায় – শহীদ মিনার, জগন্নাথ হল, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও আমার ৩৪ নম্বর তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ির (৪র্থ তলা অসম্পূর্ণ) মোড়ে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ হতে লাগলো। জ্যোতির্ময় বেরিয়ে গেল ওদের কাছে মোড়ের মাথায়। আমিও আমাদের নীচু দেয়াল ধরে ইটের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ছেলেরা খালি জলের ট্যাংকগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে মোড়ের এক মাথায়। তারপর কোথা থেকে সব ইঁট এনে তার ভেতরে ফেলছে। এভাবে ফুলার রোড (শহীদ সরণী) বন্ধ করা হচ্ছে। অনেকে বটগাছের মোটা ডালই কেটে ফেলছে, অনেক জোয়ান ছেলে মিলে টেনে সেই ডাল আমাদের বকশী বাজার রোড ক্রসিংয়ে টেনে আনলো। কী তাদের জোর। যেন দৈত্য দানব। গুহঠাকুরতা জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা এসব কী করছো? কেন করছো?" ওরা বললো, "ব্যারিকেড দিচ্ছি স্যার। বিহারী বাঙালী যত গাড়ি যাবে, সব চেক করার অর্ডার আছে।" কে অর্ডার দিয়েছে কেউ নির্দিষ্ট করে কাউকে বলতে পারে না। জ্যোতির্ময় ঘরে ফিরে গোপালকে ডেকে বললো, "রাতটা সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে। তুমি একটু চারদিক ঘুরে দেখে এসো, আর আসার পথে এক প্যাকেট ক্যাপস্ট্যান সিগারেট কিনে আনবে। আজ রাতে ঘুমানো যাবে না।" আমরা কিন্তু তখনও জানিনে ভুট্টো চলে গেছে হোটেল ছেড়ে। গোপাল দেয়ালের ফাঁক দিয়ে (যেখানে একটা পূর্বাঞ্চলীয় বিরাট গাছ ছিল) চলে গেল হাইকোর্ট পর্যন্ত। এসে বললো, "রমনা পার্ক শান্ত, কার্জন হল নিশ্চুপ। তবে মুজিব বাহিনী বেরিয়ে গেছে।" গোপাল এসেই সিগারেটের প্যাকেটটা দাদা বাবুর খাতা দেখার টেবিলে রেখে দিলো। আমি বললাম, "মুজিব বাহিনী কোথায় দেখলে? কেমন তাদের পোশাক?" গোপাল বর্ণনা দিলো – প্রত্যেকের হাতে একটা বাঁশের লাঠি, মাথায় গোল সবুজ টুপী। পরনে জামা কাপড় যার যেমন। আমি হাইকোর্ট পর্যন্ত গেছিলাম। সাইর ধইরা দাঁড়াইয়া গেছে। মেডিক্যালের কাছে কিছু না। সিগারেটের দোকান খোলা।" প্রভোষ্ট তখনই আবার বেরিয়ে গিয়ে জগন্নাথ হলের পূর্ব দিকের গেটের বাইরে থেকে তিন চারজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে উপদেশ দিয়ে এসেই বললো, "অবস্থা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, আমাদের গেটে আজ তালা দেবো।"

এ বাড়িতে দশ মাস হলো এসেছি, গেটে তো কখনও তালা দেখিনি, দারোয়ানও দেখিনি। তবে চারতলার কাজ হচ্ছিল, তাই কন্ট্রাক্টরের একজন বুড়ো দারোয়ান গেটের কোথায় খুপরি বানিয়ে থাকতো। তাকে সজাগ থাকতে বলা হলো। ঘরে এসে কুকুরের শিকল ও তালা নিয়ে গেটে তালা লাগানো হলো। আমি ভাবলাম হায়রে! আমাদের কুকুর টমি স্কুলে রয়ে গেছে, আমরা তার শিকল দিয়ে আমাদের গেট সুরক্ষিত করছি।

রাত এগারটার দিকে দোলা ঘুমাতে গেল। ওর বাবা ওর ঘরেই টেবিলে খাতায় মনোনিবেশ করলো। তার আগে স্বর্ণকে বললো, "এক ফ্লাস্ক চা করে দিয়ে শুতে যাও স্বর্ণ।

আজ সারা রাত খাতা দেখবো আর চা খাবো।" স্বর্ণ চা করে বিস্কিট দিয়ে শুতে গেল। আমিও পাশের ঘরে শুতে যাওয়ার আগে দু'ঘরের কাচের জানালা ও নোটের জানালা সব বন্ধ করে দিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে, সাড়ে বারটা – একটার দিকে গোলাগুলির শব্দে উঠে গেলাম। বললাম, "যুদ্ধ কি লেগেই গেল?" আমার স্বামী বললো, "ও কিছু নয় –ছেলেরা প্রাকটিস করছে। শব্দ ক্রমেই কাছে, খুব কাছে এগিয়ে এল। তখন দোলাকে আমার ঘরের বিছানায় নিয়ে এলাম। ওর ঘরের বাতি নিবিয়ে দিলাম, সবুজ বাতিটা জ্বলতে থাকলো। একটু পরেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হতে থাকলো। সে কী শব্দ! আমাদের বাড়িটা কেঁপে কেঁপে ভূমিকম্পের মতো ঝন–ঝন কাচের শব্দ হতে থাকলো। স্বর্ণকে আমাদের ঘরে আসতে বলে আমরা তিনজনে খাটের তলায় বেডকভার বিছিয়ে মাথা পেতে থাকলাম। স্বর্ণ এলো না। বলে, "মরি, মরুম, আমার ঘরেই মরুম।" গোপালকেও ডাকা হয়েছিল। কেউ এলো না। দোলার বাবা বললো, "বুঝলি দোলা, যুদ্ধ লেগে গেল। যুদ্ধ হলে এরকম করে ট্রেঞ্চে শুয়ে থাকতে হবে। খাওয়া, শোওয়া, পায়খানা – সব এক জায়গায়।" এতো সাধারণ গোলাগুলি না! অনেক ভারী শব্দ। জগন্নাথ হলের আকাশ আলো হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, আর ভারী মেশিন গানের গুলীতে 'হল' তোলপাড়। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ নেই; হবেই বা কোত্থেকে, কামানের শব্দে সব মানুষ, পাখির শব্দ ডুবে গেছে। মাঝে মধ্যে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জগন্নাথ হলের মালীদের গরুগুলো অসহায় চিৎকার করছে। এ এলাকায় বৃক্ষরাজির সব কাক উঠে কোথায় যে গেল! আমি খাটের নীচে ছটফট করছি, উঠে একটু চুপি দিয়ে দেখতে চাই। আমাকে বাপ–মেয়ে ধরে রাখছে। গোলাগুলি একটু নিস্তেজ হলে আমি সাপের শিসের মতো 'হিস্‌হিস্‌' শব্দ শুনেই লাফিয়ে উঠলাম। ওরা আমাকে আটকাতে পারলো না। এক লাফে আমি গেটের দিকের জানালা দিয়ে পর্দা চোখের সমান করে ফাঁক করে চুপি দিলাম। আমার স্বামী হাত টেনে ধরে বলছে, "মাথা নীচু কর, গুলী লাগবে।" আমি দেখলাম জীপসহ একটা মিলিটারী গাড়ির বহর রোকেয়া হলের দিক থেকে আস্তে আস্তে এসে মোড়ের ব্যারিকেডে থেমে গেল। একটা অফিসার আমাদের গেটের শিকলটা এক টানে ছিঁড়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানগুলি বন্যার স্রোতের বেগে ৩৪ নম্বর বিল্ডিংয়ের সব তালায় উঠে গেল। আর প্রত্যেক তালায় দু'টি ফ্ল্যাটের চারটি দরজায় দুড়ুম দাড়ুম লাথি মারতে লাগলো। সে শব্দের কি গতি! গোলাগুলির শব্দে কান বধির হয়ে গেল যেন। এদিকে অফিসারটা গেটের কাছে আমার মেয়ের ঘরের জানালার কাচ ভেঙে, বেয়োনেট দিয়ে জানালার জাল কেটে পর্দা ফাঁক করে দেখলো। মেয়ের ঘরে সবুজ বাতি জ্বলছিল, আর দক্ষিণের বাগানে আলো জ্বালা ছিল – কোন ঘর পুরো অন্ধকার হয়নি। তাই আমাদের মাথা খাটের তলায় থাকলেও পা দেখা যাচ্ছিল। যেই না পা দেখলো, অমনি দৌড়ে পশ্চিম দিক দিয়ে আমার বাগানের মধ্যে হাজির। ব্যাপারটা মুহূর্তের। আমি আলনা থেকে পাঞ্জাবী নিয়ে

আমার স্বামীকে দিয়ে বললাম, "তোমাকে arrest করতে এসেছে, তৈরী হয়ে নাও।" আমাদের দু'জনের ধারণা তাকেই যেন ওরা চায়। সে বললো, "দোলাকে ড্রইং রুমে শুইয়ে দাও।" গোপাল গ্যারাজের দোতলার ঘর থেকে আমাকে দরজা খুলতে মানা করছিল – কিন্তু না খুলে পারলাম না, দোলা ড্রইং রুমে বুকে বালিশ চেপে গিয়ে দেখে সেখানেও দরজা ভাঙছে। দৌড়ে বারান্দায় এলো। এদিকে অফিসারটা (?) একটানে রান্না ঘরের দরজা খুলে স্বর্ণকে কনুই দিয়ে এক ধাক্কায় বাগানে ফেলে বারান্দায় ঢুকে পড়লো। আমি সামনে গেলাম। বললো, "প্রফেসর সাহেব হ্যায়?" মিথ্যা বলে লাভ নেই। বললাম, "হ্যায়।" ও বললো, "উনকো লে যায়গা।" আমি ওর হাত ধরে বললাম, "কাহা লে যায়গা, ভাই?" ও আমার দিকে না চেয়ে মাটির দিকে চেয়ে আমাদের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চললো আর টেনে টেনে বললো, "লে যায়গা।" আমি ওর পিছে চলছি, বাড়ি যেন ওর। বললাম, "তুমিই তো ঢুকেছ, ওরা কেন এখনও সামনের দুই দরজা ভাঙছে?" তখন ও নাম ধরে বললো, "হাম ইধার পর হ্যায়। ইয়াকুব ! দরোজ্জা মত ভাঙ্গো।" সঙ্গে সঙ্গে লাথি মারা বন্ধ হয়ে গেল।

আমার শোবার ঘরে যেতে যেতে ও বললো, "আওর কই যোয়ান আদমি হ্যায়?" আমি বললাম, "হামারা একই লাড়কি হ্যায়।" "ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, লাড়কি কো কোউন ডর নেই হ্যায়।" শোবার ঘরে ঢুকে দেখি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পাঞ্জাবী হাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ও তার বাঁ হাতটা চেপে ধরলো, আমি পাঞ্জাবীটা পরিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছে।" মিলিটারী জিজ্ঞেস করলো, "আপ প্রফেসার সাব হ্যায়?" আমার স্বামী ভারী গলায় বললো "Yes" "আপকো লে যায়গা।" জ্যোতির্ময় দৃঢ় ভাবে ভারী গলায় বললো, "Why?" আর কথা নয়, হিড় হিড় করে টেনে পেছনের বাগান দিয়ে নিয়ে গেল। আমি স্যাণ্ডাল জোড়া নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পেলাম না। ফিরে যখন এলাম বারান্দার জালের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম মিসেস মনিরুজ্জামান কয়েক সিঁড়ি ওপরে দাঁড়িয়ে, নীচে ল্যাণ্ডিংয়ে ডঃ মনিরুজ্জামান, তাঁর ছেলে, তাঁর ভাগনে ও আরেকজন ভদ্রলোককে জোয়ানরা প্রাণ ভরে টানাটানি করছে। মিসেস মনিরুজ্জামান বললেন, "দেখছেন দিদি, এরা আমাদের লোকজনদের কী রকম টানাটানি করছে?"

ভদ্র মহিলার সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। তারা তো আমাদের তেতলায় এসেছেন মাত্র মার্চের পাঁচ তারিখে। আমি বললাম, "দিয়ে দেন, আপনার সাহেবকে, নইলে মেরে ফেলবে, আমার সাহেবকে তো নিয়ে গেল ক্যানটনমেন্টে।" এমন সময় বাইরে দু'টা গুলী হলো। আমার মেয়ে দু'কান চেপে ধরলো। অফিসার আবার ফিরে এসে আমার খাবার ঘরের তালা ভাঙতে লাগলো। গডরেজের তালা, আমি খুলে দিলাম। তারপর পর পর তিনটি বাথরুম চেক করলো। দোলার বাথরুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, "মুজিবুর রহমান কাঁহা রতা হ্যায়?" দোলা বললে, We don't know him. অমনি সে এমন জোরে এক ধমক লাগালো–দোলা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মিলিটারীটা আবার বাগান দিয়েই চলে গেল।

আমি যখন মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় তখনই আমাদের সিঁড়িকোঠায় পটপট গুলী হলো আটটা। আমি দৌড়ে জালের দরজায় গিয়ে দেখি লেফট রাইট করে জোয়ানরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ডঃ মনিরুজ্জামান আমার ড্রইং রুমের দরজার পাশে পড়ে আছেন, আর তিনজন ৩৪ বি–এর দরজার পাশে হুমড়ি খেয়ে কোঁকাচ্ছে। রক্তে ভাসাভাসি। মিসেস জামান কেঁদে বলছেন, "কি হলো দিদি? আপনি যে বললেন মারবে না, এখন যে মারলো?" কিই বা জবাব দেবো তাকে? তারা সবাই পানি চাচ্ছে। ডঃ মনিরুজ্জামান গোঙাচ্ছেন।

মিসেস জামান সবাইকে পানি খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় মোড়ের ব্যারিকেড পরিষ্কার হলে সেই মিলিটারী বহর এগারটা ট্রাক জীপ, শহীদ মিনারের দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এত কম সময়ে ওরা কতগুলো বীভৎস কাজ করে গেল। গাড়িগুলি চলে গেলে স্বর্ণ গোপালের ঘর থেকে এসে বললো, "দিদি মনি। দাদাবাবু কই?" বললাম, "এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেছে। তুমি দোলাকে দেখ।" আমি নিশ্চিত তাকে প্রথম গাড়িটাতে নিয়ে গেছে। আবার আমি তারের জালের দরজায় যেতেই মিসেস জামান অনুরোধ করলেন, "দিদি, আমার সাহেবকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যান।" আমি বললাম "শুনছেন না, মাইক দিয়ে ভ্যানে বলে যাচ্ছে কারফিউ?" আমি আবার মেয়ের কাছে গেলাম। এর মধ্যেই মিসেস জামান আবার হাঁকডাক, "ও দিদি, আপনার সাহেবকে তো গুলী করে ফেলে রেখে গেছে বাইরে। আমি পানি খাইয়ে এলাম। তিনি ভাল আছেন, কথা বলছেন। যান, হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বাঁচবেন।" দোলা তখন বললো, "মা আমি শুনেছি, বাবা দোলা বলে ডেকেছেন। তখন মা, মেয়ে, স্বর্ণ বাগান দিয়ে দৌড়ে গেলাম। দেখি বাইরের গেট বরাবর আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে জ্যোতির্ময় পড়ে আছে। আমাদের দেখেই ভারী গলায় বললো, "তোমরা শোননি? আমি যে তোমাদের ডেকেছি?" দোলা বললো, সে শুনেছে।" "আমাকে তো ঘাড়ে ডান দিকে গুলী করেছে, আমার শরীরে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে, আমাকে তুলে ঘরে নাও।"

আমি তো এতক্ষণ শুধু একটাই শব্দ করছিলাম, "হায়, হায়।" তার এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সে আমাকে অনেক আগে একদিন বলেছিল, "আমার যদি প্যারালাইসিস হয়, তবে তোমরা আমাকে গুলী করে মেরো।" আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো; জ্যোতির্ময়ের বাবা প্যারালাইসিসে ভুগে তার ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষার সময় মারা গিয়েছিলেন। সে স্মৃতি তার খুবই মর্মান্তিক ছিল। আমার সে কথা মনে পড়লো। হায়রে। উল্টোটা হলো, গুলী খেয়ে অবশ হয়ে গেল। তার কথাবার্তায় মনে হলো তার যেন স্বাভাবিকভাবে এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমরা তিনজনে তাকে ধরে মাটি থেকে আল্গা করতে পারছিনে। স্বর্ণ গোপালকে ডেকে আনলো। চারজনে অনেক কষ্টে হেঁচড়ে সামনের সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত এনেছি। সেখানে তো রক্তের ঢল, ডঃ জামানের গরম রক্তের উপর দিয়ে যেতে পিছলে যাচ্ছিল পা, কী যে মনে হচ্ছিল তখন। কিন্তু ভাবালুতার সময় এটা নয়। আমাদের কোন দরজা ভাল করে খোলা

যাচ্ছিল না। বারান্দার দরজার পাশে ফিতার খাটিয়াতে কোন রকমে তার রক্তাক্ত শরীরটা রাখলাম। গোপালকে বললাম, "এবার তুমি পুকুর পাড়ে চলে যাও।" গোপাল রান্নাঘর ও গ্যারাজের ফাঁক দিয়ে এক দৌড়ে পুকুর পাড়ে গ্যারেজের পেছনে চলে গেল। তখন আমরা তিনজনে খাটিয়া ঠেলে বাড়ির শেষ মাথায় শোবার ঘরের পাশে রাখলাম। আশেপাশে টহলদার গাড়ি ঘুরছে অনবরত। গাড়ি থেকে খাটিয়ায় শোয়ানো মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে। তখন আবার আমরা অতিকষ্টে তোষক ধরে টেনে তাকে ঘরের মেঝেতে সেখানটাতে শুয়ে দিলাম যেখানে আমাদের পা দেখেছিল মিলিটারীরা। জ্যোতির্ময় বললো, "স্বর্ণ একটু চা দিতে পারো?" চা তো ছিলই তৈরি, ফ্ল্যাস্ক থেকে স্বর্ণ চা দিল। চা খেতে খেতে বললো, "আমাকে হলের দিকে (পশ্চিম) মুখ করে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলো, নাম?" ধর্ম? নাম ও ধর্ম বলার পরই গলায় এদিকে বন্দুক ধরে গুলী করলো, আমি অবশ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর স্বর্ণকে বললো, "আমার পা দুটা বেঁকিয়ে হাঁটু দুটো একসঙ্গে লাগাওতো।" স্বর্ণ যেই তা করলো হাঁটু দুটো দু'পাশে পড়ে গেল। স্নায়ুর বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। তারপর বললো, "হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পা দু'টায় শেক দাও।" স্বর্ণ, তা-ই করতে থাকলো। দোলা তখন কেঁদে বললো, "মা, তুমি আমার হলিক্রসের প্রিন্সিপাল সিষ্টার টেরেসাকে ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স আনাও। হলিফ্যামিলিতে নিয়ে যাবো।" হায়রে ধরে নিয়ে যাবার পরপরই তো আমি স্কুলের দারোয়ান বীরবলকে ফোন করতে চেয়েছিলাম। লাইন আগেই কেটে দিয়েছে। রক্তের পথে তুলা দিয়ে রেখে দিলাম। আমাকে এবার আমার স্বামী বললো, "বাসন্তী, তুমি দেয়াল টপকে দৌড়ে নার্সের কোয়ার্টারে গিয়ে দুজন নার্স নিয়ে এসো।"

"সে কি সম্ভব? মিলিটারী গাড়ি সামনে টহল দিচ্ছে। কার্ফিউ।" আর আমার শক্তিই বা কি আছে! আমার কিছু হলে দোলার কি অবস্থা হবে? আমি সাহস করে দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হতে পারি না। কত অসহায় আমি!

আমরা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে সিঁড়িতে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী, মেয়ে, বোন তারা চারজনকে নিয়ে ব্যস্ত। ডঃ জামান সকলের আগে মিনিট দশেকের মধ্যে চলে গেলেন। অন্য দু'জন কঁকিয়ে কঁকিয়ে নীরব হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ডঃ জামানের বোনের ছেলেটি বেঁচে ছিল, তার মাথায় একটি পাশ বালিশ দিয়ে তারা তেতলায় চলে গেছেন। "পানি পানি" করুণ আবেদন শুনে দোলা স্বর্ণকে পাঠালো পানি দিতে। পানি নিয়ে স্বর্ণ ফিরে এলো। বললো, "নাগো দিদিমণি, আমি এত রক্তের মধ্যে পানি দিতে পারুম না।" তখন দোলা সঙ্গে গেল, স্বর্ণ এক মগ পানি খাওয়ালো। তারপর আর শব্দ শুনিনি। তারপর দোলার বাবা বললো, "বলেছিলাম না ২৬ তারিখে আমাদের বেয়নেট ধরে ক্লাশ করাবে? কই, তাও হলো না।" আমাকে বললো, "এখন আর কি, লিখতে শুরু কর।" "কী লিখবো?" "ইতিহাস, ইতিহাস, এই সব।" আমি বললাম, "ইতিহাস তো আমি লিখতে পারিনে।" "তবে সাহিত্য, সাহিত্যই লেখো।" আমি বলি, "এটা ইতিহাস সাহিত্য লেখার সময়?" সে চোখ বুজেই

বললো, "ট্রানজিস্টারটা খাটের তলায় নিয়ে আস্তে আস্তে চালাও। দেখো কোনখানে কিছু শোন কিনা। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল।" আমার সাহস নেই ওটা চালাবার। স্বর্ণ আবার দাদাবাবুকে চা খাওয়ালো। ঘরটা আবার চুপ হয়ে থাকলো। তখন অনেক রাত হাতে ঘড়ি থাকলেও ঠিক সময় বলতে পারবো না। এতক্ষণ তো সময়ের কথা মনেই ছিল না। আমি উঠে মোড়ের মাথার জানালা দিয়ে চুপি দিলাম। দূরে অদূরে বৃষ্টির মত গুলী চলছেই। বোধহয় হলের থেকেই গুলী খেয়ে দৌড়ে "মাগো" বলে একটি ছেলে শার্ট-প্যান্ট পরা দুমড়ে পড়ে গেল আর উঠলো না। আমি তখন হলের ভেতর দেখার জন্য আরেক জানালায় উঁকি দিলাম। দেখলাম আগুন। মনে হলো শামসুননাহার হলে। নিশ্চিত হতে পারছি না আগুনটা কোথায় জ্বলছে। চোখে ঝাপসা দেখছি। আমার চোখে চশমা, তারপর জালের নেট, তারপর কাচের জানালা বাইরে ধোঁয়ার কুয়াশা— এসব মিলে আগুনের অবস্থানটা বুঝতে পারছিনে। তখন দোলার ঘরে গিয়ে তেমনি ভাবে জানালায় চোখ ঠেকিয়ে দেখলাম, থরে থরে আগুনের লাইন। হঠাৎ আমাদের দিকে ও জগন্নাথ হলটা অন্ধকার হয়ে গেল, মানে কামানের গুলীতে জীবন্ত বিজলী তার কেটে গেল, তখন দেখতে পেলাম আগুন আমার ৫০/৬০ হাত দূরেই। ছাত্রদের হল জ্বলছে। হলের কেন্টিন 'এল' প্যাটার্ণের। এই হলটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম এ্যাসেম্বলীর অফিসর দপ্তর ছিল। গেটে দেখলাম একটা সৈন্য রাইফেল হাতে হেলান দিয়ে আছে অর্জুন গাছের তলায় দেয়াল ঘেঁসে। নড়ে চড়ে না। এখন বুঝলাম বৈদ্যুতিক তার লেগেছে ওর গায়ে। ভোরের আলো ফোটার আগেই একটি কাক মোড়ের মাথায় মৃত ছেলেটির পিঠে বসে রক্ত পান করছিল। তার দশ-পনের হাত দূরে বুড়ো বটগাছের গোড়ে ছোট্ট চায়ের দোকানের এক বুড়ো তার সামনেই নিশ্চিন্ত মনে অজু করে কাছেই ছোট টিনের ঘরের মসজিদে নামাজ পড়তে গেল। মনেই হলো না ওর গতিভঙ্গি দেখে কাল রাতে আশে পাশে নরকলীলা হয়ে গেছে। তবুও স্বাধীনতার প্রথম সূর্যের লালচে আগুনি আলোর রশ্মি পড়লো গাছের চূড়ায়, শহীদ মিনারে জগন্নাথ হলের মৃতের লাশের উপরে, চৌরাস্তার মোড়ে-- সে "মাগো" বলে উপুড় হয়ে পড়া ছেলেটির পিঠে। ভোর হলো, কিন্তু কেউ দোর খুললো না এ পাড়ায়। খুকুমনিরা উঠলো না।

তবু ও কেউ কেউ, যারা গত রাতের তাণ্ডব লীলার মধ্যে ঝোপে ঝাঁড়ে, কচু বনে, পানির ট্যাংকে আশ্রয় নিয়ে ছিল, তারা আরো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। আমাদের চারতলার পানির ট্যাংক থেকে এলো বনোজ। এটা তার পরিচিত জায়গা, জানে আশ্রয় তার মিলবে। তাকে ফেরানো গেল না। কিন্তু ঘরে ঢুকে স্যারকে দেখে, সেই যে আমার বাথরুমের দরজার পাশে কোনায় হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসলো, আর ২৭শে মার্চের সকাল ন'টার আগে একচুলও নড়েনি, খায়ওনি। ছাব্বিশে বেলা আটটার দিকে গোপাল ঘরে এলো, বোধ হয় চা খেতে। দাদাবাবু জিজ্ঞেস করলো, "গোপাল কোথায় ছিলে?" গোপাল ছিল আমাদের পুকুর ধারে ঝুঁকে পড়া আম গাছের নীচে ছিটকির ঝোপে। ওখানে

বসলে রাস্তা থেকে বা শহীদ মিনার থেকে দেখা যায় না। দাদাবাবু তখন গোপালকে দাড়ি কামিয়ে শাড়ি পরতে বললো। গোপাল দাদাবাবুর রেজার দিয়ে দাড়ি কামালো, কিন্তু গোঁফ কামাতে পারলো না। আমি একটা ব্লাউজ ও লাল ছাপার শাড়ি দিলাম। তাতে ওকে আরো অদ্ভুত লাগলো। ব্লাউজ তো বুক পর্যন্ত এলোই না। স্বর্ণের উপদেশে তখন আবার লুঙ্গি পরলো। এর মধ্যে আবার মিলিটারী এলো হলের ছেলে-ছোকরা নিয়ে। তখন গোপাল দোলার বাথরুমের কলে পা দিয়ে বড় ভেন্টিলেটারে শরীর গুজে বসে বা ঝুলে থাকলো। ওরা চারতলার ছাদ থেকে কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আনালো ছেলেদের দিয়ে। যারা লাশ টানছিলো, ওরা তাদের বললো, "ইহাপর চারটো লাশ হায় —লে লও।" ভাগ্য ভালো আমাদের ঘরে ওরা রাতেও আর আসেনি, এখনও এলো না। বোধ হয় অফিসার যাকে মেরেছে সেটা গুণতিতে নেই বা জোয়ানরা জানে না। ওরা লাশ চারটি নিয়ে চলে গেলে গোপাল আবার ছিটকির ঝোপে চলে গেল। গোপাল চলে যাবার মিনিট খানেক পরেই শহীদ মিনারের বেদীর কাছেই গুলী হলো। একটা মিলিটারী আরেকটা শিকারকে ধাওয়া করে রাস্তা পেরিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লো আমাদের পুকুর পাড়ে। পট-পট-পট তিন চারটা গুলী। হায়রে গোপালের কপালেই বুঝি গুলীর ফুলঝুরি ফুটলো। মিনারে বোমাও ফাটলো, কালো ধোঁয়া উড়লো।

এমনি সময়ে আমাদের দরজায় আবার ধাক্কা। আবার ওরা এলো কি? কাল রাতে তো আমাদের আর বিরক্ত করেনি। তবে কি প্রফেসর সাবকে আবার নিয়ে যাবে? সামনের দুটি দরজাই তো দুমড়ানো মুচড়ানো, না যায় খোলা, না যায় বন্ধ করা। ওদের তো অসাধ্য কিছু নেই, তবে ঢোকেনা কেন? অসহায়ের মতো এগিয়ে গেলাম। না ওরা না। তিনজন হলের ছাত্র ভাল জামা-কাপড় পরে, হাতে একটা করে এ্যাটাচি। বলে, "মাসীমা, একটু আশ্রয়।" আমি অনেক করে বলছি, "এসো না বাবা। তোমরা থাকলে আবার মিলিটারী এলে আমার সামনেই স্যারকে খুঁচিয়ে মারবে। তোমরাও মরবে।" ওরা বলে, "আর দূরে যাবার সাহস নেই।" বলি, কেন মেডিক্যালে তো দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আরেক দৌড় দিয়ে যেতে পারো।" ওরা শোনে না, ঘরে ঢোকে। ওদের স্যার সচেতন ভাবে বললো, "ওদের তিনজনকে রান্না ঘরে শুইয়ে রেখে দাও। সন্ধ্যা হলে জঙ্গলে গোপালের কাছে পাঠিয়ে দিও। "হায়! গোপাল পুকুরে ভেসে আছে কিনা, কে জানে। ছেলে তিনটি এ্যাটাচি আমার হাতে দিয়ে বললো, "আমাদের সার্টিফিকেট, জরুরী কাগজপত্র আছে এতে।" খাবার ঘরে কাচের আলমারীর উপরে রেখে দিয়ে বললাম, "আমার জিনিষ থাকলে তোমাদেরটাও থাকবে। এখন তোমাদের ভাগ্য।" ওরা রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লো।

আমি আবার শোবার ঘরে গেলাম। হলের দিকের জানালা দিয়ে দেখলাম হলের পূর্বের গেট খোলা, গেটের দেয়ালে হেলান দেওয়া মৃত সৈন্যটা নেই। রাতের অন্ধকারের লাল আগুনের লেলিহান শিখা দিনের আলোয় নিস্তেজ মনে হলো। কবিতা আবৃত্তির সময় এটা

নয়, আজ আঠার বছর পরে লিখছি বলে সেই ২৫শে মার্চের স্মৃতির পটে কবি রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার একাংশ জেগে উঠেছিল। কাশীর মহিষী "করুণা"র ক্ষণিক স্নান বিলাসের কাহিনী। রানী বলেছিল, "উহু শীতে মরি, জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরি। শীত নিবারিব অনলে।' শেষে গরীব প্রজাদের জীর্ণ কুটির জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করেছিল করুণাময়ী। তার বর্ণনায় আছে "ফট, ফট, ফট ফাটিছে বাঁশ লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।" হলের রাতের নীল আকাশ লাল হয়ে এখন ধুসর বর্ণ। কাঠ ও টিন ছুটে যাওয়ার শব্দ ফুট-ফাট ঠুস-ঠাস গুলীর শব্দে মিশে যাচ্ছিল। ইয়াহিয়ার চেলাচামুণ্ডারা কি তবে তরুণদের মেরে হলের কেন্টিনে আগুন জ্বালিয়ে গরম রক্ত আরও গরম করছিল? গরীব গৃহহীন প্রজারা রাজার কাছে বিচার চেয়েছিল এবং সুবিচার পেয়েছিল। আমরা কার কাছে বিচার চাইব?

সকাল থেকে হলের মাঠে ঘড়ঘড় মেশিনের শব্দ হচ্ছে থেমে থেমে মাঠের বিশেষ একটা কোনায়। মনে হচ্ছে যেন পীচঢালা পাকা রাস্তা মেশিন দিয়ে গর্ত করছে। ঘড় ঘড় শব্দ কানে আঘাত করছে। আমার অদম্য ইচ্ছা তেতালার ডঃ শহীদ মনিরুজ্জামানের ঘরে গিয়ে হলের মাঠটা দেখে আসি। শাহাদাত বরণ করার আগে তিনি তো হলের মাঠের এক তরফা যুদ্ধ দেখেছিলেন। কিন্তু আমার পা, হাঁটু যে অবশ। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শক্তি নেই। হায়! এত অসহায় আমি কেমন করে হলাম? এরই মধ্যে রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি না চললে হলের মেয়ে-পুরুষ আহত কাউকে নিয়ে দৌড়ে বর্তমানের শহীদ সরণি পার হয়ে মেডিক্যালের পেছন দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে যাচ্ছে। অসহায় দু'চারজন মহিলা বাচ্চা কোলে, সে কী দৌড়! সবাই হাসপাতালের দিকে। ভাগ্যিস হাসপাতালটা এত কাছে। দুপুর পেরিয়ে যায় – আহত জ্যোতির্ময় বললো, "আমাকে একটু চা-বিস্কিট দাও। তোমরা কিছু খাও। বনোজকে, রান্নঘরে ঐ ছেলে তিনটিকে, কিছু দাও।" কী দেবো? কারো হাতে জোর নেই, হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরে যাবার শক্তি নেই, সাহসও নেই। হামা দিয়ে আমিই খাবার ঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে দই ও অনেকটা চিড়া নিয়ে জল দিয়ে ভিজালাম। তারপর দই-চিনি মেখে বনোজকে ছোট কাচের বাটিতে বাথরুমেই দিলাম – কিছুই খেলো না। হামা দিয়ে রান্না ঘরে যেতে মনে হলো কত দূর। সেই ছেলে তিনটিকে সসপ্যানে সবটা দিলাম। তাতে বোধহয় ওদের পেট ভরেনি, ওরা হাঁড়ি থেকে বাসী ভাত, ইলিশ দিয়ে চাচিপুছি করে খেয়ে নিল। বাপ-মেয়ে, স্বর্ণ একটু চা-বিস্কিট খেয়ে গলা ভিজালো। আমি তো কিছু খেতে পাচ্ছি না, বনোজের বাথরুমে গিয়ে বারবার জল খাচ্ছি আর নয়তো কুলি করে ঠোঁট ভেজাচ্ছি। বনোজ বোধহয় গলাও ভেজায় নি, মাথা ও তোলেনি। পরে ১০ই এপ্রিল যখন আমি এবাড়িতে এসেছিলাম দেখি, বনোজের বাটিতে ফাংগাস হয়ে সাদা গাছ উঁকি দিয়ে আছে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। তেতলায় জামান সাহেবের ছোট ছেলেটার কান্না শোনা গেল। কার হাত থেকে যে বাটি পড়ে গিয়ে ঝন করে শব্দ হলো। আবার কান্না শোনা গেল। বিকেল

গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সাঁজোয়া গাড়ির টহলদারি বাড়তে লাগলো। হলের বুল ড্রেজারে কাজ বোধহয় শেষ হলো – কিন্তু ভারী গাড়ির আনাগোনা পুরো দমেই চললো। আহত 'প্রভোষ্ট' বললো, "রান্না ঘরের ছেলেদের আমাদের পুব দিকের পুকুর পাড়ের ঝোপে পাঠিয়ে দাও। আর এখানে রাখা ঠিক হবে না। "তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, আমি তেমনি হামা দিয়ে অন্ধকারে রান্নাঘরে গিয়ে ওদের পুকুর পাড়ে ঘাটলার পাশের ঝোপে আশ্রয় নিতে পাঠালাম। এই সেই ঘাটলা যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও রমেশ মজুমদারের ছবি তোলা হয়েছিল। এ পুকুরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঢাকায় এলে চান করতেন। থাকতেন তো প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাসায়, আর চানের বেলা জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পুকুরে।

আমাদের এলাকায় বৈদ্যুতিক তার ২৫শের রাত তিনটের দিকে ছিঁড়ে গেছে। এস. এম হলের প্রভোষ্ট ডঃ মাহফুজুল্লাহ কবীরের বাসার দোতলায় একটা দরজা দিয়ে একটা বাতিই কাল রাতের তিনটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা কোথায় জানিনে। পেছন দিয়ে বোধ হয় সরে গেছেন। আমাদের এলাকাটা নিকশ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল। শহীদ মিনারের পথে আলো জ্বলছিল। সে আলোতে আমার দক্ষিণের বারান্দা, বাগান পুরা অন্ধকার হয়নি। শুরু হলো রাতের লীলা। কাছে–দুরে ঠুসঠাস। দূরে দক্ষিণের আকাশ লালে লাল। কাঠের গোলায় আগুন হতে পারে, নইলে এত লালিমা, কাল বৈশাখীর সন্ধ্যার লালের চেয়েও বেশি। এ আগুন আকাশের অস্তগামী সূর্যের নয়, এ রক্তিমা মর্তের নরকের আগুনের লাভা। আমি আমরা সবাই নিজের রাজ্যে ডুবে রইলাম। গোপাল নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। না হলে তো রাতের অন্ধকারেও একবার আসতো? অন্ততঃ দাদাবাবুকে দেখতে।

সময় থেমে থাকে না। যত দুঃখ, যত সুখ থাক না কেন এ পৃথিবীতে সময় তার নিজের গতিতে সামনে চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর নিঝুমপুরীতে, রক্তাক্ত জগন্নাথ হলের কক্ষের খোলা জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে সবুজ ঘাসের মাঠে অনেক লাশের স্তূপের উপরে ২৭শে মার্চের রক্তিম সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। কাকদের চারণভূমি এখন জগন্নাথ হলের মাঠ। লম্বা ঘরের আগুন নিস্তেজ হয়ে আসছে, এখনও নেভেনি। ২৭শের বেলা সাতটার পরে হঠাৎ গোপালের আবির্ভাব। "একি! গোপাল তুমি বেঁচে আছো? মরনি?" অনিদ্রা–অনাহারে ক্লান্ত গোপাল বললো, "না, মরি নাই। ওরা যখন শহীদ মিনারে গুলী চালাইল, তখন একটা সৈন্য কয়েকজনকে ধাওয়া করলো তার মধ্যে একজন রাস্তা ক্রস কইরা আমাদের দেওয়ালের গাছের ফাঁক দিয়াই ঢুইক্যা পশ্চিম দিক দিয়া চোঁ চোঁ দৌড়। তখন ঐটা এদিক ওদিক চাইল। অর হাতে বন্দুক দুই পাশে দুইজন বাক্সে টোটা লইয়া আউগাইতাছে। আমি ঠিক মতন জঙ্গলে ঢুকতে পারছিলাম। কিন্তু অগো দেইখ্যা ভাবলাম এইবার শেষ! অরা আমাগো জঙ্গলে কেউরে দেখে নাই।" আহত তৃষ্ণার্ত জ্যোতির্ময় গোপালের সাড়া পেয়ে বললো "একটু চা খাওয়াতে পারো গোপাল?" এমন সময়ই কয়েকটা পট পট শব্দ। গোপাল এক দৌড়ে আবার উধাও। আজ স্বর্ণ বেঁচে নেই, বলতে পারছিনে চা করা হয়েছিল কিনা।

স্বর্ণের শক্তি বা সাহস ছিল না রান্না ঘরে ঢোকার। আমার কোন চিন্তা নেই, আমি কিছুই গিলতে পারছিনে। বাথরুমের কলের জলে ঠোঁট গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি। স্বর্ণ, দোলা বিস্কিট জল খেয়েছিল হয়তো।

২৭ তারিখে সকাল সাড়ে আটটার দিকে দেখতে পেলাম শহীদ মিনারের ফুটপাথ দিয়ে একজন মহিলা টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আজিমপুরের দিকে যাচ্ছে। তাকে হাত তালি দিয়ে ইশারায় কাছে ডেকে আনলাম। আমি দেয়ালের কাছে গিয়ে বললাম, "ভাই আপনি হাসপাতালে একটু খবর দেন।" সে বললো, "স্লিপ দেন।" আমি দৌড়ে কাগজের টুকরায় লিখে দিলাম, "অধ্যাপক আহত, নিয়ে যান।" মিনিট পনেরর মধ্যে চারজন স্ট্রেচার নিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে এলো না গেট দিয়ে এলো মনে নেই। আমি জ্যোতির্ময়ের জামাটা বদলে দিলাম, ওরা গেট দিয়ে চলে গেল। স্বর্ণ বললো, "কাগো লগে দিলেন? ওরাই যদি মাইরা ফেলে?" আমি বললাম, "এটা রায়ট না। তাছাড়া ওরা হাসপাতালের লোক। এ সময়ে মারবে না।" পরেই মনে হলো, ঠিকই তো এভাবে দেওয়া উচিত হয়নি। হাসপাতালের অবস্থা তো জানি। কেন একা একা দিয়ে দিলাম? আমিই বা দোলাকে এই শ্মশানপুরীতে ফেলে যাই কেমন করে? এর মধ্যে গোপাল এলো, ঐ ছেলে তিনটিও ঝোপ থেকে এলো। তাদের বললাম, "এবার তোমরা নিজের বাড়িতে.দেশে চলে যাও। ঢাকায় থেকো না।" ওরা যার যার এ্যাটাচি নিয়ে অভুক্ত চলে গেল নিরুদ্দেশের পথে। আমি আবার রক্তমাখা হাফ সার্ট ধুতে গেলাম।

এমনি সময়ে আবার ৩৪ নম্বরের সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ। কীরে বাবা। আবার কি হলো। চুপি দিয়ে দেখি, মিলিটারী না। তেতলা, দোতলার সব ফ্ল্যাট ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে। তেতলার পূর্বদিকের জার্মান সাহেব শোয়েল্পি সস্ত্রীক ১৬ই মার্চই চলে গেছে ব্যাংককে, যাবার আগে আমাদের চা চক্রে দাওয়াত দিয়েছিল। প্রফেসর রাজ্জাক লাল কম্বল হাতে নেমে আসছেন, তাঁর ফ্যামিলি, মিসেস মনিরুজ্জামানের মা সবাই সঙ্গে কুলিদের মাথায় মালপত্র। আমি রাজ্জাক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "যাচ্ছেন কোথায়?" তিনি দৌড়ে নামতে নামতে জবাব দিলেন, "জানিনে তবে এখন যাচ্ছি মেডিক্যালে। আপনিও থাকবেন না।"

আমরা তখন মেডিক্যালে যাবার জন্য তৈরি হতে থাকলাম। কি ফেলে কী নেবো সঙ্গে? প্রয়োজনের, সখের কত জিনিস, কত কিছুই তো ঘর ভরা। শোবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে চোখে পড়লো ড্রেসিং টেবিলের উপর আমার সোনার "বসন্তবাহার" বালা দুটো। জ্যোতির্ময়ের ডেইটওয়ালা ঘড়িটি ২৫ তারিখে বেলা ৩টায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সকালে চাবি দেওয়া হয়নি। আর সখের জিনিসের মধ্যে জ্যোতির্ময় প্যারিস থেকে এনেছিল 'কানাস্তা' পারফিউম, কাট্ গ্লাসের সুন্দর শিশিটি। শখের জিনিস ড্রয়ারে রেখে, প্রয়োজনের জিনিস দুটো আমার ঝুড়ি ব্যাগে নিলাম। ট্রানজিষ্টরটা সঙ্গে নিতে ভুলে গেলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে কেনা আমার সঙ্গের ট্র্যাভেলিং ক্লকটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার স্বামী যদি বাঁচে তাই

তার একটা টি-শার্ট, একটা পাঞ্জাবী, দুটো পায়জামা সঙ্গে নিলাম। হাল্কা হার্ডবোর্ডের ট্রাংকে থেকে উপরের শাড়িগুলো ফেলে দিয়ে স্কুলের ক্যাশ বই, শিক্ষক-বেতন বই, আমার জরুরী কাগজপত্র ও ঘরে ছিল মাত্র ৫ টাকার নতুন নোট পঞ্চাশটা, তাই ভরে নিলাম। সাহায্যকারীর দল বলে, "কই! কি লইবেন লন। হ্যারা তো অনেক কিছু নিছে।"

আমরা ওদের সঙ্গে পিছন দিক দিয়ে দেয়ালের ফাঁক গলে শহীদ মিনারে পাশের এমারজেন্সি গেট দিয়ে হাসপাতালে গেলাম। কুলীরা করিডোর দিয়ে দোতলার সিঁড়ির মাথায় মিসেস মনিরুজ্জামানের পাশে আমার ট্রাংকটা রেখে দশ টাকা বকশিস নিয়ে চলে গেল। গোপাল কোন রকমে ঘরের সব দরজায় তালা দিয়ে বাইরের তিন দরজায় কড়া বেঁধে দিয়ে পরে এলো।

মিসেস মনিরুজ্জামান তাঁর ট্রাংকের উপর বসে পাখা নাড়ছেন, আমাকে দেখে পাশে বসিয়ে বাতাস করতে লাগলেন, যেন তাঁর কিছুই হয়নি। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে গেল, বেশির ভাগ ছাত্র জাতীয় বা শরণার্থী। কত প্রশ্ন ওদের, কত জবাব দেবো? মিসেস জামান বললেন, "আমি চার জনকে দিয়ে এলাম। আমার ঘরে আর বড় পুরুষ নেই।"

আমার মনের মধ্যে ছাত্র জীবনের স্মৃতির ঢেউ লাগলো – এই আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ। এখানেই আমরা বান্ধবীরা মিলে করিডোর মুখর করেছি কল কণ্ঠে। ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "কে বলে তোমাদের 'অবলা'? তা 'অবলা' হতে পারো অ-গলা তো আর নও।" আজ সেখানে পরম আত্মীয় হারিয়ে জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিতে হলো। যাক ভাবালুতার সময় এটা নয়। চেনা মুখ দেখে একটি ছেলেকে ডেকে বললাম, "দেখতো বাবা, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে কোথায় রেখেছে।" ছেলেটি দৌড়ে খোঁজ নিয়ে এলো, "তিনি এখনও ওখানেই আছেন।" আমি তখনই দৌড়ে গেলাম, মিসেস জামানের কাছে আমার ট্রাংকের দায়িত্ব দিয়ে। হায়রে! খালি বাড়িতে সব ফেলে এসে এখনও একটি ট্রাংকের জন্য এত মমতা! মমতা নয়, কর্তব্যও। ওতে আছে আমার স্কুলের ক্যাশ বই ও বেতনের বই।

সেদিনের সেই দুর্গন্ধময় এমারজেন্সিতে যে ক'জন রক্তমাখা হতভাগ্য অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের দুর্গতির সীমা নেই। কোন ডাক্তার সেখানে নেই। আমি জ্যোতির্ময়কে বললাম, "এখনও কোন ডাক্তার আসেননি?" তার নিজের কথা না ভেবে সে আমাদের জন্য ভাবছে, "তোমরাও এখানে চলে এলে? কেন? বাসায় কি থাকা যেত না?" ভাবি হায়রে! সে তো দেখতে পায়নি জগন্নাথ হল পাড়ায় আমাদের কি অবস্থা। কি দুর্দশা! বললাম, "সবাই, পাড়াসুদ্ধো হাসপাতালে চলে এসেছে।" জ্যোতির্ময় জল খেতে চাইল, সামনের খোপে মেশিনের মতো একটা লোক ডিউটিতে বসা —একমগ জল দিলো নিঃশব্দে। তখন বললাম, "এ রোগীদের কখন বেডে নেবে?" উত্তর দেয়, "ডাক্তার এসে দেখলে, বেডে নেবার অর্ডার হবে।" আবার মুখ বন্ধ।

আমি দোতলার সিঁড়ির কাছে বসা আমার মেয়েকে নিয়ে গেলাম স্বর্ণর খোঁজে। এদিকে মেডিক্যালের ছাত্র যারা ২৫শে মার্চ থেকে বাড়ি যায়নি বা যেতে পারেনি, তারা এমারজেন্সির পোর্চ–এর উপরতলার "সিক রুমে" আটটা বেডে দশ বারজন থাকে। তাদের একজনকে এমারজেন্সিতে পাঠালাম। একটি লম্বা মত সুন্দর ছেলে বললো, "আপা, আমাকে চিনলেন না? আমি কামাল।" আমি তো কয়েকজন কামালকেই চিনি, এ কোন কামাল? এখনতো আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। সেই কামাল তার বন্ধুদের বললো, "এটা আমার আপা, বুঝলি? আমার বেডটা আপাকে দিবি, আমি চললাম যুদ্ধে।" ভাবি বলে কি ছেলেটা! এখন কোথায় যুদ্ধ করবে? যাই হোক ওর বন্ধুরা আমাকে Sick রুমে নিয়ে বললো, "আপা, এটা কামালের খাট। খাটের তলায় আমার ট্রাংক ওরা আগেই রেখে দিয়েছে। আসলে এরা কেউই অসুস্থ না। ঘরটির দুটি পূর্বের জানালায় দাঁড়ালে পুরানো ফুলার রোডের দুধারে পূর্বাঞ্চলীয় সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণী, ওপাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিকোণাকৃতি খেলার মাঠ, পরে কার্জন হলের এলাকা। উত্তরের দিকে চাইলে দেখা যায় হাসপাতালের গেট, তার ফাঁক দিয়ে শহীদ মিনারের একাংশ তারপর আমাদের ঘাটলা বাঁধানো পুকুর, তার পূর্বে মেডিক্যাল সেন্টার।

গোপাল এলো ট্রানজিষ্টারটি নিয়ে। পরক্ষণেই মনে হলো ফ্রিজ চালু রেখে এসেছে। আবার ফিরে গিয়ে ফ্রিজের সব মাছ, মাংস, তরমুজ, বাঙ্গি সব নিয়ে এলো। ছেলেরা খুব খুশি হয়ে মাছগুলো খেলো। দু'দিন পেটে ভাত নেই। কিন্তু ওরা সবচেয়ে বেশি খুশি হলো ট্র্যানজিষ্টারটি পেয়ে। বললো, "আপা, দেনতো একটু খবর কিছু শুনতে পাই কিনা – সবাই ঝুঁকে পড়লো।" একটু পরেই বললো, "আপা। আসেন। শোনা যায়।" "কি শোনা যায়?" "স্বাধীন বাংলার কথা।" সবাই উত্তেজিত। আমি ভাবলাম তাই বুঝি। আমার স্বামীও ২৫শের রাত তিনটার দিকে খবর শুনতে চেয়েছিল।

বিকেল ৩টার দিকে একটি ছেলে দৌড়ে এসে জানালো, "জ্যোতির্ময় স্যারকে ৭ নম্বর রুমে এনেছে। ওনার অবস্থা খারাপ।" আমি, স্বর্ণ ও মেয়ে দৌড়ে গেলাম। তখন তার বড় বড় শ্বাস পড়ছে। সে জল চাইল, পাশের এক মহিলা আমার গ্লাসে জল দিলেন। আমি খাইয়ে দিলাম। একটু সুস্থ হয়ে বললো, "এবার তোমরা চলে যাও।"

"কোথায় যাবো তোমাকে ফেলে।" দোলা বললো।

"ঐ যেখানে যেতে চেয়েছিলে।"

বুঝলাম ২৫শে মার্চ বিকেলের কথার সূত্র ধরেই বলছে। তার মনে কি চিন্তা তোলপাড় করছে কে জানে। আমি একটু ওয়ার্ডটা ঘুরে দেখলাম। বাসু মালী আছে। আর ওয়ার্ডে ঢুকতে দরজার দু'পাশে ৬ ও ৭ নম্বর বেডে দু'জন জগন্নাথ হলের ছাত্র ছিল, যাদের একজনকে নর্থ হলের ছাদে লাইন করে গুলী করেছিল। সে হল সুরেশ। সাইজে অন্যদের চেয়ে ছোট বলে কলার বোনের কাছে গুলী লেগে বেঁচে গেল। আরেকজন সাউথ হলের ব্রাশ ফায়ারে বেঁচে গেছে। লাশ টেনে নামানোর ফাঁকে ওরা পাইপ বেয়ে নীচে নেমে প্রথমে কচুবনে আশ্রয় নেয়। পরে হাসপাতালে ভর্তি হলো নিজে নিজে।

ফিরে এলাম আমার স্বামীর কাছে, স্বর্ণ মাঝে মাঝে জল দিচ্ছিল নয়তো পাথরের মতো পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকেল পাঁচটার দিকে তাকে ২নং বেডে নেয়া হয়েছে। শুধু ঘাড়ে হাত দিলে ব্যথা লাগতো। ডাক্তার এলেন, ব্লাড প্রেসার মাপলেন, এলো স্যালাইন, এলো অক্সিজেন। শ্বাসকষ্ট হলেই ওটা চালানো হতো। সি. এ প্রফেসর আলী আশরাফের অধীনে আর. এস. ডঃ মতিউর রহমানের চিকিৎসা চললো ব্যস্ততা বেড়ে গেল। গোপাল তো দুপুরেই গেণ্ডারিয়া চলে গেছে বন্ধুদের খবর দিতে। বোধহয় ১টা থেকে কার্ফিউ। হাসপাতালের ভিড় কমে গেল। আমি বেশ কয়েকটা রুমে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। রক্তমাখা শরীর থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে। তাতে গা বমি বমি করছে। আমি Sick রুমে গিয়ে একটু গা এলিয়ে দিলাম। তারপর নটার পরে আমি ৭ নম্বর রুমে গেলাম আর স্বর্ণ দোলাকে শুতে পাঠালাম। ওরা কিছু খেল কিনা জানিনে। দোলা রাতে খাটে শোবে, কখনও স্বর্ণ কখনও আমি সঙ্গে থাকবো ঠিক হলো। আমি একটা টুলে বসে জ্যোতির্ময়ের কুঁকড়ে যাওয়া হাত টেনে দিচ্ছিলাম। মনে হলো এতে সে একটু আরাম পেলো একটু সম্মতিসূচক শব্দ করলো। কিছুই তো করার নেই, শুধু একটু আরাম দেয়া।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানিনে, একটু চোখ লেগে এসেছিল। আবার গোলাগুলীর শব্দ হতে থাকলো। ভীষণ শব্দ, তার সঙ্গে হাসপাতাল বিল্ডিং কেঁপে উঠলো। সিষ্টার বাতি নিভিয়ে ঝুলানো বাতিটা তার টেবিলের কাছে নামিয়ে আনলেন যাতে তাঁর টেবিলের বাইরে আলো না পড়ে। নার্সকে ইশারায় বললেন, শুধু চুপ করে থাকতে। আমি দু'হাতে তখন জ্যোতির্ময়ের দু'কান চেপে ধরে রাখলাম। কিন্তু সে ঘুমোয়নি। জিজ্ঞেস করলো, "কি হচ্ছে? কোথায় হচ্ছে?" উত্তর তাকে একটা দিতেই হবে। বললাম, "মনে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

কখনও মনে হচ্ছিল শব্দটা মেডিক্যালের চারদিকে ঘিরে হচ্ছে। তখন আমি অন্ধকার করিডোরে পা ঘষে ঘষে হেঁটে, দুটো ওয়ার্ড পেরিয়ে, ডাইনে বেঁকে আবার আরো দুটো ওয়ার্ডের দেয়াল হাতড়ে সিক রুমে যাই। গিয়ে দেখি ছেলেরা উত্তরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। আমি স্বর্ণ মিলে দোলার জাজিমটা মাটিতে টেনে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে পেতে দিলাম, যাতে গুলী এলে মেয়ের গায়ে না লাগে। আমিও দেয়াল ঘেঁসে বসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখলাম দানবরা শহীদ মিনার ভাঙছে। কার্ফিউ দিয়ে এসব নারকীয় কাজ করতে খুব মজা। পেট্রোল পাম্পের কোনা থেকে একটা জীপ মিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর পেছন দিকে ব্যাক্ করছে। একটু পরেই মিনারের চত্বর আলোকিত হয়েই বিকট শব্দ। তারপর আবার ওরা এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে, তারপর আলোর রোশনাই আর বিকট শব্দ। এমনি খেলা চললো ঘন্টা দুই। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র না পেয়ে শহীদ মিনার ভেঙেই আক্রোশ মেটাচ্ছে। একসময় ওরা থামলো। হয় ওদের রসদ ফুরিয়ে গেছে, নয়তো আক্রোশ মিটেছে। ওদের তিনটা জীপ U.O.T.C-র দিকে চলে গেল।

আমি তখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে চলে এলাম। নার্সকে বললাম, "ওরা চলে গেছে।" নার্স তার বাতি উঁচু করে দিলেন। জ্যোতির্ময় জিজ্ঞেস করলো, "কি হলো?" বললাম, "ওরা শহীদ মিনার ডিনামাইট দিয়ে ভাঙলো।" সে চোখ বুজলো। রোগীরা সবাই জেগে, ভয়ে আধমরা। কেউ কেউ পানি খেতে চাইল। কিছু বাইরের লোক এঘরে ছিল, তারাই রোগীদের পানি খাওয়ালো আমি তখন সিক রুমে গিয়ে স্বর্ণকে ওয়ার্ডে পাঠালাম।

তখন ইয়াহিয়ার রণক্লান্ত চেলাচামুণ্ডারা চলে গেছে। মিনারের প্রাঙ্গণের বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রিত পাখিরা আবার কুলায় ফিরে এসেছে। কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম কত ঘণ্টা তার হিসেব নেই। কানে এলো পাখির কিচির মিচির শব্দ। পূবের আকাশে বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর আভাস। দুঃখের আঁধারে তৃতীয় রজনী শেষ হলো।

২৮শে মার্চের সকালে কার্ফিউ শেষ হলে দলে দলে জোয়ান ছেলেরা, বয়স্করা সমানে হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়লো, আত্মীয় বন্ধুদের খোঁজে। আমাদেরও দেখতে এলো আবদুল গণি হাজারী–স্ত্রী হাসনা (জেলী), ডাঃ তাজুল হোসেন। ডাঃ তাজুল বন্ধুকে তাঁর সিটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার জন্য তার এম্বুলেন্স পাঠাবেন। কিন্তু R.S. ডাঃ মতিউর রহমান অনুমতি দিলেন না। তখন তাজুল R.S. কে অনুরোধ করলো, "আমার বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।" প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজারী ওষুধপত্র, হর্লিক্স নিয়ে এলো। ওষুধগুলো সবই বড়ি আর ক্যাপসুল, কিছুই গলা দিয়ে গেল না। কেবল হর্লিক্স গিলে বেঁচে থাকলো। দুটো গুলীর চারটে ফুটো দিয়ে তো ২৫ তারিখ থেকেই রক্ত ঝরে যাচ্ছে – ডাক্তার স্যালাইন দিয়েই রক্তের প্রবাহ চালু রেখেছেন। এ সময় সরকারের আদেশে হাসপাতালের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। "একেই বলে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।"

বন্ধুরা কত যে এলো, ছাত্ররা যারা শহরে ছিল তারা তো এলোই, প্রাক্তনরাও এলো। কেউ চাইলো ফটো তুলতে, কাজী রফিক পা ছুঁয়ে বললো, "এ হত্যার আমরা প্রতিশোধ নেবো।" তাকে সাবধান করে দিলাম। মিলিটারী ইনটেলিজেন্স সেই কাবুলি পোশাকে পশ্চিমের বিছানার কাছে ঘুরে ফিরে দাঁড়ায়। এই রকম পোশাকেই সে মোটর সাইকেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে, সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দুপুরে।

জ্যোতির্ময় কখনো কোন বক্তৃতা শুনতে যেতো না। সে বলতো, "বক্তৃতা তো কাগজে পড়েই জানা যায়।" কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় ৭ই মার্চের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। সকাল থেকেই আমাদের সকলের মনে উত্তেজনা শেখ সাহেব কি বক্তৃতা দেবেন তাই নিয়ে। যে আমি স্কুলে না যেয়ে পারি না, সেই আমিও সেদিন গেণ্ডারিয়া গেলাম না। কিন্তু রেসকোর্সে যাই কেমন করে! ময়দানে হাজার হাজার মানুষের মাথা গিজ গিজ করছে। কার্জন হলের বর্তমান দোয়েল চত্তর দিয়ে বাংলা একাডেমী পর্যন্তও কোন রকমে যাওয়া যায় না, ময়দানতো দূরের কথা। আমরা ঐ রাস্তায় যেতে না পেরে গাড়ি ঘুরিয়ে বিশ্ববিদ্যালযের কলা

ভবনে গাড়ি রেখে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাঙা দেয়ালে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ময়দানের শ্রোতাদের কথাও শোনা যাচ্ছে। একজন রয়স্কা বৈষ্ণবীকেও স্বদেশ প্রেমের গান গাইতে দেখলাম। দেখতে দেখতে আমাদের চারপাশে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আমাদের চেনাশুনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মসজিদের ভেতরে নীচু দেয়ালে হোণ্ডা রেখে কাবুলি পোশাকে একজন বসে, মনে হলো, আমাদের প্রতিটি কথা শুনছে। তাকে সেদিন ইনটেলিজেন্সের লোক মনে হয়েছিল। হাসপাতালে তাকে দেখে আজ কোন সন্দেহ থাকলো না।

এত দিনে আমার ভয় হলো কারা আসে, কারা যায়, কি বলে, ওরা লক্ষ্য করছে। অধ্যাপকরাও কতজন যে এসেছেন সারা দিনে, তা আমি সবাইকে দেখিনি। মা, মেয়ে, স্বর্ণ আমরা পালা করে ওয়ার্ডে থাকছি। গোপাল বললো, ২৯ তারিখে এসেছিল গিয়াস উদ্দীন তার চোখে জল ছিল। হাসপাতালে ফিজিওলজির প্রফেসর বন্ধু ডঃ শহিদুল্লাহ তো একবার বেডের কাছে এসে আর কাছে আসেননি। কাঁচের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রায়ই। হলের সহকর্মী শিক্ষক, কর্মচারীরা অনেকেই এসেছেন। ধীরেনদা–দারোয়ান ২৭শের সকালে বাসায়, বিকেলে হাসপাতালে দেখে গ্রামে চলে গিয়েছিল, ৩০ তারিখে মৃত্যুর পরে আবার এলো, ফুল দিলো।

হাজারীরা ফেরার পথে দোলাকে ইন্দিরা রোডে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল, রাতে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আবার কার্ফিউ শুরু হয়। হাসপাতালের বাড়তি লোকের ভিড় কমে। ডাক্তার নার্সদের কর্মতৎপরতা বাড়ে। সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডের টেলিভিশনটা চালিয়ে দেয়। ১নং বেডের শিয়রে একটা আলমারীর উপরে T.V. সেটটি। এদিকে আমার স্বামী গুন গুন করে গাইছিলো আগে থেকেই — বোধ হয় জ্বর হয়েছে – জ্বর হলে সে সব সময় গান গাইত। আজ গাইছে, "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।" তার বাবার প্রিয় একটি গান। কোন এক সময়ে T.V. তে ভায়োলিন বাজছিল – ভারী সুন্দর সুরে। তখন জ্যোতির্ময় চোখ বুজেই বলছে, "How lovely! how nice! wonderful! full of life, full of vigour." আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পরে বললাম, "একটা বুড়ো সাহেব টেকো মাথা ঘুরে ঘুরে ভায়োলিন বাজাচ্ছে।" তখনও দেখি ঐ কাবুলি পোশাকটা পশ্চিমের বেডের কোনায় বসে আছে।

রাত গভীর হলে আবার ভূতের লীলাখেলা শুরু হয়, এবার শহীদ মিনারে নয়, একটু বা অনেকটা দূরে, উত্তর পশ্চিম কোনায়। ওয়ার্ডে বাতিও নিভলো, আবার যুদ্ধ, মনে হলো যুদ্ধ, থেমেও গেল এক সময়। শেষ রাতে অনেক আহত এলো হাসপাতালে। আমাদের করিডোরে পরপর খাটিয়া ভরে গেল। জোয়ান পুষ্ট চেহারা হাফ–প্যান্ট পরা কারুর গায়ে গেঞ্জিও আছে। এরাই কি ই. পি. আর? কী তাদের স্বাস্থ্য, জোয়ানরা রক্তে লেপ্টে আছে। কারুর তখনও তাজা রক্ত ঝরছে। শুকনা রক্তের গন্ধটা করিডোরের বদ্ধ দেয়ালে আটকে গিয়ে নরকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবুও এ নরকে আমাদের দুঃখের চতুর্থ রজনী পোহাল।

রাত পোহালে ২৯ তারিখে প্রথম এলেন আমার স্কুলের সেক্রেটারী ডাক্তার ওয়াহিদ। তিনি ২ নম্বর বেডের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন - X-Ray হয়েছে?" আমি বললাম, "না।" এখানে X-Ray plate নেই। গৌরাঙ্গ মিত্র বলে যে ছাত্রটি (এখন ও হলিক্রস নটরডামে বিজ্ঞান পড়ায়) কাল বেরিয়ে গেছে প্লেট কিনতে, এখনও ফিরে আসেনি।" ডাক্তার সাহেব তখন কোথায় কোথায় যেন গেলেন। এসে বললেন আধ ঘণ্টার মধ্যে X-Ray হবে। তারপর "আসুন," বলে আমাকে একটা ঘরের দরজায় নিয়ে বলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।" একজন লোককে দেখিয়ে বললেন, "এ ঘর থেকে বেরুলেই লোকটাকে টেনে নিয়ে যাবেন।" তারপর তিনি লেগে গেলেন ই. পি. আরদের সেবা করতে। একুম–ওরুমে ঢুকে তুলা নিয়ে ওদের ক্ষতের রক্ত মুছে, কাউকে তুলা লাগিয়ে, কাউকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। আমিও ট্রে ধরে সঙ্গে ঘুরছি। সেদিন বিকেলেও আবার এলেন। তিনি ডাক্তার, তিনি জানেন জ্যোতির্ময় বাঁচবে না। বেলা হলে ডঃ মতিউর রহমান এলে বললাম, "আমার স্বামীর জ্বর বেশি বোধহয়।" জ্বর হলে উনি গান করেন।" তখনও জ্যোতির্ময় গান গাইছিল। ডাক্তার প্রেসার ও জ্বর মাপলেন। জ্বর ১০৬° ডিগ্রি। বরফের ব্যবস্থা করতে বললেন। আমারও প্রেসার মাপলেন। প্রেসার বেশি, কত বেশি বলেননি। আমাকে ডেকে নিয়ে বলেলন, "দেখুন, আপনি খুব শক্ত, তাই বলছি, উনি আর বেশিক্ষণ নেই।"

মাত্র গত ২৩শে মার্চে বিকেলে হাজারী, তার স্ত্রী জেলী এবং অজিত নিয়োগী একসঙ্গে আমাদের বাসায় এসেছিল। আমি সেদিন কালো জামদানী শাড়ি পরেছিলাম। নিয়োগী প্রথম দেখাতেই বলেছিলো, "আপনার কালো শাড়ি আমি সহ্য করতে পারছিনে। যান, শাড়িটা বদলে আসুন।" আমি শাড়ি না পাল্টাতে তিনি বার বার ঐ একই কথা বলতে থাকলেন। আমি হেসে বললাম, "সে কি। সেই সকাল বেলা থেকে এই শাড়ি দেখে কতজন যে আওয়াজ দিলো। না, এ শাড়ি আমি বদলাবো না।" নিয়োগী তখন বললেন, "আপনার একটা দারুণ পরিবর্তন আসছে।" যেই না বলা, অমনি জ্যোতির্ময় ওর সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, "দেখো তো, আমার এ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হবে নাকি! আমার হাতে আয়ু সত্তর বছর। আমি তো এখন মারা যেতে পারিনে।"

আমি ডাক্তারকে বললাম, "তাকে কি চার পাঁচ মাসও পঙ্গু অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না?" তিনি বলেন, "পাঁচ দিনও যা, পাঁচ মাসও তাই।" আমার কথা, পাঁচ মাস ও কথা বলতে পারলে বই তো লেখা যায়!

X-Ray হয়ে গেল মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন, গলায় কফ জমলে যন্ত্র দিয়ে বের করা চলতে লাগলো। আমার প্রাক্তন ছাত্রী –প্রিয় ছাত্রী, অনাথ আশ্রমে মানুষ ভারতী ভালো নার্স। ডিউটির সময়টুকু ছাড়া সারাদিন সে আমাদের কাজ করেছে, সব ফ্রিজে বাটিতে, প্যানে পানি রেখে বরফ জমিয়ে এনে দিয়েছে, আর স্বর্ণ মাথায় ধরে রেখেছে। সারা

রাত ধরে করেছে। ডাক্তাররা ঠাট্টা করেছেন, "কে হয়? এত বাড়তি কাজ?" বলে, "আমাদের জামাই বাবু।" ডাক্তার আমাকে বললেন, "আজ আর আপনি রাত জাগবেন না। ছোকরা ডাক্তার আমাকে প্রেসারের ও ঘুমের বড়ি দিল, নাম যেন কী সেনগুপ্ত। বললো, "আজ রাতে আমি ডিউটি দেবো।" আজ তো গোপাল ফিরে এসেছে, স্বর্ণ আছে। আমার আর চিন্তা নেই। আমি জানি ছোকরা ডাক্তার কেন আমাকে রাত জাগতে দেবে না! কিন্তু আমি কি ঘুমাতে পারি?

কেমন করে ২৯-এর রাত শেষ হয়ে ৩০ মার্চের সূর্য উঠলো? রাতে বৃষ্টি হয়েছে – অনেক আগুন নিভে গেছে শহরে। লাল সূর্যের প্রভাতী আলো কালো পিচের বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় চকচক করছে। আমি ডায়েরীতে লিখলাম, "একটি সূর্য উঠছে, আরেকটি নিবছে।" আমি সেই চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমাকে এসে কে যেন Sick রুম থেকে ডেকে নিয়ে গেল। স্বর্ণ বললো, "দাদা বাবুকে একটু জল দ্যান।" ও আমার হাতে জল দিলো, আমি তাই তো দিলাম। প্রায় সকাল নটায় 'জীবন প্রদীপ' নিভলো।

একজন মানবতাবাদীর মৃত্যু হলো। হ্যাঁ। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা মানবতাবাদী বলেই নিজেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো। তরুণ বয়সে মানবতার আলো তার হৃদয় মনকে আলোকিত করেছিল। সে আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল তার দৈনন্দিন জীবন। ঘরে বাইরে আপনপর, সতীর্থ-সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এমনকি নিম্নতম কর্মচারীর সঙ্গে প্রতিদিনকার কথাবার্তায়, আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়েছিল তার সংবেদনশীল মানব মন। সে ছিল র‍্যাডিকাল যুক্তিবাদী। যুক্তির মাধ্যমে সে নিজের বক্তব্য অন্যকে বোঝাতে চেষ্টা করতো, অন্যের বক্তব্যও নিজে বুঝে নিতো। সে নিজে বিশ্বাসী না হয়েও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের সঙ্গে উচ্চতর ধর্মালোচনায় লিপ্ত হতো।

হাসপাতালে মৃত্যুর মুহূর্তে আমাদের মেয়ে দোলা ছিল না কাছে। আমি বারবার দরজার দিকে চাইছিলাম। ডাক্তারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে আমিও ক্লান্ত ছিলাম। কেন যে মৃত্যুর সময়ে যখন রক্ত চলাচল বন্ধ, চারদিন পাঁচ রাত রক্ত ঝরে নিঃশেষ, তখন জোর করে ইনজেকশন দেওয়া! এটাই নাকি ডাক্তারী ধর্ম। এসব ভাবছি। এমন সময় আবদুল গনি হাজারী ও সিরাজের ভাই ডাক্তার ফুনু দোলাকে ধরে ধরে নিয়ে এলো। স্বর্ণ ও দোলা জোরে কাঁদতে থাকলো। আমি একটা টুলে বসে দোলাকে কোলে নিয়ে বোঝাতে থাকলাম, "তোমার বাবা যখন দশম শ্রেণীতে পড়ে, তখন তার বাবা মারা গেছেন। তুমিও দশম শ্রেণীতে উঠলে, তোমার বাবা মারা গেল।" দোলা তবুও কাঁদতে লাগলো। কে যেন দোলাকে ধরে নিয়ে সি. এ. প্রফেসর আলী আশরাফের রুমে রেখে এলেন। তখন ডাক্তার তাজুল হোসেন ও ডাক্তার ওয়াহিদ রেসিডেন্ট সার্জন ডঃ মতিউর রহমানকে Death certificate লিখতে বললেন। লেখা নাকি হয়েও গিয়েছিল। সই করার কেউ ছিল না বা সই কেউ দিলেন না। ৭ নম্বর ওয়ার্ড তখন লোকে লোকারণ্য। এমন সময় দু'টা মিলিটারী জীপ এলো আর তরুণ আহতরা,

বিশেষ করে জগন্নাথ হলের ছেলে দু'জন জামা গায় দিয়ে পাবলিক সেজে গেল। অন্য রুমে কি হলো জানিনে, করিডোরে গুলীবিদ্ধ ই. পি. আররা অসহায় ভাবে পড়ে রইলো। তবুও ডঃ টি. হোসেন গোপালকে পাঠালেন সিটি নার্সিং হোম থেকে তার এ্যাম্বুলেন্সটা আনতে। জ্যোতির্ময়ের লাশ নিয়ে যাবেন। এদিকে হলের দারোয়ান ধীরেন দা তো আমার বাগান থেকে সব ফুল নিয়ে এলো। ডাক্তার ওয়াহিদ ও প্রফেসর আলী আশরাফের রুম থেকে নিয়ে এলেন দোলাকে। দোলা ও আরো অনেকে ছড়িয়ে দিলো ফুলগুলো। আমার ঘরে দু'টো ক্যামেরা থাকতেও ফটো তোলা হলোনা। ডাক্তার বললেন "আমার ছোট মেয়ে দোলার বন্ধু, আমি ওকে বেবীর কাছে নিয়ে গেলাম।" তখন আমার প্রাক্তন ছাত্রী ডাক্তার খালেদা বারী, তার স্বামী ও আর্টিষ্ট বন্ধু বজলে মওলা সামনে ছিলেন। দোলা ফুল দিয়ে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে পুতুলের মতো চলে গেল।

আমি ওদের চলার পথে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দোলার কি মনের অবস্থা আমি জানলাম না। ওর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই। যে যা বলছে, সে ভাবেই চলছে। সেই ১৯৬৪ সালের রায়টে সে আমাকে ছেড়ে সুরাইয়াদের মিল ব্যারাকের বাসায় নিরাপদে থাকতে যায়নি। অথচ সেই দোলা ২৮শে মার্চ হাজারী ও জেলীর সঙ্গে ইন্দিরা রোডে চলে গেল। দোলার বাবারও ইচ্ছা ছিল না। সে বলেছিল "দোলাকে কেন দিয়ে দিলে?" আমি বলেছিলাম, "এখানে নিরাপত্তা থাকলেও অন্য অসুবিধা ছিল।" ২৮, ২৯, ৩০শে মার্চ সকালে ওরা দোলাকে দিয়ে যেতো, আমার জন্য টিফিনও পাঠাতো। আমি তো ২৫শে মার্চের কালো রাতের পরে জলীয় পদার্থ আর বার্লী ছাড়া কিছুই গিলতে পারি নি। স্কুলের বেগম দাই হাসপাতালের হিটারে সেদ্ধ ভাত রেঁধে ছিল স্বর্ণের জন্যে। স্বর্ণও খেতে পারেনি। ভাত পান্তা করে রেখে দিল। ২৯ তারিখে দুপুরের দিকে আমার যেন ক্ষিদে পেয়েছে বলে মনে হলো। তখন ডিসে করে একটু পচা পান্তা ভাত মুখে দিলাম। বাঁ হাতটা কেঁপে ভাতের ডিসটা পায়ে পড়ে গেল। সে মুহূর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ভিক্ষের কথা মনে হয়ে চোখে জল এলো। সে দুর্ভিক্ষের কথা মনে করে স্বর্ণ কখনও পচা গলা ভাত ফেলতো না। আমার মা সে দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করে আমাদের ভাত ফেলতে দিতেন না।

অলস চিন্তায় ডুবে ছিলাম। বন্ধু অরবিন্দ চৌধুরী কখন এসেছেন টের পাইনি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্ময়ের সহপাঠী ছিলেন। এইতো গত বছর জুন মাসে জোর করে জ্যোতির্ময়ের একটা জীবনবীমা করালেন। বাড়ি এসে জ্যোতির্ময় দোলাকে বলেছিল, "আমি এখন মারা গেলে তুই দশ হাজার টাকা পাবি। বিশ হাজার পেতিস, তোর মায়ের জন্যই হলোনা।" এ কথা নিয়ে আমি রাগারাগিও করেছিলাম। অরবিন্দ বাবু কথা না বাড়িয়ে দুঃখ না করে, সময় নষ্ট না করে সোজাসুজি বললেন, "আমি পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলাম। তালিকা দেখে এলাম। আপনার ও দোলার পাসপোর্ট হয়ে গেছে ২০শে ফেব্রুয়ারী, জ্যোতির্ময়েরটা হয়নি।" আমি তখন বললাম, "ওর আসল পাসপোর্ট তো হয়েই গেছে। এ

সরকারের পাসপোর্ট আর লাগবে না।" সেই যে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীতে পি, এইচ, ডি করে দেশে ফিরে নবীকরণের জন্য পাসপোর্ট জমা দিলো, আর তা দিলো না। প্রতি বছর সে দরখাস্ত করে। প্রতি বছর ওরা ফেরত দেয়। কিন্তু সে নিরাশ হয় না। দরখাস্ত করেই যায়, পাসপোর্ট নাকি তার নাগরিকত্বের অধিকার। তাকে বিদেশে যেতে দিতে না পারে, তাকে জেলে রাখতে পারে, তবু সে এ দেশের নাগরিক। তাই সে ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভোট হয়ে গেলেই ১৮ই ডিসেম্বর ছবি তুলে পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিলো। এই ছবি তার একমাত্র স্যুট পরা ছবি। ১৯৪৮ সালে তার 'রেডিও প্রোগ্রাম' বন্ধ হয়ে সত্তরের ডিসেম্বরে আবার চালু হলে সে আশায় ভর করে ভেবেছিল, হয়তো পাসপোর্টটাও এবার পেয়ে যাবে। হতাশা তাকে কখনও কাবু করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে সরকারী স্কলারশীপটা যখন মোনায়েম খান গভর্নর কেটে দিলেন, তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুহৃদরা 'No Objcction' লিখে পাসপোর্টটা হাতে দিয়ে বলেছিল, "নিজের খরচে চলে যান।" সেই থেকে তার ছোট ভাই ও দু'বোনকে আর দেখতে পায়নি।

আমার চিন্তাধারা আবার ছিন্ন হলো অরবিন্দের কথায়, "দিন একটা দরখাস্ত। পাসপোর্ট দুটো এনে দিই।" উনি বোধহয় ভেবেছেন এখন এ অবস্থায় আমি আর কি করতেই বা পারি। ভারতে পাড়ি দেয়া ছাড়া? হয়তো উনিও সেই চেষ্টাই করবেন। হয়তো এর মধ্যে উনিও জানতে পেরেছেন কত লোক, হিন্দু-মুসলমান, শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে ওপারে পাড়ি দিচ্ছে। কেমন সহজ ভাবে বললেন, "দিন, আমাকে একটা অথরিটি লেটার লিখে দিন। আমাদেরগুলোর সঙ্গে আপনাদেরটা নিয়ে আসবো।"

কিন্তু আমাকে উনি কোথায় পাবেন? এরপর আমি কোথায় থাকবো কে জানে। তবুও ওনাকে নিয়ে আমি ছাত্রদের Sick রুমে গেলাম। স্কুলের একটা প্যাড ছিল তাতে লিখতে চেষ্টা করলাম। লেখা আসেনি – না ইংরেজী না – বাংলা। তখন শুধু সই দিয়ে বললাম, "আপনি লিখে নেবেন।"

আবার ফিরে এলাম ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। আমার এক খুড়তুতো ভাই কেশব আছে, ডাক্তার টি হোসেন আছেন ডাক্তার ওয়াহিদ দোলাকে তাঁর বাসায় রেখে ফিরে এসেছেন। গোপাল গেছে টি. হোসেনের সিটি নার্সিং হোমে (ধানমণ্ডি ৫ নম্বর) তাঁর এ্যাম্বুলেন্স আনতে। ডাক্তার টি. হোসেন লাশ নিয়ে যাবেন। কিন্তু মেডিক্যালের ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেটে সই দিচ্ছেন না। তখন ওয়াহিদ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন "ওনার তো কোন সংস্কার বা বিশ্বাস ছিলো না! আপনার কি কিছু আছে?" আমি তখন মাথা নেড়ে 'না' বললাম। তিনি যেতে যেতে ফিরে এসে বলে গেলেন, "আপনার যদি কোথাও যাবার জায়গা না থাকে আমার ওখানেই যাবেন।"

কিন্তু যাবো কেমন করে? সে শক্তি আমার কোথায়? কিছুক্ষণ পরে ছোকরা ডাক্তারটি সেনগুপ্ত, এসে বললো, "মাসিমা, আপনি চলে যান। এখানে আর বেশীক্ষণ থাকবেন না।

সার্টিফিকেটটা সই হলে, আমি দিয়ে আসবো।" কোথায় দেবে? আমি যে কোথায় থাকবো এর পর, আমিই তো জানিনে। আমি তো জানি সাধারণ পরিস্থিতিতে বুলেট ইনজ্যুরি পোষ্ট মর্টেম হয়। এখন তো কথাই নেই। ওরা তো ২৫শে মার্চ রাত থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত যত নিধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দীতে, তার স্বাক্ষর তারা রাখতে চায়নি। ফাঁক তালে জ্যোতির্ময়ের মত কেউ এড়িয়ে গিয়েছে গণকবর। ভাবছি কেন যে ওরা সেই রাতে আর আমাদের ঘরে দ্বিতীয়বার ঢোকেনি। ওরাই জানে। আবার ফিরে এলেই যে কী হতো? হয়তো আসামীকে জ্যান্ত কবর দিতো।

গোপাল এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলো। আমি তখন আমার জিনিসপত্র গুছাতে সিক্ রুমে গিয়ে দক্ষিণের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম এ্যাম্বুলেন্সটা ঠেসে দু'দিকে দু'টো জীপে দু'জন করে মিলিটারী অফিসার বসে আছে। বুঝলাম গোপালেরও ফেরার পথ বন্ধ। আমি অগত্যা জরুরী জিনিসপত্র ট্রাংকে গুছিয়ে বসে আছি এমন সময় মিসেস ফিরোজা বারী তার দ্বিতীয় মেয়ে যূথীকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। বললেন, "অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে।" আমি কিছুই বলছিনে দেখে তিনি আবার বলতে থাকলেন, "বারী সাহেব ও আমি ২৭শে তারিখে কার্ফিউ খোলার পর পরই আপনাদের খোঁজে এসেছিলাম। ৩৪ নম্বরের সিঁড়ি কোঠায় রক্তের স্রোত দেখে মনে হলো এসব বাড়িতে আর কেউ বেঁচে নেই। আমার স্বামী অসুস্থ বোধ করলেন।" একটু থেমে আবার বললেন, "তারপর ২৮ তারিখে রাতে হাজারীকে ফোন করে সব জানলাম। বারী সাহেব খুবই অসুস্থ। তাই আমি আজ যূথীকে নিয়ে এলাম।" আমি তবুও কিছুই বলছিনে দেখে তিনি আবার বললেন, "আপনি আমাদের বাসায় চলুন।" আমি তখন উত্তর দিলাম, 'না। আপনার বাড়ির উল্টোদিকে সবুর খানের বাড়ি। তিনি আমাকেও চেনেন। জ্যোতির্ময়ের পাসপোর্টের ব্যাপারেও বারদুয়েক গিয়েছিলাম।" তখন বেগম ফিরোজা বারী বললেন, – "তাহলে আপনার মেয়েকে দিন। ওর মতো মেয়ে আমার ওখানে আরো দু'তিনজন আছে।" আমি তাতেও রাজি হলাম না। বললাম, "আমি তো মেয়েকে দেখতে ওখানে যেতে পারবো না। তাছাড়া বারী সাহেব অসুস্থ।" অগত্যা তিনি বলেন, "তাহলে আমাদের গাড়িতেই চলুন যেখানে বলবেন নামিয়ে দেবো।" এবার আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ৭নং ওয়ার্ডে স্বর্ণর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। সে উনিশ বছর ধরে আমাদের সেবাযত্ন করেছে, আমার মেয়েকে জন্মের থেকে লালন পালন করেছে। তার কাছেই 'দাদা বাবুর' লাশ রেখে এলাম। ওর চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল, আবার নতুন করে বইতে শুরু করলো। স্বর্ণ এবার সত্যিই অসহায় বোধ করলো। আমি গোপালকে বললাম, "তুমি যেখানে যাবে, স্বর্ণকে নিয়েই যাবে, গোপাল।"

আমি সিক্ রুমে এসে ছেলেদের সবাইকে পেলাম না। আমার ট্র্যানজিসটারটাও নেই। দু'তিন জন ছেলে ছিল, তাদের জিজ্ঞেস করলে একটি ছেলের নাম বললো। তাঁকে খুঁজতে গেল দুজন। এতসব জিনিস বাসায় ফেলে এলাম, বলতে গেলে গোটা সংসারটা,

প্রিয়জনকেই তো হাসপাতালে ফেলে যাচ্ছি—আর ঐ একটা ট্র্যানজিসটারের জন্যে আমার যাওয়া হচ্ছে না? আসলে ওটা আমার নয়, আমার স্কুলের সম্পত্তি। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ তো ওটার দায়িত্ব আমারই। যূথী তো অবাক হচ্ছে আমি এই সামান্য একটা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি দেখে। অবশেষে ওটা এলো। গোপালকে সব ভার দিয়ে আমি বেগম ফিরোজা বারীর সঙ্গে এমারজেন্সি গেটে দাঁড়ানো তাঁর ভকসওয়াগেনে উঠলাম। সিঁড়ির উল্টো দিকে চারজন মিলিটারী পাকা রেলিংয়ে বসেছিল – একজন গাড়ির নম্বর টুকে নিলো।

গাড়ি চললো সোজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের রাস্তা ধরে। দেখলাম শহীদ মিনারের মোড়ের মাথায় পেট্রোল পাম্পের কাছে ইয়াহিয়ার কবরটা নেই। কবরের উপরে একটা টিনের থালায় লাল, নীল, সবুজ জলের শিশি ছিল। মিলিটারীরা শহীদ মিনার ভাঙার আগেই ছেলেদের কুকীর্তির নিদর্শন ভেঙে দিয়েছিল। শহীদ ডঃ জি. সি. দেবের বাড়ির কাছে গাড়িটা আসতেই আমি বাঁয়ে ফিরে জগন্নাথ হলের প্রাণী শূন্য মাঠে 'গণকবর'টা দেখে নিলাম। চিনতে কোন অসুবিধে হল না। সেদিন, ২৬শে মার্চ, সারাদিনই কবর খোঁড়ার শব্দ আসছিল, এ কোন থেকেই। ঠিক সে জায়গাটায় সবুজ ঘাস নেই, মাটিটা একটু উঁচু হলেও সমান। ওরা তো বুলডজার চালিয়ে কবর ঢেকে দিয়েছে। কারোর বাবারও সাধ্য নেই বা সাহস নেই যে আপন জনের লাশ তুলে নেবে।

ছাত্র–শিক্ষক–কেন্দ্রের মোড়ে এলে দু'জন বন্দুকধারী গাড়িটা থামিয়ে দিল। আমি ভয় পেলাম —বুঝি আমাকেই নামিয়ে নেবে। মিসেস বারীর গাড়ির সামনে কাঁচের উপরে কাগজের বাংলাদেশের নিশান লাগানো ছিল। টেনে ঘষে নিশান কিছুটা উঠিয়ে নিল। ড্রাইভার মাপ চাইল, "ভুল হোগিয়া।" ভাগ্য ভালো যাত্রীরা সবাই মেয়ে মানুষ ছিলাম। ওরা গাড়ির পেছনের বুট ও সামনের সীট তল্লাসী করে ছেড়ে দিল। গাড়ি রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে নীলক্ষেতের ভেতর দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে চললো। সে মোড়েও বাচ্চারা আরেকটা কবর—ভূট্টোর কবর বালি দিয়ে বানিয়েছিল। সেটাও আর নেই। নিউ মার্কেটের উল্টো দিকের কোন ছোট দোকান থেকে যূথীরা তেল ও দুধ কিনে নিলো। আমি ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায় যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসেস বারীকে বললাম, "আমাকে ২০ নম্বর ধানমণ্ডিতে নামিয়ে দেবেন।" পথে মিসেস বারী আমাকে অনেককিছু জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর শেষ প্রশ্ন ছিল, "উনি শেষ কথা কি বলে গেলেন?" "তিনি তো সে ভাবে কিছুই বলেননি —না দোলাকে, না আমাকে। তবে ২৭ তারিখে বিকেলে হাসপাতালে যখন ওর খুব খারাপ লাগছিলো, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তখন একবার বলেছিলো, 'এবার তোমরা যাও।' আমি বলেছি 'কোথায় যাবো? কেন যাবো তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে?' সে তখন আবার বলেছিল, 'যাও, যেখানে আগে যেতে চেয়েছিল।' যারা পাশে ছিল, 'ভাবলো প্রলাপ বকছে। আসলে সে সজ্ঞানেই বলেছে হাসপাতালে।' এমনকি অনেকেই যখন অধ্যাপক রাজ্জাক

সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করেছেন তখন আমি সব কথাই বলেছি। কিন্তু জ্যোতির্ময় চোখ বুজেই বলেছে, "যা জানো সব বলো কেন?" সে নিশ্চয়ই প্রফেসর রাজ্জাকের বিপদের কথা ভেবেই এসব বলেছে। তার মানেই সে সচেতনভাবেই বলেছে।

কথায় কথায় আমরা ২০ নম্বর ধানমণ্ডির ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায় এসে গেলাম। বাড়ির সামনে লোকজন নেই, পথেও লোকজন বিশেষ দেখিনি। থাকলেও কেউ কারো দিকে চায় না, আপন মনে চলে যায়। বেল টিপলে কে যেন দরোজা খুলে দিলো। আমি ড্রইং রুমে বসলাম। মিসেস ওয়াহিদ ও তাঁর এক বিধবা বোন আমার কাছে এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। কথা আর কি। কথা তো একটাই, কি হলো, কেমন করে হলো। এ বাড়িতে কেউ জানতো না আমি যে এখানে উঠবো। বেলা প্রায় একটার দিকে ছেলেরা মেয়েরা খেতে গেল। মিসেস ওয়াহিদ আমাকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। আমি বোধহয় কাপড় জামা বিশেষ কিছু আনিনি, তাছাড়া হাতে পায়ে জোরও নেই স্নান করার। মুখ ধুতে ধুতে কিছুক্ষণ চোখের জল ফেললাম। তারপর হাল্কা হয়ে গিয়ে টেবিলে বসলাম। কোন রকমে একটু একটু করে গিলে নিলাম। দুপুর, বিকেল সোফায় বসে কাটালাম। যিনি বা যারা আসেন, সবাই একই প্রশ্ন করেন, আমিও একই উত্তর দেই। এভাবে কথা বলে বলে একটু হাল্কা হলাম।

রাতের খাওয়ার পর মনে হলো এ বাড়িতে অনেকেই আশ্রিত আছেন। ডাক্তারের বৃদ্ধা শাশুড়ি, ছেলে ও বৌ নিয়ে, বিধবা শ্যালিকা ছেলে ও মেয়ে নিয়ে, বাড়ি ভর্তি লোক। রাতে ড্রইং রুমে কার্পেটের উপর চাদর বিছিয়ে শয্যা হলো। ডাক্তারের তিন মেয়ে, আমার মেয়ে, শ্যালিকা ও তার মেয়ে দু সারি করে বালিশ পেতে শুলো। বড় মেয়ে নানী, মামীর সঙ্গে, তার পাঁচ মাসের বাচ্চা মেয়ে নিয়ে এক ঘরে, ডাক্তার সাহেব নিজে ছেলের ঘরের মেঝেতে শুলেন বিয়ে বাড়ির মতো ভর্তি লোক, কেবল কোন হৈ চৈ নেই।

এত দুঃখেও আমার ১৯৩০ সালের ঢাকা রায়টের সময়ে আমাদের ফতুল্লার বাড়ির দৃশ্যটা আমার চোখে ভেসে উঠলো। আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা গেণ্ডারিয়া ও স্বামীবাগ থেকে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। দোতলার বড় হলে প্রায় ৪০/৪৫ জন সারি বেঁধে শুয়েছিল প্রায় পনের দিন ধরে। ঢাকার লোক ছাড়াও আমাদের পাড়ার মেয়ে–বৌরাও রাতে শুতো আরো দুটি কোঠায়।

খাবার দাবার কোন অসুবিধে ছিল না তখনকার দিনে, তাছাড়া আমার বোনের বিয়ে উপলক্ষে অনেক খাদ্য সামগ্রী জমা। ভয় আতংকে তখনও, এখনও আছে। তবে সে ভয় আর এভয় এক নয়। রাতে শুয়ে ১৯৬৪ সালের রায়টে সাধনা ঔষধালয়ের রিফিউজি ক্যাম্পে তেতলার একটি শোবার ঘরের দৃশ্যের স্মৃতি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কোলের শিশু, তরুণী ও মা মিলে পঁচিশ জনের সারাদিন রাত একই ঘরে কাটানো। এখানে তো আমি আরামেই আছি। এ বাড়ির তিন মেয়ে আমার ছাত্রী, তারা যথেষ্ট দেখাশুনা, আপ্যায়ন করে। মিসেস ওয়াহিদ ও আমি জোড়া খাটে শুই দুটো মাশারী খাটিয়ে ফ্যান

চালিয়ে। কিন্তু মনে শান্তি নেই, তাই ঘুমও নেই চোখে। কেবল ভাবি লাশটির কি হলো? গোপাল ও স্বর্ণ কোথায় কেমনভাবে আছে কে জানে!

তবুও রাত শেষে ভোর হলো। মেয়েরা কার্পেটের বিছানা পরিষ্কার করে ড্রইং রুম সাজিয়ে পরিপাটি করে ফেললো। খুব কাজের মেয়ে ওরা। এতগুলো লোকের চার বেলা খাবার ব্যবস্থা সবই করছে ওরা। কোন হৈ চৈ নেই, সাড়াশব্দ নেই। সকালের নাস্তার পর ডাক্তার সাহেব জানিয়ে দিলেন কেউ যেন বাইরের বাগানে বা বারান্দায় না যায়। দোলাকে নিয়ে তিনি একটা ছোট ঘরে গেলেন। কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এলে, আমি দোলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করলিরে?" দোলা বললো, "ডাক্তার সাহেব সুরা শিখিয়ে দিলেন।" আমাকে কিছু শেখালেন না। দুপুরে স্নানের পর দেখি দোলা বেবীর সালোয়ার কামিজ পরে আছে। এও নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে। পূবদিকের জানালাগুলো সব বন্ধ। দেয়ালের ওপাশে একটা বড় দোতলা বাড়ি। চাইনিজদের অফিস, অনেকে দোতলায় থাকেও। খুব জোরে গান শোনা যায়। ডাক্তার বললেন, "ওদিকে আপনি যাবেন না, সামনের গেটের কাছে তো কখনই যাবেন না।"

কেন যাবো না? এ বাড়িতে তো সবাই বাঙালী। হিন্দু-মুসলমান তো গায়ে লেখা নেই। তবে কেন? আমার মন পড়ে আছে সিটি নার্সিং হোমে, যেখানে গোপাল আর স্বর্ণ আছে, এবং মেডিকালে যেখানে লাশ আছে। বাইরে একা যাবার সাহস নেই, তাছাড়া ডাক্তারের আদেশও নেই। যখন সেভারজেট্ চারটা এক সঙ্গে ধাঁ করে যায় আবার মিনিট পনের পরে ফিরে আসে, তখন মন আনচান করে বাইরে গিয়ে দেখতে। হয়তো কোথাও বোমা ফেলে এলো। অবস্থা তো তাহলে সঙ্গীন মনে হচ্ছে। সত্য ও গুজব অনেক শোনা যায় তাদের কাছে, যারা বাইরে থেকে আসে। সুরাইয়ার কাছে যেতে ইচ্ছা করলো আমার, কিন্তু উপায় নেই। ফোন করে তো এসব কথা জানা যায় না। যাওয়াও ঝামেলা। ডাক্তার বলবেন, "এটা বেড়াবার সময় নয়। তাছাড়া পুলিশ অফিসারের বাড়ি আমার কি যাওয়া উচিত?"

অনেক মানসিক ছটফটানির পর দিনটা শেষ হলো। ঢাকার বুকে নারকীয় অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। কার্ফিউর মধ্যে ফুটফাট গুলির শব্দ ভেসে আসছে। এখানে ভয়ের রাজ্য কার্ফিউর সময়, রাতের অন্ধকারে। কোথায় কি ঘটছে কেউ জানতে পারছে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঢাকা শান্ত। অথচ ঘুপচি-ঘাপচিতে কী না ঘটছে। মালাকার টোলা, তাঁতী বাজার। নয়াবাজারে বোধহয় কাঠের গোলা এখনও ধুঁকে ধুঁকে জ্বলছে। গোপাল যখন গেণ্ডারিয়া যাবার পথে এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে গেছে তখন তো ওর ভয় কেটে গেছে। ঢাকা মেডিক্যালের নারকীয় দৃশ্য থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই নরকের আগুনের ভেতর দিয়েই গোপাল চলে গিয়েছিল গেণ্ডারিয়া। সেখানে ও আশ্রয় নিয়েছিল ৭ নম্বর দীননাথ সেন রোডে স্কুলের হোস্টেল বাড়িতে। সেখানেও রাতের বেলা সাত আটজন মুক্তিযোদ্ধা। হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে। সে রাতেই লোহার পুলের হত্যাকাণ্ড। শান্তি নেই

কোথাও। পরের দিন সাধনা ঔষধালয় আক্রমণ করার জোর গুজব। পূর্ণবাবু ও সুধীর বাবুর বাসায় গিয়ে গোপাল ঢাকা মেডিকেলের খবর, ২৬শে মার্চের খবর দিয়ে বলে, "দু'দিন ভাত খাইনি, আমারে একটু ভাত দিন।" সেখানে তারা তখন পালাবার ব্যবস্থা করছে, গোপাল ভাত খেয়ে চিড়া গুড় গামছায় বেঁধে ফতুল্লায় রওনা দেয়। সে ২৫শে মার্চ মোকাবেলা করেছে, শহীদ মিনার, জগন্নাথ হলের নারকীয় যজ্ঞ দেখেছে, সে কিনা গুজবের ভয়ে ঢাকা ছেড়ে ফতুল্লার দিকে ছুটলো। গোপাল বেচারা! জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা তাকে ফেলে যদি চলে যেতে পারলো, তবে সে গেণ্ডারিয়া ছেড়ে ফতুল্লায় যেতে পারবে না কেন? বিপদের সম্মুখীন হওয়া এক জিনিষ আর বিপদের আগে পরের চিন্তা করা আরেক ব্যাপার। তাইতো বলে 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।' এসব আমার ৩১শে মার্চের নিশীথ চিন্তা। আমার ঘুম তো পালিয়ে বেড়ায়।

পয়লা এপ্রিল সকালে বেপরোয়া হয়ে ডাক্তার সাহেবকে বললাম, "আজ গেণ্ডারিয়া যাবার পথে আপনি আমাকে সিটি নার্সিং হোমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।" দোলাকে নিয়েই আমি ওনার সঙ্গে ডাঃ টি. হোসেনের সিটি নার্সিং হোমে গেলাম। দুই ডাক্তার আলাপ আলোচনা করে জানিয়ে গেলেন পরের দিন ফেরার পথে আমাদের তুলে নেবেন। আমি প্রথমে নিচের বিরাট হল ঘরটা পেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দেখি স্বর্ণ বাইরের কলতলায় বসে দাদাবাবুর রক্ত মাখা চাদর ও তোষকের রক্ত ধুচ্ছে। আমাকে দেখেই কাঁদতে লাগলো। আমি বললাম, "এ রক্তমাখা তোষকটা কেন হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলে, স্বর্ণ?" স্বর্ণ বললো, "এটা দাদাবাবুর চিহ্ন, এটা থাকবে। ক্যান, বাড়িতে মারা গেলে তার জিনিসপত্র কি সব ফ্যালাইয়া দ্যায়?" সুতরাং তোষকের রক্তও সে ঘষে ঘষে তুলে এপিঠ ওপিঠ করে রোদে ফেলে শুকালো সারা দিন ধরে। বুঝতে পারছি কিছু একটা করে সময় কাটাচ্ছে। পুরানো মানুষ কেউ নেই যে কথা বলে দুঃখ কমাবে। অচেনা জায়গা, হাসপাতালের খাওয়া ওর গলা দিয়ে যায় না। ওকে বলি, "রোগীদের জন্যে রান্না সবাই খাচ্ছে, আমরা খেলাম। তোমার গলা দিয়ে যাবে না কেন? তুমি আসলে তোমার চেনা মহলে চলে যেতে চাও। হাসপাতালেই কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা যায়।"

দোতলার লম্বা-চওড়া বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা বড় রুমে দুটো বেড, একটা বাথরুম। রাস্তার দিকে সে ঘরটা আমার জন্য নির্ধারিত হলো। সে রুমে যাবার পথে বাঁদিকের একটি ঘরে সোফা সেটে বসে আছেন একজন একা, উসকো খুসকো চেহারা, ভীত। রোগী বলে মনে হলো না। মনে হলো আত্মগোপন করে আছেন। আসা যাওয়ার পথে দেখি কেবলই সিগারেট টানছেন। বিহারী বলে মনে হলো। ভয় পেলাম। কিন্তু ডাক্তারের মেয়ে আজরার সঙ্গে দোলা ও ঘরে যাচ্ছে আসছে। পরে দোলাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আজরা বলেছে উনি খন্দকার মোশতাক আহম্মদ। দোলার নাম জানতে চাইলে আজরা বললো, "মেঘনা।" তখন তিনি বললেন, "ও! পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।"

অন্য ঘরেও লোকজন আছে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিনে। দোলা তো তার বান্ধবীর সঙ্গে এঘর-ওঘর, একতলা-দোতলা করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তারের পাত্তা পাচ্ছিনে। তাঁর স্ত্রী হাসমত আরা (পারভীন হোসেন) রান্নার ব্যবস্থা করছে, নয়তো বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত আছে। তার কোলের ছেলেটার বয়স মাত্র পাঁচ মাস। দুপুরে বা রাতে কী যে খেয়েছিলাম, আজ ১৮ বছর পরে তা আর মনে আসছে না। বোধহয় দুপুরের খাবার আগেই ডাঃ টি. হোসেনের সঙ্গে দোতলায় দেখা হলো, দোতলার বারান্দায় বসে ব্যক্তিগত আলোচনা হলে বললেন, "আমি তো ১৯শে মার্চই বলেছিলাম জ্যোতির্ময়কে বাড়ি, মানে জগন্নাথ হলের বাসা ছেড়ে চলে যেতে। সে তো আমার কথা শুনলোই না। উল্টো যুক্তি দেখালো।" আমি ভাবছি ডাক্তার আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাই আমি মুখ খুললাম, "কী যুক্তি দেখালো?" "জ্যোতির্ময় আমাকে বললো, "দ্যাখো, এসব মুভমেন্টের দ্বারা কোন সুফল হবে বলে মনে হয় না।" "তখন আপনি কি বললেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। ডাক্তার তাঁর উত্তর দিয়েছেন, "কেন হবে না? দেশ অবশ্যই স্বাধীন হবে?" "তখন জ্যোতির্ময় একটা ছোট বক্তৃতা দিলো, "দ্যাখো তাজুল, স্বাধীনতা আমরা বৃটিশদের থেকেও পেয়েছিলাম। হিন্দুরা তখন সব ছিল আমাদের শত্রু। সেই বেশির ভাগ হিন্দুরা চলে গেলে পর পূর্ববাংলার মুসলমানরা তো সব স্বাধীনতা পেলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা এসে আবার শাসন বসালো। পূর্ববাংলার হিন্দুরা যদি এদেশে থাকতো, তবে বাঙালী মুসলমানরা কম্পিটিশন করে এদেশে আত্ম-উন্নতি করতে পারতো। এখনও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা এখানে থাকে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা ভাগ নিতে পারে। কিন্তু তারা চলে গেলে, স্বাধীন হলে, কতখানি যে এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হবে, আত্মঘাতী হবে, না সিভিল ওয়ার হবে, না নিজেদের মধ্যে মারামারি হবে সেটা এখন থেকে বলা বড়ো শক্ত কথা।" বা! আমিও একটা ছোটখাটো বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি শুনে গেলাম।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটাই কথা, "লাশ কি হলো?" আমি তখন ডাক্তার টি. হোসেনকে বললাম, "আচ্ছা! কেন লাশটা আমাদের দিলো না, কেনই বা এখনও পোষ্ট মর্টেম করেনি?" ডাক্তার বললেন, "দিতে পারলে তো আমাকেই দিতো। আমি কি কম চেষ্টা করেছি? সার্জারীর প্রফেসর আলী আশরাফ আমার বন্ধু মানুষ। তাকে তো আগেই বলেছিলাম, 'জ্যোতির্ময়ের চিকিৎসা আমি করবো, আমার নার্সিং হোমে।' তখন তিনি কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন, "আপনি কেমন করে নেবেন? প্রথম কথা হলো আপনি নিতে গেলে মিলিটারী পথে আপনাকে ধরবে। তারপর যে কারণে ওনাকে গুলী করেছে সে কারণে আপনাকেও গুলী করতে পারে। তৃতীয় কারণ, এখনও এ হাসপাতাল থেকে কোন বডি (বা আহত) বের করা সম্ভব না। তাছাড়া আপনার বন্ধুর অবস্থা এমন যে তিনি একটু নড়াচড়া করলে, যে কোন মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। পঞ্চম কথা এখানে যেসব চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, আপনি তা করতে পারবেন না।'

আমি তখন বলছি, 'ব্যবস্থার কি নমুনা, তাতো দেখেছি। প্লাগ পয়েন্ট ঠিক নেই, সকেটে কারেন্ট আসে না। গলা পরিষ্কার করতে সাকশন মেশিন কাজ করে না, অক্সিজেন দেওয়া যায় না। হাজারী সব ব্যবস্থা করলো, তবে তো।'

"শুনুন বাসন্তীদি," তিনি আরও বললেন, 'ওনাকে আপনার নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে মিলিটারী তো আপনার নার্সিং হোমে গিয়ে উঠবে। তখন আপনি কি করবেন?' উনি যদি মারা যান, সে ডেড বডি নিয়ে আসবেন কি করে?' তখন আমি আরো বললাম 'দুটো X-Ray প্লেট দরকার ছিল, তাওতো ছিল না।'

গৌরাঙ্গ মিত্র, এখন হলিক্রসে অধ্যাপনা করে, সে আর তার বন্ধু, জ্যোতির্ময়ের ছাত্র আবদুল মোনেম সরকার (ন্যাপ) নতুন ঢাকায় পাঁচ–ছটা X-Ray Clinic – এ ঘুরে সবশেষে অনেক কষ্টে দুটো প্লেট যোগাড় করেছিল ইসকাটনের জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাইয়ের X-Ray Clinic থেকে। সময়টা খুবই খারাপ ছিল। শেষ পর্যন্ত উনি টাকা নেননি গৌরাঙ্গের কাহিনী শুনে। তাঁর নাম জনাব নুরুল আমিন।

ক্রম*শ যত বিকেল হতে থাকলো, ডাক্তারের দুই ছেলে আরও গুজব শুনে এলো। সন্ধ্যার আগেই ধানমণ্ডির দুই নম্বর রোডে গুলীর ফুটফাট শব্দ হতে লাগলো। ছেলেরা ছাদ থেকে নেমে জানালো রাতে তল্লাশি হতে পারে। ডাক্তারের দুই ছেলে নিয়ে ভয়, তারপর আমাকে নিয়ে। ছেলেদের কী ব্যবস্থা করলো জানিনে, আমাকে সন্ধ্যার পরে বললো, "বাসন্তী দি, আপনি যেন আমার বোন, জাহানারা! আপনি অসুস্থ শুয়ে থাকুন।" তাই থাকলাম। টি–পয়ের উপরে প্রেসারের ওষুধপত্র সব সাজিয়ে, স্বর্ণ আয়া সেজে আমার সেবা করতে বসলো। আমি ভাবছি বোন যদি তবে আবার রোগী সেজে থাকা কেন? বাপ–দাদা কারো নাম জানিনে। বানিয়ে বললে তো ধরা পড়ে যাবো। তার চেয়ে রোগী সেজে ইচ্ছামতো খৃষ্টান হয়ে নাম বানাতাম। ধরা পড়ার ভয় থাকতো না। আরে! মিথ্যে বানিয়ে বলাই কি এত সহজ? তাহলে ২৫ মার্চের কালো রাতে বাইবেল সামনে রেখে, যীশুর ছবি রেখে প্রার্থনার বই কোলে নিয়েও তো মিথ্যে কথা বলতে পারতাম মিলিটারীদের। কিন্তু তাতো মুখ দিয়ে বেরুলো না। বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়ে তো জ্যোতির্ময় বলতে পারলো না সে খৃষ্টান। আমার মত অনেক ঘরেই হয়তো এ রকম ভাবছে। সেই কালো রাতে তো ডঃ মনিরুজ্জামান নামাজ পড়েছিলেন। কিন্তু আমি তো এখনও বলতে পাচ্ছিনে 'O' Lord save us in our agony!' কাজেই কে আমাকে শান্তি দেবে? শান্তি, সান্ত্বনা তো ভেতরের, বাইরে থেকে কেউ দিতে পারে না।

রাত আটটার সময় মনে হচ্ছে মধ্য রাত। কিছুক্ষণ পরে খুব নীচু হয়ে হেলিকপটার ঢাকার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরছে। অজানা আশংকায় দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলাম। আমাদের রাস্তায়, ৫নং রোডে মীরপুর রোড থেকে দুটা একটা গাড়ি ঢুকলেই কান খাড়া করে থাকি। এক সময়ে বাথরুমে চেয়ার নিয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে রাস্তায় চেয়ে থাকি অন্ধকারে।

কতক্ষণ আর এভাবে ওৎ পেতে চেয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ২৫শে মার্চের রাতে তো সাঁজোয়া বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণ। এখন যেন মনে হচ্ছে নেকড়ে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আর আমরা তারই আসন্ন আগমনের অপেক্ষায় আছি। আবার বিছানায় যাই, স্বর্ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। রাত প্রায় দশটায় নিঝুম রাত, ভারী গাড়ির শব্দ হচ্ছে। এ শব্দ আমার ২৫শে মার্চের চেনা শব্দ। আবার বাথরুমের চেয়ারে দাঁড়িয়ে চুপি দিয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছে এখনি কিছু হতে যাচ্ছে। হেলিকপটার খুব কাছেই ঘুরঘুর করছে। হ্যাঁ। ঠিকই। মীরপুর রোড দিয়েই ৫ নম্বর ধানমণ্ডিতে ঢুকছে প্রথমে একটা জীপ, মধ্যখানে একটা ঢাকনা দেয়া গাড়ি, পিছনে আরেকটা জীপ। আস্তে সিটি নার্সিং হোম ছেড়ে ভেতরের দিকে গেল। এখানে ঢুকলো না। বাঁচা গেল। কিন্তু কোথাও গুলীর শব্দ হলো না। প্রায় মিনিট বিশেক পরে গাড়ি তিনটি ফিরে গেল। কিছুই বুঝলাম না, হয়তো কাউকে ধরে নিয়ে গেল। একটু পরে হেলিকপটারের ঘুরতি থামলো। সে রাতে আর ঘুম হলো না, আবার কখন কি হয়।

পরের দিন ভোরে (২রা এপ্রিল) জানলাম ডাঃ তাজুল হোসেনের কাছে। গিয়ে সব খবর নিয়ে এসেছেন। কর্নেল আবদুল হাইকে যশোরে গুলী করে তাঁর লাশ ও জিনিসপত্র সব তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে দিয়ে গেছে ও তাঁর স্ত্রীকে বলে গেছে, "খবরদার; কান্নাকাটি করবে না। আমরা কাল সকাল বেলায় আসবো।" টি. হোসেন, মেডিকেলের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ডঃ ওয়াহেদ, অন্যান্য আরও প্রতিবেশী গিয়েছিলেন। টি. হোসেন তাঁর এ্যাম্বুলেন্স দিতে চেয়েছেন আজিমপুরে লাশ নিয়ে যেতে। তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। মিলিটারীরাই নিয়ে যাবে বলে। তাই এরা বাসাতেই জানাজা পড়ে এলেন কোন রকমে।

একটু বেলা হলে স্বর্ণ গেণ্ডারিয়া চলে যাবার জন্যে বায়না ধরলো। ওর ধারণা এ পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে শান্তি পাবে। স্বর্ণ শান্তির মরীচিকার পিছনে চলে গেল। চা, চিনি, চাল –যা একটু একটু ছিল, হরলিকস, ওর জামা-কাপড় যা সঙ্গে ছিল – নিয়ে চলে গেল। গোপাল মেডিক্যাল থেকে বাসে তুলে দিল। বাহ্, শহরে বাসও চলছে। গোপালকে বলেছিলাম দাদাবাবুর লাশের খোঁজ নিতে। ফিরে এসে গোপাল জানালো, "লাশ এখনও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভেতরের বারান্দায় আছে।" ৭২ ঘন্টা হয়ে গেছে এখনও পোষ্ট মর্টেমে যায়নি লাশ? কিছুই করার নেই আমাদের।

দুপুরের আগেই ঝুড়ি ব্যাগে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় নিয়ে নিলাম। নেবোইবা কি? হাসপাতালে যে বাক্সটা নিয়েছিলাম, সেটাই তো এখানে এসেছে। তাতে যে ক'টা শাড়ি সে তো পোশাকী শাড়ি। পোশাকী শাড়ি তো এ পরিবেশে পরা যায় না। রোজ যেমন পোলাও খাওয়া যায় না। ভাত চাই। বাক্স খুলে আমার 'এ্যানা বোস' –এর কথা মনে এলো। বাবা মরে গেলে ওরা গরীব হয়ে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলে প্রাইমারী সেকশনে চাকরি দিয়েছিলাম। সে মেয়েটি রোজ সিল্ক ও পুরানো বেনারসী শাড়ি পরে আসতো। প্রথমে আমরা

হেসেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম ওরা শাড়ি কিনতে পারে না। সত্য প্রমাণ হলো যখন মাইনে পেয়েই দু'খানা নতুন সুতির শাড়ি কিনলো। আমার অবস্থায় আজ আমারই হাসি পেলো। দু'খানা নাইলন শাড়ি ছিলো সঙ্গে নিলাম। সব পরিবেশে পরা যাবে। দোলা এখানে আজরার সঙ্গে গল্প করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভালই আছে।

দুপুরের দিকে ডাক্তার ওয়াহিদ আমাকে নিয়ে যেতে এলেন। গতদিনের কাহিনী তাঁকে জানালে তিনি ডাঃ টি. হোসেনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "এত ভয় পেয়ে নাম না বদলালেই পারতেন। আমাকে ফোন করে দিলে আমি এসে নিয়ে যেতাম।" যাক আমি দোলাকে নিয়ে আবার ২০ নম্বর রোডে ডঃ ওয়াহিদের বাসায় ফিরে এলাম। গোপাল সিটি নার্সিং হোমের ড্রাইভার হয়ে ওখানেই থেকে গেল। পুরো এপ্রিল মাসটা আমরা মা-মেয়ে এ বাসায় ছিলাম। তখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কথা কিছুই বলিনি। বলার কিছু ছিলো না। আমাদের নিজের বাড়িঘর নেই, সংসার নেই। কিছুই করতে হয়না, কোন দায়দায়িত্ব নেই। খাবার সময় খাই, কেউ কথা বললে কথা বলি। এ বাড়ির কেউ তো বাইরে যায় না, তিনি একমাত্র ডাক্তার সাহেব। তিনি যা শোনেন তা কিছুই বলেন না, যা নিজের চোখে দেখেন, তা-ও খুব কম বলেন, পাছে বাড়ির মেয়েরা ভয় পায়। হায়রে তিনি পরিবারের সকলকে ভয়ের থেকে আড়াল করে রাখতে চান!

এভাবে দম আমার বন্ধ হয়ে আসছিল। ভাল খেয়ে-পরে আরামে থেকেও মনের মধ্যে আমার স্বস্তি ছিলো না। পরিবেশটা তো জেলখানা, সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। পরের দিন সকালে ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেলে, আমিও "একটু বাইরে যাই" বলে ৩ নম্বর ধানমণ্ডিতে সুরাইয়াদের বাসায় চলে গেলাম। সুরাইয়াও আমাকে দেখে অবাক। এ সময়েও আমি যে ঘুরে বেড়াতে পারি, সুরাইয়া ভাবতে পারেনি। ও তো সবই শুনেছে, তবুও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো। একবেলা ধরে দু'জনে অনেক কথা বললাম। হাকিম সাহেব তো অফিসে গেছেন।

সুরাইয়ার সঙ্গে পরিচয় সেই একান্ন সাল থেকে। ও যখন অনার্স বা এম, এ পড়ে, আমি তখন প্রাইভেটে এম, এ পরীক্ষার সময় বিশেষ বিশেষ ক্লাস করতাম প্রয়াত ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহর সদয় অনুমতি নিয়ে। তাছাড়া সুরাইয়া কিছুদিন মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলো। সরকারী কলেজ প্রথমে ইডেনে যোগ দেয়, তার পর ও একাত্তরে জগন্নাথ কলেজে ঢোকে। তার স্বামী হাকিম সাহেব নীতিবান পুরুষ। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক রায়ট থেকে অনেক বিপদ আপদে আমাদের সাহায্য করে আসছেন। গেণ্ডারিয়ায় সুরাইয়ার শ্বশুর বাড়ি, ওদের ড্রাইভারও গেণ্ডারিয়ায় থাকে। এখানে এলে আমি ওপাড়ার ও বাইরের খবর অনেক পাবো। অনেক আন্তরিকতায়, অনেক কথা শুনে ও বলে মনটা হাল্কা করে ২০ নম্বরে ফিরে এলাম।

৬ই এপ্রিল ভোরে গোপাল এসে জানালো আমাদের ৩৪ এর বাসায় ৪ তারিখে চুরি হয়ে গেছে। গোপাল আরও বললো, "কাল হাসপাতালে গেছিলাম। দাদাবাবুর লাশ সেই বারান্দায়

আর নেই। ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। বললো 'ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। আপনিও আর আসবেন না। আসলে আপনার বিপদ হতে পারে।" গোপাল আরও বললো, "আপনার ছাত্রী (নার্স) ভারতীদির সঙ্গে দেখা হইছিল। বললো, বেডকভারটা কাকে যেন দিয়া দিছে।" আরও জানাল, "মেডিকেলের ছাত্ররা নাকি দাদাবাবুর লাশটা পরীক্ষা করার জন্য চাইছে, প্রফেসর দেন নাই।" হায়রে। আমি কেন প্রফেসর আলী আশরাফকে অনুমতি দিয়ে আসি নি। হাসপাতাল থেকে আসার সময় আমার মাথা ঠিক ছিল না। আমার স্বামী একদিন কথায় কথায় দোলাকে বলেছিল, "আমি মারা গেলে আমার 'ব্রেইনটা' পরীক্ষা করিয়ে দেখিস, কেমন sharp ছিল। আমি একবার যেটা পড়ি, আর ভুলিনে।" যাক এখন অনুতাপ করে লাভ নেই।

গোপালকে বললাম, "বেলা ১০টায় তুমি আমাদের বাসায় যেয়ো। আমি সুরাইয়ার বাসায় গিয়ে চুরির কথা, লাশের কথা বললাম। ওদের ড্রাইভার আমাকে নিয়ে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকলো। আমি এখন কেমন করে ভেতরে ঢুকবো? সিঁড়ি কোঠার রক্তের নদী শুকিয়ে জমাট বেঁধে খয়েরী রং হয়ে গেছে। তারই ফাঁক দিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি বারান্দার দরজায় তালা ঠিকই ঝুলছে। ডাইনে চেয়ে দেখি ড্রইং রুমের দরজা ফাঁক। দূর থেকে টান দিতে খুলে গেল। নেটের দরজার নেট কেটে চোর ঢুকে ভেতরের বারান্দার এক দরজা খুলে অন্য ঘরের তালা ভেঙেছে। শহীদ ডঃ মনিরুজ্জামানের রক্ত ডিঙিয়ে আমি ভেতরে গেলাম। সেই লম্বা বারান্দা, ২৬শে মার্চ কতবার আমি হাঁটু দিয়ে হেঁটেছি, এখন দাঁড়িয়েই চলে গেলাম সোজা বেডরুমে, তারপর এক থেকে আরেক রুমে। প্রথমেই চোখে পড়লো ওয়ারড্রোবটা খোলা। যা পছন্দ হয়েছে নিয়ে গেছে, তার হিসেব করা মিছে। ড্রেসিং টেবিলের দু'টো ড্রয়ারই আধা খোলা। কি ছিল, কি নেই হিসেব করে কী হবে। তবুও চোখে পড়লো ট্র্যাভেলিং ক্লকটা নেই, 'কানাস্তা' ফ্রেঞ্চ পারফিউমটা নেই। জ্যোতির্ময় ১৯৬৪ সালে প্যারিস থেকে ওটা এনেছিল। আমার কাছে কাট গ্লাসের শিশিটা এতো পছন্দ হয়েছিল যে ওটা আর ব্যবহার করিনি। জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে অনেক সখের জিনিস ফেলে যেতে হয়।

আমার মেয়ের ঘরটাতো তছনছ। বড় ট্রাংকেটা খোলা, অনেক শাড়ি ট্রাংকে ও মেঝেতে ছড়ানো। মুসলিম মিয়ার ঢাকাই জামদানী গাট খুলে কিছু শাড়ি নিয়েছে, বাকীটা ঘরময় ছড়ানো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও এম. এ. প্রথম পর্বের সব খাতা ঘরময় ছিটানো। কী আছে আর কী নেই, লক্ষ্য না করেই পরখ করে দেখে নিলাম আমার স্কুলের দুটা Heremes টাইপ মেশিন ও দুটা সেলাইয়ের কল আছে কিনা। ওগুলো স্কুলের সম্পত্তি। ভাগ্যিস রেখে গেছে! ঐ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম এগুলো সরাতেই হবে। মুসলিম মিয়ার শাড়ির গাঁটে ছিল ২৬ খানা শাড়ি। সুদিনে দুর্দিনে বিশ্বাস করে তিনি রেখে যেতেন গাঁটটি আমার ঘরে। সেই '৬৪ সালের রায়টের দিন তিনি আমার স্কুলের কোয়ার্টারে গাঁট রেখে

ফতুল্লায় আমার ভাইয়ের বাড়ি খবর দিতে গেলেন সবাইকে আমার কাছে চলে আসতে বলতে। আমি যখন তাদের নিয়ে ক্যাম্পে গেলাম 'সাধনায়', তখন আমার বিহারী দাযোয়ানের হেফাজতে ছিল গাঁটটি। একমাস পরে এসে নিয়েছিলেন অক্ষত অবস্থায়। এবার বোধহয় অক্ষত নেই।

এবার আমার মনে হলো কেন যে স্কুলের এত দামী জিনিসের দায়িত্ব নিয়েছিলাম নাজমা আপার পরামর্শে। তিনি স্কুলের মঙ্গলের জন্যই বলেছিলেন। কারণ ১৯শে মার্চ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রী ল্যাব্ লুট হয়ে যায় দিনের বেলা। তাই ২০, ২২, ২৪ তারিখে UNICEF - এর দেওয়া মালগুলো আমার বাসায় এলো। সেটাই যে যুদ্ধক্ষেত্র হবে কে জানতো তখন? বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতাগুলোর দাম আরও বেশি। দুই গ্রুপের কত ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি নির্ভর করছে খাতাগুলোর উপরে। এ খাতার একটা সেট পরীক্ষা করছিলেন গোলাগুলির শুরুতে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আর নিরীক্ষণ না করে এ অমূল্য মালগুলো সরাবার ব্যবস্থা নিতে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় গিয়ে ড্রাইভার সাহেবকে একটা ঠ্যালা আনতে বলে আমি পেছন ফিরে ঘরে ঢুকবো - এমন সময় দেখি কি দরজার পাশে বারান্দার দেয়ালে যীশুর জন্মক্ষণের একটি দৃশ্য - কুঁড়ে ঘরে মেরীর কোলে সদ্যজাত যীশুর একটি রেপ্লিকা মূর্তি। সেটি গুলী বিদ্ধ হয়ে ভেঙে গেছে। যেখানে অধ্যাপক; জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে জগন্নাথ হলের দিকে মুখ করে, ডান দিক থেকে গলায় গুলী করেছে, সেই গুলীটা গলা ভেদ করে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে বারান্দার জাল বরফী ও নেট ভেদ করে সোজা মূর্তিটিকে ছিন্ন করেছে। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। লণ্ডনের স্কুলে যখন পড়াতাম, চলে আসার সময় একটি গ্রীক মেয়ে আমাকে এটি প্রীতি উপহার দিয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মিলিয়ে দেখলাম যেখানটায় দাঁড় করিয়ে আমার স্বামীকে গুলী করেছিল, সেখান থেকে জালের ছিদ্র ও তার থেকে মেরীর মূর্তি পর্যন্ত এক জ্যামিতিক সরল রেখা কল্পনা করা যায়। তাহলে তো ক্যারম খেলার নিয়মে গুলীটি রিবাউণ্ড হয়ে আমার বারান্দায় পড়ে আছে। তাই ছিল। একটু এদিক ওদিক চেয়ে গুলীটি পেলাম কুড়িয়ে। সেটি হাতে নিয়ে এই শূন্য পুরীতে একা দাঁড়িয়ে আমি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। জগন্নাথ হলের মাঠ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কোন বাধা নেই। বিরাট বেড়ার হল ঘরটা পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে মাটিতে মিশে আছে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডেরা ঘরের টিনের চালাও মাটিতে বসা। গণকবর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাত্র বারদিন আগে যে এখানে তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে, বোঝাই যায় না। আমার কাছে তখন, দিনের বেলায়ও, এটা জনহীন প্রেতপুরীর মতই লাগছে।

গোপাল এসে পৌঁছায়নি, ড্রাইভারও ঠ্যালা যোগাড় করতে গেছে। আমি একাকী দাঁড়িয়ে। এমন সময় তিনটা খালি রিকশা, ঢুকলো আমাদের প্রাঙ্গণে। একটু পরেই প্রথমে খালি রিকশা মধ্যের রিকশায় একটা টেলিভিশন, পেছনে আরেকটা খালি রিকশা সার বেঁধে বেরিয়ে গেল।

বুঝে নিলাম আমার পাশের ফ্ল্যাটের অধ্যাপক হাই সাহেবের টেলিভিশন সেট ওটি। ভয়ে আমি বাধা দিতেও পারলাম না, গলা দিয়ে চিৎকারও এলো না। কি আর করি। ঘরে ঢুকে ঘরময় ছড়ানো খাতাগুলো গুছাতে লাগলাম। দু'সেট খাতার রোল মিলিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে, আমার কী যে শান্তি লাগলো। একটার নম্বরশীট সই করাও হয়েছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ইংরেজী–বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপিও অক্ষত আছে। ছিল না টেবিলের চাইনিজ জাপানী কলমগুলো। ছিল মাত্র একটি কলম 'শেফার্স লাইফ টাইম'। চোরেরা ভেবেছিল ওটি সবচেয়ে নীরস কলম। আর ছিল না আমার মেয়ের হারমোনিয়াম, একজোড়া মন্দিরা, একজোড়া ঘুঙুর।

জামদানী শাড়িগুলো গুছাতে গিয়ে দেখলাম শাড়িওয়ালার ছাব্বিশখানা শাড়ির মধ্যে পনেরখানা আছে, বাকী এগারখানা পছন্দমত নিয়ে গেছে। আমার বড় ট্রাংক খুলে দেখি সব ওলট–পালট। তাতে গরম বস্ত্র ছাড়া আমার সব জামদানী শাড়ি ছিল, তার মধ্যে '৭০ সালের দুর্গা পূজায় কলকাতায় যাবো বলে আটখানা নতুন শাড়িও ছিল। পুরানো শাড়ি আছে, নতুনগুলো নেই। সবাইকে উপহার দেবার জন্য কিনেছিলাম। কেন যে ও সেবার আমাকে ভোটের আগে কলকাতায় যাবার অনুমতি দিলো না, আমি আজও বুঝিনি।

আমি গুছিয়ে সারতে না সারতেই গোপাল এলো, ড্রাইভারও ঠ্যালা নিয়ে এলো। স্কুলের দুটি কল ও দুটি টাইপ মেশিন, আরো আমার একটি কল ও একটি টাইপ রাইটার এবং মুসলিম মিয়ার শাড়ির গাঁট ঠ্যালায় দিয়ে ভাবছি আর কি দেওয়া যায়। ওয়ারড্রপের বাকী জামাকাপড় বড় ট্রাংকে ঠেসে ট্রাংক বন্ধ করে দিলাম। আর কি কি আমি নেবো? কোথায় নেবো? আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে বাস করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন বাড়িতে একজন মারা গেলে কি কেউ বাড়ি ছেড়ে যায়? কিন্তু এ যে অন্য পরিস্থিতি। আমাদের ছয়টা ফ্ল্যাট জনপ্রাণী শূন্য, এমন কি ডাঃ মাহফুজ–উল্লাহ্ কবীরের বাংলো বাড়িও শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রাক্টরের পাহারাওয়ালাও নেই। তাই চিন্তা না বাড়িয়ে সব মাল সিটি নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলাম গোপালের সঙ্গে। গোপাল তখন টি. হোসেনের ড্রাইভার, আর আমার মালের পাহারাদার। দু'সেট পরীক্ষার খাতা, অভিধানের পাণ্ডুলিপি, গুহঠাকুরতার Thesis - এর মূল কপি নিয়ে আমি ফিরে গেলাম ২০ নম্বর ধানমণ্ডিতে।

এখন আমার প্রধান দায়িত্ব হলো খাতাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে, পাণ্ডুলিপি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে ডঃ এনামুল হককে পৌঁছে দেওয়া। এসব ব্যবস্থার আগেই ডাঃ ওয়াহিদ আমার খাতাপত্র দেখলেন। প্রথমেই ১৯৭১–এর Swiss Air - এর ডায়েরীখানার, যেটা অধ্যাপকের এক প্রিয় ছাত্র উপহার দিয়েছে, প্রথম পাতা ছিঁড়ে নিলেন, তারপর Thesis-এর প্রথম পাতা ছিঁড়বেন আমি কেড়ে নিয়ে বললাম, "ছিঁড়বেন না।" তখন তিনি বললেন, "ওনার নামটা কালি দিয়ে মুছে দিন।" আমি তাতে রাজি হলাম না। বললাম, "আপনি এখানে রাখতে না দিলে আমি অন্য কোথাও রেখে আসবো।" তখন তিনি বইটি একটি ছোট খোঁপে তাঁর কোরআন শরীফের ও অন্যান্য ধর্মীয় বইয়ের সঙ্গে রেখে দিলেন।

মানুষের মন কখনও শূন্য থাকে না, মস্তিষ্কও না। দিনের বেলা এঘর ওঘর ঘুরে, অন্যের কথা শুনে, কোন রকমে সময় কেটে যায়। রাতে বিছানায় শুয়ে যখন ঘুম আসে না, তখন যত রাজ্যের চিন্তা মাথায় কিলবিল করে। ভাবি অজিত নিয়োগী কেন দু'দিন ২৩ ও ২৪শে মার্চ একই রকমের ইংগিত দিয়ে গেলেন? আমার কপালের দিকে চেয়েই পরিবর্তনের কি দেখেছিলেন যে এত জোর দিয়ে বললেন? ওরই বা এখন কি দশা। অন্যের ভাগ্য ললাটে দেখতে পারেন নিজের কপাল নিজে দেখেন না বলে, নিজের ভাগ্য বলতে পারেন না। .ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছে আমজাদ সাহেবের সতর্কবাণী আর আমার উত্তর। সত্তর সালের মে মাসের ১৯ তারিখে আমরা শহীদ মিনারের বিপরীতের ফ্ল্যাটে এলাম। আমি আসতে চাইনি কিন্তু জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টকে তো আন্দোলনের সময় হলের কাছেই থাকতে হবে। কেন ডাঃ দেব হলের প্রভোষ্টের পদ ছেড়ে দিলেন। তাঁর উপর আমার ভীষণ রাগ হলো। কেন তিনি মরণের জন্য দেড় মাস আগে দেশে ফিরে এলেন তাঁর পুরনো বাড়িতে। পদত্যাগ করেও তিনি রেহাই পেলেন না খান সেনাদের বর্বরতা থেকে।

আবার আমজাদ সাহেবের সতর্কবাণী মনে এলো। তিনি পুলিশ অফিসার (আই.বি), গেণ্ডারিয়া পাড়ায় থাকতেন। বিপদে আপদে আমাকে ও বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধীর বাবুকে খুব সাহায্য করতেন। হরতালের আগের দিন আমাদের দু'জনের কাছে এসে বলে যেতেন কোন অজুহাতে স্কুলে বন্ধ দিতে। যখন শুনলেন তিনি যে আমরা শহীদ মিনারের কাছেই ফ্ল্যাটে আসছি, অনেক আপত্তি করলেন, "কেন যাচ্ছেন দিদি ঐ গোলমালের জায়গায়? ওখানে সারা দিন ধরে মিছিল যায়, আর সব মিছিল শেষ হয় শহীদ মিনারে 'শপথ' নিয়ে।" ঐ মুহূর্তে কী কুক্ষণে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, "শহীদ তো হতেই হবে, তার আগেই মিনারের কাছে গিয়ে থাকি।" আমজাদ সাহেব জিভ কেটে ছিলেন, "অমন অলক্ষুণে কথা বলবেন না, দিদি। আপনার কত অসুবিধে হবে ভেবে দেখুন না।" আমি তাঁর সঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছি "আমার অসুবিধের চেয়ে হলে অধ্যাপকের দায়িত্ব অনেক বেশি। আমি আটকা পড়লে ফোন করে জানিয়ে স্কুলের কোয়ার্টারে থেকে যাবো। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তো স্বর্ণ, গোপাল বাসা দেখে। অতিথি আপ্যায়নের সব দায়িত্ব তো স্বর্ণর।"

চোখ বুঝে থাকলেও ঘুম আসে না। আবার মনে এলো খালেদার কথা "কিছু দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া ছেড়ে গেণ্ডারিয়ায় এসে থাকুন না দিদিমণি।" "তোমার দাদাবাবুর এক কথা। ছাত্রদের বিপদের সময় তাদের পাশে থাকাই আমার কর্তব্য। আমি এলেও তো সে আসবে না," বলেছিলাম খালেদাকে। যশোর সরকারী কলেজের কাশেম সাহেব (পাগলা কাশেম) কত যুক্তি দেখালো, "স্যার, বিশ্ববিদ্যালয় যুদ্ধক্ষেত্র হবে, যদি ফয়সালা না হয়। প্যারাসুটে করে চাইনিজ ট্রেনার আসছে।" তার স্যার বলেছিল, " প্লেইন ড্রেসে বললে তাও বিশ্বাস করতাম। প্যারাস্যুট তো বিশ্বাস করিনে। তুমি কাদের স্পাই?" ১৬ থেকে ২০ তারিখের আলোচনা। যুদ্ধক্ষেত্র তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। রাজারবাগ

পুলিশ লাইনে যুদ্ধ হয়নি? যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপও এখনও আছে ব্যারাকে। ই. পি. আরদের লাশ দেখিনি, কিন্তু আহতদের তো মেডিকেলে দেখেছি। ওরা ভাল হলে তো আবার মারবে। হায়রে! একবারে মরে গেলেই পারতো। যুদ্ধ তো এখনও চলছে গ্রামেগঞ্জে। দেশের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তো খান সেনারা খতম করছে। যারা রেডিও শোনে তারা বলে, "তার মানেই যুদ্ধ হচ্ছে।" তার মানেই হত্যাযজ্ঞ চলেছে নিরীহ সাধারণ মানুষের উপরে।

আচ্ছা! এর মধ্যে ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত গেণ্ডারিয়া বাসীরা গোলাগুলির শব্দ ছাড়া কিছুই শোনেনি? আগুনের শিখাও দেখেনি? গোপালের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার খবর শুনে ছেলেদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সুধীর রায়, পূর্ণ বাবুরা সবাই পালাতে প্রস্তুত হলেন। বন্ধু মওলা সাহেব গোপালকে দেখে নাম বদলাতে বললেন। সবাই যাচ্ছে – যাচ্ছে কোথায়, নদীর ওপারে। তারপর যার যেখানে সুবিধে আছে। কিন্তু ওপারেও তো শান্তি নেই। ২রা এপ্রিল থেকে নদীতে তুমুল কাণ্ড। পলাতকদের প্রথম আশ্রয়স্থল জিঞ্জিরা বিধ্বস্ত। নদী থেকে রকেট ছুড়ে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে শেষ। যারা জীবন বাঁচাতে ওপারে গেল, তাদের যে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে। আমার স্কুলের শিক্ষিকা নাঈমার স্বামী জহুরুল ইসলাম একজন প্রগতিশীল লেখক। তিনি তো ২রা এপ্রিল একটি পরিবারকে ওপারে পৌছে দিয়ে আরেকটি পরিবারকে নিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। ঘরে নাঈমা একা, তার শিগগিরই বাচ্চা হবে এই প্রথম। হয়তো নাঈমার বড় বোন তাকে নারিন্দায় নিয়ে রাখবে। এমনি সব চিন্তা ভাবনায় রাত কাবার হয়। কাকের ডাক শুনলে মনটা খুশি হয়। অন্যের দুঃখের কথা ভেবে নিয়ে দুঃখভার লাঘব করি।

কোন কাজ হাতে না থাকলে দিনের বেলাই বা কেমন করে কাটে? বিরক্ত হয়ে আমি একটা কাঁচি নিয়ে সামনের বাগানের ডালিয়ার মরা ফুলগুলি কেটে ছিমছাম করলাম। চোখের আরাম হলো, মনের শান্তি এলো। মন খারাপ থাকলে আমি ঘর গুছিয়ে আনন্দ পাই। একবার একটি ছোট মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে কেবল ফুলের চারা এনে টবে লাগাতে লাগলাম। আমাকে বাইরে দেখে দোলা ও বেবী গেটের দিকে বেড়াতে লাগলো। এমন সময় হোণ্ডায় চড়ে একটি ছেলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দোলার সঙ্গে কথা বললো। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কে রে, ছেলেটি?" দোলা বললো "কেন! তুমি চেননা অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেবের ভাই-পো? ও-ই তো দোতলার কার্নিশে শুয়ে দেখেছিল বাবাকে গুলী করতে।" যাক, আমার ভয়টা কেটে গেল। ডাক্তার সাহেব ফিরে সাজানো বাগান দেখে জানতে চাইলেন, "একাজ কে করেছে?" যখন জানলেন আমি সেই ব্যক্তি, তখন খুবই রাগ করলেন। বললেন "আপনি বাইরের বাগানে যাবেন না।" আমার স্বাধীনতা আরো খর্ব হলো। তারপর পেছনের তরকারির বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। যাক, ফাইটার প্লেনগুলো তো দেখা যায়। মাত্র চারটি প্লেন দিয়ে কত যুদ্ধ করবে ওরা? পাকিস্তান থেকে তো আর আনছে না। আনবেই বা কেন? ওদের দেশ না বাঁচিয়ে, পোড়া বাংলাদেশ বাঁচিয়ে কি লাভ হবে ওদের? ওরা তো মানুষ চায় না – চায় মাটি।

ডাক্তার সাহেব রাগতভাবেই বলেন, "কেন যে মাইনোরিটির তরফ থেকে কোন লীডার কোন স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না এখনও, আমি বুঝিনে।" আমি বলি, "মাইনোরিটির কথার কী মূল্য আছে? মাইনোরিটি কি শুধু হিন্দু? বৌদ্ধ-খৃষ্টান আছে না? রসরাজ মণ্ডল নিজেই পালিয়ে বাঁচে না,. মছুয়াদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস কোথায়? আমি কারো কাছে দুঃখ করলে বলে, 'হিন্দুদের তো মারছেই, মুসলমানদের মেরে শেষ করে দিল।' আমি তাই কারো কাছে দুঃখ করিনে।" তখন ডাক্তার আঁতকে উঠে বলেন, "সেকি! আপনি আবার বাইরেও যান নাকি? খবরদার! বাইরে মোটেও যাবেন না।. অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। নতুন করে শহরে অনেক জায়গায় গোলমাল হচ্ছে। মোহাম্মদপুরে বিহারীরা গোলমাল করছে।" তাইতো! ওনার বড় মেয়ে এখানে আছে। মালপত্র এখানে আসছে। হয়তো জামাইও চলে আসবে। এত দিনে কি ডাক্তার সাহেব বুঝলেন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে? সেভারজেন্ট কি এমনিই ধাওয়া করে যাচ্ছে, আর ক্যানটনমেন্টে ফিরে আসছে?

ডাক্তার সাহেব আমার কাছে অনেক খবর গোপন করলেই কি, আমার তো আরেকটা যায়গা আছে খবর পাবার, সুরাইয়ার বাসা। ওর শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর গেণ্ডারিয়া থাকেন, ওদের ড্রাইভারও ওপাড়ায় থাকে। ওদিকের খবর, এমনকি বাইরের খবরও পাই ড্রাইভারের কাছ থেকে। গুজব রটেছিল ২৮শে মার্চ সাধনা ঔষধালয় লুট হবে। সে গুজব শুনেই না গোপাল গেণ্ডারিয়া থেকে ফতুল্লায় দৌড়ালো। দেখা গেল ১লা এপ্রিল সাধনা ঔষধালয় সার্চ করে টাকা পয়সা, কেউ বলে সোনার পুতুলও, লুটে নিয়ে গেছে খান সেনারা। পরের দিন ফ্যাক্টরী গুদাম, মসলা সব লুটে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এপ্রিলের চার তারিখে আবার ফিরে এসে সাধনার প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় যোগেশ চন্দ্র ঘোষকে গুলী করে ফেলে রেখে গেছে। পাড়ার শুভাকাঙ্খীরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল সরে যেতে। তিনি বলেছেন "আমাকে এত বয়সে মেরে ওদের কি লাভ হবে? আর যদি মারেই তবে কি করা যাবে?" নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি ডুবে ছিলেন নিঃসঙ্গ একাকী। বিপত্নীক স্বর্গীয় যোগেশ ঘোষ সর্বশেষ অধ্যাপনা করেছেন জগন্নাথ কলেজে। তখনও তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি আমার স্কুলে প্রাক্তন গেণ্ডারিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন অনেক বছর। আমি '৪৪ সাল থেকে '৫০ সাল পর্যন্ত তাঁকে পেয়েছি। স্থিতধী, মিতব্যয়ী, স্বল্পভাষী মানুষটি সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি কখনও তাঁর নিজের তৈরি মহাভৃঙ্গরাজ তেল ছাড়া মাথায় দিতেন না। তাঁর নেশা একটাই ছিল, তিনি দিনে নয়বার চা খেতেন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। সেই অপ্রতিবাদী নিরীহ মানুষটিকেও পাষণ্ডরা অবলীলায় গুলীবিদ্ধ করলো?

আরও একটা খবর শুনে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকলো। ২৬শে মার্চেই নাকি ডঃ মিস আজিজুন্নেসার ভাইকে সদরঘাটের কাছে মিলিটারীরা গুলী করে মেরেছে। সেকি! তাকে কেউ বলে ফকির, কেউ বলে পাগল, মেহেরুন্নেছা আর ডঃ আজিজুন্নেছা চিরকুমারী দুই

বোন তাদের একটিমাত্র ভাইয়ের অনেক ছেলেমেয়ে আর পরিবার এই ফুফুরাই দেখতো। এই ভাইটির অনেক মুরিদ ছিল। তার মাথায় ছিল লাল ফেট্টি বাঁধা, পায়ে ঘুঙুরের সঙ্গে লাল পট্টি, লাঠিতে ঝুনঝুনি। সে কার্ফিউ মানে না, মিলিটারীকে পরোয়া করে না। ওদের দেখলেই বলে, "জয় বাংলা।" তারা যত বলে, "এ বাত মত বলো", সে ততই বলে "জয় বাংলা।" এক–দুই তিন–ব্যস খাও গুলী। পরে রাতের অন্ধকারে কারা যেন (হয়ত মুরিদ) নৌকা করে বুড়ীগঙ্গা দিয়ে ধোলাই খালের লোহার পুলের পাশে তার বোনদের দুয়ারে রেখে যায়। সে দুয়ারেই তাকে কবর দেওয়া হয়। হায়রে! তার এতগুলো ছেলেমেয়ে। এদের ফুফুরাই দেখবেন। এরকম ফুফুই বা কজনের ভাগ্যে থাকে?

খবর মানে খারাপ খবর। চার দিকে ছররা গুলীর মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও চেনাজানা অনেকের মৃত্যু সংবাদ মনে বড়ো বেশি আঘাত দেয়। এই তো! হামিদুল্লাহ সাহেব তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে দেশের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও ২রা এপ্রিল বুড়ীগঙ্গার গোলাগুলীতে পড়েছিলেন, ছেলেটি তো তখনই মারা গেল, স্ত্রী সিদ্দিকাও দেশের বাড়িতে পৌঁছবার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। সে ও তার ছোট ননদ বিদ্যুত আমাদের প্রাইমারী স্কুলে চাকরি করতো। ওদের বাড়িতেও গিয়েছি। ওর বড়বোনের মেয়ে সেলিমা ইডেন কলেজে চাকরি পাওয়ার আগে আমাদের বিজ্ঞান গ্রুপে ফিজিক্স পড়াতো। দুঃখ হয় ডঃ হরিনাথ দে'র পাশবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে। তাকেও সেই ২৭শে মার্চ রাতে সুত্রাপুরের মালাকারটোলা ও তার আশেপাশের আমার ১১ জন ছাত্রীর পিতাদের সঙ্গে গেণ্ডারিয়ার লোহার পুলে গুলী করে (ব্রাশ ফায়ার নয়) মেরেছে। কি নৃশংস ওরা। কত বড় পণ্ডিত ছিলেন এই ডঃ হরিনাথ দে। তিনি সেই পুরানো শহরেই থাকতেন, ধর্মালোচনায় অংশ নিতেন, আখড়ায় কীর্তন শুনতেন। তিনি হিউম্যান নিউট্রিশন বিষয়ে পণ্ডিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ বছর অধ্যাপনা করেছেন, তারপর ১৯৬০–৭১ পর্যন্ত ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরী ও ডায়েবেটিকসে প্রধান সায়েন্টিফিক অফিসার ছিলেন। থানার কাছেই এ রকম বেছে বেছে মারা শুরু হয়ে গেছে। থানাও আমাদের বাঁচাতে পারে না পাষণ্ডদের হাত থেকে। ফরাশগঞ্জের অনাথ আশ্রমের ৫০ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে রানী মিত্র এখন কোন্ গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? ২৫শে মার্চ রাতে তাঁর স্বামী স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। তার পরেও তিনি কেমন করে ৫০ জন পরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ততার জন্যে অনিশ্চয় পথে বেরিয়ে পড়লেন?

জলে, স্থলে, শূন্যে সব দিকেই পাক সেনারা তৎপর হয়ে উঠেছে। শহরে গ্রামেগঞ্জে কোথাও এখন শান্তি নেই। সেভারজেট চারটি সকালের দিকে যে বেশি ব্যস্ত থাকে তার মানে কি? যুদ্ধ হচ্ছে কোথাও। এদিকে কত পরিবার শহর ছেড়ে নিজের গ্রামের দিকে, নইলে জনস্রোতের সঙ্গে চলে যাচ্ছে নিরাপত্তার আশায়। আশাই ওদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে – কী আছে ওদের কপালে কে জানে! কে জানে ওদের এ দৌড়ের শেষ কোথায়?

১০ই এপ্রিল সকালের ভ্রমণের শেষে সত্য অসত্য কাহিনী শুনে এসে ডাক্তার সাহেব আমার পিছনে লাগলেন – "আপনার কাছে কোন চিঠি, কাগজপত্র থাকলে পুড়িয়ে ফেলুন।"

কী এমন কাগজ আমার আছে থাকলে ডাক্তার সাহেবের অসুবিধা হবে? তিনি বললেন, "জানেন তো টিক্কাখান গভর্নর হয়ে গেছে।" তাতে কি হয়েছে? সবাই কেন তাকে এত ভয় পায়। সে কত নৃশংস হতে পারে? আমার চোখে তখন একটা নির্দয় মুখের ছবি ভেসে উঠলো যে লোকটা আমার হাত থেকে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। জীবনে এমন নিষ্ঠুর মুখ আমি দেখেছি বলে মনে হয় না। সে মুহূর্তটির কথা ভোলা যায় না। ওই পাষণ্ডটা আমার মুখ চেয়ে কথা বলতে পারেনি।

ডাক্তার সাহেব আমার '৭১-এর Swiss Aire -এর ডায়েরীর উৎসর্গের পাতা ছিঁড়ে নিলেন, জানুয়ারী ১৩, ১৪ তারিখের পাতা ও মার্চের ২৩, ২৪-এর পাতা ছিঁড়ে ফেললেন। আমি আ. স. ম. আবদুর রবের লেখা চিঠিখানা ছিঁড়ে কলতলায় ভিজিয়ে ড্রেনে ফেলেছি তখন ডাক্তার বললেন, "পুড়িয়ে ফেলুন।" ভেজা কাগজ কি পোড়ে? রাগে ছেঁড়া টুকরোগুলো মাটিতে পুঁতে দিলাম,। কবর দেওয়ার কাজ শেষ হতেই গোপাল এলো। বাসায় আবার চুরি হয়েছে। এখন শহীদ মিনারের ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটগুলোতে দিনের বেলায়ই চুরি হয়। মোড়ের মাথার বইয়ের দোকানের ছেলেটি দেখে ছিল। সে বলেছে, "আপনাদের ফ্রিজটা নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়েছি।" গোপালকে বলে দিলাম, বেলা ১১টায় বাসায় যেতে। আমি গেলাম। যাবার পথে শাহবাগের মোড় দিয়ে যাচ্ছি, আর্ট কেলেজের পরে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কাছাকাছি যেতেই দেখি রমনা কালীবাড়িটা আরও ভাঙা হচ্ছে। একটা ট্রাকে ঢেলাগুলো তুলছে। খুব বড় ঢেলা যেগুলো ট্রাকে তোলা যাচ্ছে না, কয়েকজনে মিলে ঠেলে পুকুরের দিকে নিচ্ছে। আমি আড়চোখে দেখছি, আমাকে ওরা লক্ষ্য করছে না। আমার একটা ক্যামেরা সঙ্গে নেই, ছবি তুলে নেওয়া যেতো। বাসায় বোধহয় এখনও দুটো ক্যামেরা আছে।

মোড়ের মাথায় গোপাল দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। দুজন পিছনের বাগান দিয়ে রান্নাঘরে বারান্দা দিয়ে ঢুকলাম - ভাঁড়ার ঘরের সামনে ময়দা, আটা, চাল, চিনি ছড়ানো - চায়ের আসবাব, বাসনকোশন, এমনকী শীল-নোড়া পর্যন্ত — সব সাফ। গোপাল একটা ঠ্যালা নিয়ে এলো - ওর বুদ্ধিতে যা কুলালো ঠ্যালায় তুললো। আমি ড্রইং রুমের ভাঁজ করা কার্পেট ও খাবার ঘরের ফ্রিজ গোপালকে ঠ্যালায় তুলতে বলে, দেরাজ খুলে জরুরী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ব্যাংকের বই, দুটো ক্যামেরা ব্যাগে ভরে নিলাম। হায়রে। ঘরে দুটো ক্যামেরা থাকতে রেডিওর কাজী রফিক হাসপাতালে ফটো তুলতে পারলো না, আর আমিও কালী মন্দির ভাঙার ছবি তুলতে পারিনি। Show case থেকে স্যুভেনীরগুলো একটা বাস্কেটে ভরে নিলাম। আমরা দু'জনেই সিটি নার্সিং হোমে গিয়ে উঠলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো, ডাক্তার তাজুল হোসেন কবে এবং কখন যে আমার নাম B. Guha Thakurta তুলে দেওয়ার জন্য বিলেতের ট্রাংকটা রং দিয়ে লেপটে দিয়েছেন। ও, আমাদের নামটাই এখন ভয়ের। যাক। তবুতো আমার মালগুলো রেখেছেন। এই যথেষ্ট। নার্সিং হোমে এখন রোগী নেই বললেই চলে। কাজেই জায়গার অভাব নেই।

রাতে হাজারীকে ফোন করলাম যেন আগামীকাল আমার সঙ্গে একটু দেখা করে। ওরা দু'জনেই এলো অফিস থেকে ফেরার পথে। ওরা দোলাকে নিয়ে যেতে চাইলো। দোলা রাজী হলো না, আমিও না। এর পর বিপদ যদি আসে মা-মেয়ে একসঙ্গেই মোকাবেলা করবো, তবুও আলাদা থেকে টেনশনে ভুগতে পারবো না। বাসার অনেক ভাল ভাল বই ও তিন বছরে বিলেতে কেনা নতুন বইগুলো সরাবার আলোচনা করলাম। প্রতিদিন রাতে বা দিনে চুরি হতে হতে সব বই শেষ হয়ে যাবে। কিছু বই যদি হাজারী নিয়ে রাখে এ আশায় তাকে ১৩ তারিখে সকাল ১০টায় আমার বাসায় যেতে বললাম। কথা মত হাজারী এলো কিন্তু একা নয় – সঙ্গে সিদ্দিকী সাহেব। তিনি হায়দ্রাবাদের লোক, দোহা সাহেবদের ইন্দিরা রোডের বাড়িতে থাকেন। তার বাঙালী প্রেম প্রীতির শেষ নেই। গুলশানে একটি বাড়ি করেছেন, তার মনের মত বাংলা নাম দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কতজনকে যে ধরেছেন, তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের মত নামটি পেয়েছিলেন কিনা জানিনে।

যাক তাঁরা দু'জনে এলেন। আমি তখন বারান্দায় মরা আগুনি ডালিয়া দু'টি দেখছিলাম, ওঁরা আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, "এ টবে এক সঙ্গে তিনটা ফুল ছিল, ২৫শে মার্চ সকালে জ্যোতির্ময় বড় ফুলটা কেটে দিয়ে বলে ছিল, 'হয়ত আমার ফুলটাই কাটলাম।' এখন বাকী ফুল দুটোও শুকিয়ে গেছে।"

হাজারী নিঃশ্বাস ফেললো। সিদ্দিকী সাহেব বললেন, "এখন সবই স্মৃতি।" তাঁরা সারা বাড়িটা ঘুরে সামনের বারান্দায় দেয়ালে, যেখানে যীশুর জন্মের রেপ্লিকা ছিল, সেখানে গুলীর ক্ষত দাগটা দেখলো, সিঁড়িকোঠায় যেখানে ডঃ মনিরুজ্জামানদের গুলী করেছে সেখানে চারজনের আটটা গুলীর দাগও দেখালাম। সিদ্দিকী সাহেব এবারও বললেন, "এখন সবই স্মৃতি।" হ্যাঁ, সবই স্মৃতি।

বারান্দায় ফিরে এসে হাজারী জিজ্ঞেস করলে "আমাকে কি দিতে চান, বৌদি?" বললাম, "কিছু নতুন এবং ভালো বই, যা বিলেতে সাড়ে তিন বছরে কেনা হয়েছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। আরো আছে বঙ্কিমের সেট-যেটা অনার্সের Pope's Gold Medal -এর সঙ্গে পেয়েছিল।" ওরা দু'জনে বইগুলো ঘেঁটে দেখলো। পরে হাজারী বললো, "বইগুলো এখনই না নিলে নয়?" আমি বুঝলাম ঐ ভদ্রলোক মানা করেছেন। বললাম, "ঠিক আছে আমি অন্য ব্যবস্থা করবো। ওরা চলে গেলে ডঃ টি. হোসেনের এ্যাম্বুলেন্সটা আনতে পাঠালাম গোপালকে। গোপালই তো এখন নার্সিং হোমের ড্রাইভার। ডাঃ টি. হোসেন তো নেই, তাঁর রোগী খন্দকার মোশতাক আহমদও নেই। কোথায় গেলেন ওরা? আমি বইপত্র বেছে গুছিয়ে নিচ্ছি। দাদা-শ্বশুর শশী নাজিরের সেগুন কাঠের ডবল দেরাজের বড় তিনটা ড্রয়ারে সব রচনাবলী, আর ছোট ড্রয়ারে ছবির স্লাইডগুলো, কাঁটা চামচ ও টুকিটাকি নিলাম। দোলার জন্মদিনের Show case-এ বিলাতের বই ভর্তি। তবুও

দু'কাঁচের আলমারী ভর্তি বই পড়ে রইল। টি. হোসেনের ওখানে স্থিতিই বা কতদিন? এখন তো মাল নিয়ে উঠলাম ওখানে। বড় ট্রাংকেটা বারান্দায় তালা ছাড়া, বাকী মাল একটা ঘরে বন্ধ রইল।

মাল গুছিয়ে ডাক্তারের স্ত্রী হাসমত আরার (স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের পারভীন হোসেন) সঙ্গে কথা বলে জানলাম ডাক্তার ঢাকায় নেই। দেশের বাড়িতে গেছে। ভাবি, এ সময়ে পরিবার, ছেলেমেয়েদের ফেলে। হতেও পারে। ডাক্তার তো সপ্তাহে একদিন দেশের বাড়িতে থেকে রোগী দেখতেন। কিন্তু ক'দিন হয়ে গেল। "রোগীরা কোথায়?" হাসমত আরা সংক্ষেপে উত্তর দেয়। বেশি কিছু জানা যাবে না। তখন গোপালের কাছে গেলাম, সে বলে, "আমি তো দোতলার খবর কিছু জানিনে। আমি ড্রাইভার নীচে থাকি। তবে রোগী বেশি নাই, বোধহয় সব চলে গেছে। এখনতো বেশি রান্না হয় না।"

"তবে টি. হোসেন গেলেন কোথায়? তুমি কিছু জান না, গোপাল? তুমি গাড়িতে নিয়ে যাওনি?"

গোপালের একই উত্তর, "না! যাইতেও দেখি নাই। হেলপাররা কয় বাড়িতে গেছে। হইব বাড়িতে গেছে। বাড়িতো চৌদ্দগ্রামের কাছে।"

নার্সিং হোমের সব কর্মচারী ছুটিতে গেছে, খৃষ্টিয়ানরা আছে, তার মধ্যে দু'জন নার্স। এখন বোধহয় বাড়ির মালিকরা রোগী। তাহলে গোপাল জানে না যে মোশতাক রোগী কোথায় গেছেন। তখন আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, " গোপাল, এর মধ্যে তুমি ডেমরা গিয়েছিলে?"

"হ! হেই তো ১৩/১৪ দিন, অইব ডাক্তার চালাইয়া গেছেন আমি পাশে বইস্যা ছিলাম।"

"তা, তুমি কি দেখলে?" "আমরা তো গাড়িতে বসা, দুইটা ছেলে বললো, আজ তাজউদ্দীন এখান দিয়া যাইব। চায়ের দোকানে স্পাই আছে। জিগাইলে কিছু কইবেন না।"

"তুমি তাজউদ্দীনকে দেখলে?"

"দেখলাম একটা স্কুটারে আইস্যা নামলো। পায়জামা পাঞ্জাবী পরা, আর কান্দে একটা থলি ব্যাগ। তিনি ঐ পারে গেলে টি হোসেন গাড়ি ঘুরাইল। আর কি!"

"আচ্ছা! ডাক্তার তাজউদ্দীনের সঙ্গে কোন কথাও বললো না?"

"না। চিনে বইলা মনে অইল না।"

১৪ই এপ্রিল দুপুরে খাবার পরে আমার স্লাইডগুলো আর এ্যালবামগুলো নিয়ে ৩ নম্বর রোডে সুরাইয়ার বাসায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো যদি তোমাদের বাসায় রাখি কোন অসুবিধে হবে না তো?"

"অসুবিধে কেন হবে? এমন কি আছে?"

আমি বললাম, "এমন কিছু নেই, তবে এ্যালবামে দোলার বাবার কয়েকটা ছবি আছে, তার নাম আছে কোন কোন এ্যালবামে। অন্যেরা বইয়ে তার নাম দেখে বই রাখতে চায় না,

আমার ডায়েরীর নাম মুছে দেয়।" সুরাইয়া এগুলো নিয়ে একটা আলমারীর ওপরে তুলে রাখলো।

আমরা ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিলাম। 'গল্প মানে তো কোথায় কি হলো।' এমন সময় স্কুটারে একজন এসে নামলো। আমরা পাশের ঘরে চলে গেলাম চা বিস্কট খাচ্ছি, সে লোক যে স্কুটারে এসেছিল সে স্কুটারেই চলে গেল। আমরাও ড্রইং রুমে গিয়ে বসলাম। হাকিম সাহেব রাজারবাগের গল্প করলেন, আমি হাসপাতালে দেখা ই. পি. আরদের বর্ণনা দিলাম। সুরাইয়া বললো, "জানেন বাসন্তু দি, ডেমরার ও. সিকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। বিহারীরা নালিশ দিয়েছে উনি নাকি আদমজী মিলের গোলমালের সময় তাদের সাহায্য করেননি। বেচারী বৌটি হন্যে হয়ে খোঁজ করছে।" একটু পরেই বললো, "চায়না পাকিস্তানকে জোর সাপোর্ট দেবে বলেছে।" তাই তো আমাদের ২০ নম্বর রোডে ওদের আস্তানায় খুব হাসি, গান চলছে। ডাক্তার ওয়াহেদ আমাকে নিয়ে আরো চিন্তায় পড়েছেন। চীনাদের দিকের জানালাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি আরেকটি পরামর্শ চাইলাম, 'কী করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'সেট খাতা ফেরত দেই?' সুরাইয়া চটপট বলে দিলো, "কাল সকালে খাতার সেট দুটো নিয়ে আসবেন, আমাদের ড্রাইভার আপনাকে রেজিষ্ট্রারের অফিসে পৌছে দেবে।" ঝামেলা মিটে গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে দু'জনে বসে আবার গল্প। সুরাইয়া বললো, "জানেন! সেই যে ও, সি সাহেবেরর স্ত্রী, লেখাপড়া বেশি জানেন না, কিন্তু বুদ্ধি আর সাহসের তুলনা হয় না। তিনি দু'তিন দিন ক্যান্টনমেন্টের গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখতেন কোন্ লোকগুলো ভেতরে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। তারপর একদিন লক্ষ্য করলেন একজন ডাক্তার ভেতরে যায় আবার বেরিয়ে আসেন। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে দূরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর স্বামী ভেতরে আছেন কিনা জানতে। নামধাম বলে দিলেন। পরের দিন তিনি বললেন," হ্যাঁ, আপনার স্বামী আছেন।" তখন মহিলা একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জী দিয়ে বললেন, "এটা তাকে পৌছে দেবেন। তিনি তো এক-কাপড়ে এসেছেন।" মহিলা করিৎকর্মা বটে!

পরের দিন আমি খাতার বাণ্ডিল নিয়ে সুরাইয়ার বাড়ি গেলাম। সুরাইয়া বলে দিল, "আপনি সোজা তেতালায় কন্ট্রোলার অফিসে চলে যাবেন। সেখানে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের ভাই কাজ করে। তারও ভাইয়ের মতো দাড়ি আছে।" কথামতো আমি নির্ধারিত অফিসে গেলাম। সারাপুরী একেবারে শুনশান। ছাত্রছাত্রী তো নেই -ই, অন্য লোকজনও নেই। বারান্দায় দু'একজন কর্মচারী চলাফেরা করেন। নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পেয়ে খাতার ইতিহাস বলে বাণ্ডিল দুটো তার টেবিলে রাখলাম। হঠাৎ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখি কি, সবাই দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ জানালার ধারে গেলেন, কিন্তু চুপি দিতে সাহস পাচ্ছেন না। কারো মুখে কোন কথা নেই, নিশ্চুপ। আমারও কৌতূহল হলো। আমি

জিন্নাহ হল (সূর্য সেন)– এর দিক দিয়ে নীচের দিকে চুপি দিলাম। তিনটা মিলিটারী জীপ উত্তর দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে, মানে মহসীন হলের দিকে আস্তে ধীরে যাচ্ছে। ঘরে যে যেখানে ছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়েই রইলেন। যদি মিলিটারী ঢোকে কে কোথা দিয়ে পালাবেন চিন্তা করছেন। আমিও ভয় পেলাম। বুঝি আমাকেই খুঁজছে। কারণ গেণ্ডারিয়ায় রটে গেছে বিহারী, না মিলিটারী যেন আমাকে খুঁজছে। হ্যাঁ, খুঁজতে একজন এসেছিলেন, তাঁকে আমরা তো খান সাহেব ডাকতাম। আমার মাসীমা বোধহয় খবর নিতে পাঠিয়েছেন। কেউ বিশেষ করে জানে না কোথায় আমি আছি। একমাত্র খালেদা, তাও আভাসে জানে। খালেদা, দেখেছিল ৩০শে মার্চ হাসপাতাল থেকে দোলাকে ডাক্তার ওয়াহিদ নিয়ে গেলেন। যাই হোক খান সাহেবকে যারা চেনে না, তারা তাঁকে বিহারী বলে ভাবতে পারে। তবুও ভয় ঢুকেছে মনে। দশপনের মিনিট পরে গাড়িগুলো ধীর মন্থরগতিতে নীলক্ষেত রোডে চলে গেল। সবার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমি খাতা দু'সেট ও নম্বর দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

এখন আমি ভয় পাচ্ছি যদি রাস্তা থেকে আমাকে তুলে নেয়? অত ভয় পেলেই বা চলবে কেন? ডেমরার ও. সি'র স্ত্রীর মতো সাহস রাখতে হবে। তাছাড়া বিপদে পড়লে বুদ্ধি খোলে। দোলার জন্যে ভেবে কি হবে। সে যেখানে আছে, ভালোই আছে। হাঁটি-হাঁটি পা পা করে নীলক্ষেত রোডের পাড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা রিকশা মিললো। বুড়ো রিকশাওয়ালা বলে গেল, "পোলামাইয়ারা না থাকলে ইনবারসিটির প্রাণই থাকে না। আপনেরা কেমন আছেন, আম্মা?"

সংক্ষেপে বলি, "ভালই আছি।"

"কই থাকেন।"

"এই তো ধানমণ্ডিতে।"

বুড়া বলে, "জানেন আম্মা! এই পাড়ায় খোদার গজব পড়ছিল।"

আমি আর কথা বাড়াইনা। আমি যে এই গজবের মধ্যেই তিন দিন ছিলাম ওকে আর জানালাম না। উঠলাম সুরাইয়ার বাসায়। চা-টোষ্ট খেলাম। সুরাইয়া বললো, "সুবিধে বুঝে আপনাকে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে নিয়ে যাবো।" বুঝেছি আমার নিরাপত্তার জন্যেই। দোলার জন্যে ভাবিনে। বাসায় থাকে, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, লুডু খেলে, তাস খেলে। ডাক্তার সাহেবের ছেলে মাসুম ও তার খালাত ভাই সানী ওকে ব্রে আর ব্রীজ শিখিয়ে ফেলেছে। মনে হয় ও অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। না হয়ে উপায় কি। নিজের দুঃখের ভার নিয়ে অন্যের বোঝা হয়ে থাকা যায়?

১৭ তারিখে শনিবার সকাল ১০টায় সুরাইয়া নিয়ে গেল গ্রীন রোডে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে। কিন্তু পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের দেখা পেলাম না। বোধহয় পলাতক। ছেলেরা বললো, "আমরা চিন্তা করছি কেমন করে আপনার খোঁজ পাই।" বললাম, "আমিও ভাবছি কেমন করে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে মুক্ত হই। ২৫শে মার্চ রাত ১০টা

পর্যন্ত এর কাজ করেছেন গুহ ঠাকুরতা।" এই বলে আমরা বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে বসে আবার গেণ্ডারিয়ার গল্প চললো। সাধনা এখন জনহীনপুরী। মিলিটারীরা তো মৃতসঞ্জীবনী লুটে নিয়ে সঞ্জীবিত হয়েছে। ওখানে অবশিষ্ট ছোটখাটো মসলা, ছোট বড় গুড়ের হাঁড়ি, যা ওরা নিতে পারেনি, তা নাকি পাড়ার লোকেরা নিচ্ছে। হায়রে! মাত্র তো শুরু, এখনই লুটে খাচ্ছে!

আমি গাড়িতে বসেই হামিদাদের কথা তুললাম। সুরাইয়া বললো" ওরা তো বড় ভাই আহাদ সাহেবের কোয়ার্টারে থাকেন। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।" হামিদ বাসায় ছিলনা, ফরাশগঞ্জে কোন্ আত্মীয় মারা গেছেন সেখানে গেছে। লিলি, বাদল, আলেয়া ছিল। অনেক কথা হলো কাঁচকি মাছ দিয়ে খেতে খেতে। লিলি বললো, "আমাদের কাজের ছেলেটা কিন্তু মুসলমান।"

"মুসলমানের বাড়িতে এসেছি, আবার মুসলমান কি?" পরে মনে হলো আমি যে হিন্দু সেটা গোপন করতে হবে। অবস্থা সঙ্গীন হচ্ছে। মীরপুর–মহম্মদপুরের বিহারীরা বাঙালীদের উপরে অত্যাচার করছে। সত্য হবে। নইলে ডাক্তার ওয়াহিদের জামাই সরকারী ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ওখানকার মালপত্র এনে এ বাড়িতে তুললেন কেন? যাক, জামাইটি যে এসে পড়েছে এটাই সকলের শান্তি। হলে হবে কি। শান্তি কোথাও নেই। রাস্তাঘাট, ফুটপাথ থেকে যাকে তাকে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নেয়, কেন নেয়? মেথর–মুচিদেরও বাদ দিচ্ছে না। সুরাইয়া বলে, "হ্যাঁ! মুচি–মেথর মুটে–মজুর সবাইকেই নেয়। ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সব ধরনের লোককে Pick-up করে নেয়। তবে ফিরিয়ে দেয় না, তা নয়।" আমার প্রশ্ন এবং সকলের প্রশ্ন হলো, "তবে চোখ বেঁধে নেয় কেন?"

"ওরা যাতে বুঝতে না পারে কোন্ পথ দিয়ে নিয়েছে। সবাইকে দিয়ে তো একরকম কাজ করায় না। মুচিদের দিয়ে জুতা সেলাই করায়, নাপিত দিয়ে নোখ কাটায়, চুল ছাঁটায়। ওদের খেতে দেয় একমগ চা আর দু'টা বড় রুটি। টাকা পয়সা কাউকে দেয় না।" আমি ভাবি ওদের ফিরিয়ে যে দেয় এইতো বেশি। ঠিকই তো, যারা তুলে নিতে দেখে, তারা তো ফিরিয়ে দিতে দেখে না। দেখবেই বা কেমন করে? তারা তো প্রাণভয়েই দৌড়। তাদের কথা শুনে অন্যেরা আতঙ্কে সারা। আমি যেন একটু স্বস্তি পেলাম।

বিকলে ডাক্তার সাহেব গেণ্ডারিয়া থেকে ফিরে এসে বললেন, "যাক! এবার আর কোথাও বেরুতে হবে না আপনাকে।"

"কেন?"

"কেন, মানে আপনি মরে গেছেন।"

"সে কি কথা। আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর বলছেন আমি মরে গেছি।"

তিনি বলেন, "লোকে বললে আমি কি করবো? সারা গেণ্ডারিয়া রটে গেছে। ভালই হয়েছে আর কেউ আপনাকে খুঁজবে না। হয়তো আপনার ভালর জন্যই রটিয়েছে।" বুঝলাম

আমার বাইরে যাওয়ার বারোটা বেজেছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কে বলেছে আপনাকে, নাম বলুন।" তিনি বলেন, – "কে আর বলবে। আপনার সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নাজমন নেসা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল হিসাবরক্ষক গিয়াসুদ্দিনকে নিয়ে। আমি বলেছি, "হতে পারে? তবে আমি জানিনে।" তখন তিনি আমার বাসায় বেড়াতে আসতে চাইলেন। আমি বলেছি, 'সেকি। আজকাল এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় কেউ বেড়াতে যায় নাকি? দেশের অবস্থা ভালো হলে যাবেন।" বুঝেছি ডাক্তার কঠিন শিলার পাল্লায় পড়েছিলেন।

কিন্তু আমি কী করবো এখন? সিটি নার্সিং হোমে যেতে পারছিনে, গোপালের খোঁজও পাচ্ছিনে। ডঃ তাজুল হোসেন যে কোথায় গেলেন, কোন পাত্তা নেই। গোপালও আসেনা। সে তো ডাক্তারের গাড়ি ও এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার সেজে নার্সিং হোম পাহারা দেয়। ড্রাইভারদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। কর্মচারীরাও চলে গিয়েছে। গিয়েছে তো আমার হিটারও নিয়েছে। নিক যে যত পারে। মানুষই যখন রইল না। লাশও দিলো না। ডাক্তার ওয়াহিদ বলেছেন, "লাশ পেলেই বা আপনি কি করতেন? আরো বিপদে পড়তেন। লাশ তো আঞ্জুমানকে সেধেছিল, অন্যান্য বেওয়ারিশ লাশের সঙ্গে তারাও নেয় নি।" আহা। হাবিব ফকির তো অনেক ভাল কাজও করেছেন। আমার স্বামীর লাশটা নিয়ে বুড়ীগংগায় ফেলে দিতে পারতেন না। আইয়ুব খানকে ৫০০ টাকার ১০০টি নোট দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালা দিয়ে তমঘা পেলেই হলো? ডাক্তার সান্ত্বনা দিলেন "যা হয়েছে, এ নিয়ে আর ভাববেন না।"

মরে গিয়েও আমি পরের দিন মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলাম। যারা রেডিওতে গুজব শোনে, এরকম বাসা এ পাড়ায় আমি তো চিনিনে, তাই হাসমত আরার ওখানে গেলাম। ওরা দুটা রেডিও খুলে সারা দুনিয়ার খবর শোনে। ওরা বললো, "আকাশবাণী রেডিও থেকে নাকি দেবদুলাল বলেছে, 'অস্থায়ী বাংলাদেশকে এখন ভারত সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।" হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেলো আমার শিরায় শিরায়। মনে হলো সেই মেডিকেলে ২৭শে মার্চ কামাল বলেছিলো বন্ধুদের, "বাসন্তী আপাকে আমার বেডটা দিস আমি যুদ্ধে গেলাম।" সেদিন বিশ্বাস করিনি। আজ বিশ্বাস করলাম, যুদ্ধ চলছে এবং অস্থায়ী সরকার একটা হয়েও গেছে বোধহয়। গেণ্ডারিয়ায় যে ছেলেগুলো আন্দোলন করতো তারা নাকি নেই। হতে পারে পালিয়ে আছে, নইলে যুদ্ধে গেছে। গেলাম গোপালের কাছে। "গোপাল ডাক্তার টি. হোসেন কোথায় গেছেন জানো?"

"তিনি তো তার মায়েরে দেখতে গেছে।"

"আর খন্দকার মোশতাক রোগী কোথায় গেছেন?"

গোপাল বলে, "হ্যাঁ তো হেই শুক্রবার দিন চইলা গেছেন এ্যাম্বুলেন্সে চইড়া, আমি নেই নাই।" হ্যাঁ ডাক্তারও তো তার পরের দিনই চলে গেছেন। দু'জনের বাড়ি কাছাকাছি। ডাক্তার তাহলে রোগী দেখতে যায় নি। এবার কিছুটা হদিস পেলাম।

একুশ বা বাইশে কিংবা ২০শে এপ্রিল খুব সকালে গোপাল ২০ নম্বর রোডে এসে আমাকে ভেতরের বাগানে পেলো। আমাকে বললো, "ডাঃ টি. হোসেন ফিরা আইছেন। অনেক সুখবর

আছে। আপনারে যাইতে কইছেন।" হ্যাঁ। সুখবর। আমার আবার কি সুখবর থাকতে পারে এখন? তবুও গেলাম অনেক কিছু জানার আশায়। তাহলে ১৭ই এপ্রিল অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করার গুজবটি সত্য। গোপালের সঙ্গেই চলে গেলাম। আমাকে দেখামাত্র ডাক্তার তাজুল হোসেন এক নিঃশ্বাসে বলে গেলোন, "বাসন্তী দি। কলকাতা ঘুরে এলাম। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। লেবার লীডার রজনী মুখার্জী, আবু সাঈদ আইয়ুব, গৌরকিশোর ঘোষ, কে. কে সিনহা, রুনু বাবু, অম্লান দত্ত, আরো অনেক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। ভালো কথা। আপনার দেওর বাচ্চুকে খবর দিয়েছি।"

"এত খবরে আমার কি হবে?"

ডাক্তার বলে চললো, "আমরা পরশুই চলে যাচ্ছি। বাচ্চু বলেছে যদি আপনারা যেতে চান, আমরা যেন নিয়ে যাই।"

কথাটা শুনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, বাক্যাংশটি শুনে, "যদি আসতে চায়।" বলে দিলাম, "না। যাবো না। আপনারাই সাতজন, আটবো কোথায়? তাছাড়া এখনও প্রমাণিত হয়নি জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা মারা গেছে। ডেথ সার্টিফিকেট পাইনি এখনও।"

ডাক্তার বললেন, "এই যে এত মানুষ মারা গেল, বা যাচ্ছে – তারা কি সার্টিফিকেট পেয়েছে?"

আমি বলি, "প্রমাণ করিয়ে ছাড়বো।"

আবার পরের দিন বিকেলে গিয়ে দেখি তাদের পাঁচ মাসের কোলের মেয়েটি শ্যালা-বৌয়ের কোলে। কতটা দুধ খাবে বলে দিচ্ছে। ব্যাগ ভরে জামা পেনি সব সাজিয়ে দিচ্ছে। "একি হচ্ছে?" হাসমত আরা বললো কাঁদো কাঁদো মুখে, "দেখুন তো। কী যে সব করছে বুঝিনে। আরো বলে কি, তোমার তো আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ে আছে, মনে করো ছোটটা মরে গেছে।"

বললেই কি মায়ের মন বোঝে? রাতে ঐ বাচ্চা ও তার মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম। ভোরে উঠেই গেলাম তাদের বিদায় জানাতে। আমি পৌঁছাবার আগেই তারা চলে গেছে। শুধু তাই নয় গোপালকেও নিয়ে গেছে গাড়ি ড্রাইভ করতে। আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। ভাবি গোপাল একা ফিরবে কেমন করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে। একে হিন্দু, তার সঙ্গে লাইসেন্স নেই। আমিই তো মানা করেছি গাড়ি চালাতে। সঙ্গে লাইসেন্স না রাখতে! আমার সব রাগ গিয়ে পড়লো ডাঃ টি. হোসেনের ওপর। পথে যদি ওকে চেক করে! ভাবতেই মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে গেলাম সুরাইয়ার বাসায় যদি কিছু খবর মিলে। ঠিকই, গোলমাল হবার সম্ভাবনা ছিল। মীরপুরের বিহারীরা মারমুখো হয়ে আছে। ওরা মিছিল বের করতে চেয়েছিলো, অনুমতি পায়নি। গোলমাল হবার সম্ভাবনা এখনও আছে। আমাকেও বেরুতে মানা করলো। আমিও ডাক্তার ওয়াহিদকে এসব কথা বলে সাবধান করে দিলাম। কেবল গোপালের খবর কাউকে আর বলিনি, না সুরাইয়াকে, না ডাক্তার ওয়াহিদকে।

রাত এলো কালো ঘোমটা দিয়ে, আমার ঘরে বাতি জ্বলে না, অন্ধকারে ডুবে থাকি। সরকারী প্রকৌশলী জামাই তো পাবনা রাজশাহী যায় নি। যাবে ২৮শে এপ্রিল। সুরাইয়া বলে গোলমালের সম্ভাবনা এখনও আছে। চাকরি রাখতে হলে যেতেই হবে। সরকারের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব-নিকেশ করতে। তাই তো। সরকারের ক্ষতি কি করে হলো? তাহলে কি বিচ্ছিন্নবাদীদের হামলা চলছে? রাতটা আমার কীভাবে যে কাটলো ভাষা দিয়ে তো বোঝাতে পারবো না। যা আমার হবার হয়েই তো গেছে । এখন আগামী দিনের অজানা আশংকায় মন ভারাক্রান্ত। বুকের মধ্যে যেন জগদ্দল পাথর চেপে আছে। এর চাইতে যুদ্ধ করা ভালো। এত ভাবনাচিন্তার কিছু নেই। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকো, ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধ করো। তারপর বিশ্রাম! না। ওদেরও চিন্তা আছে। কখন শত্রু হানা দেবে, কেমন করে শত্রুর মোকাবেলা করবে, টেনশন তো থাকবেই। এখানেও আমরা রাতে ফুটফাট গুলীর শব্দ শুনি। রাতের প্রহরীরা হয়তো আমাদের ভয় দেখায়। ওরাই যে ভয় পায় না তারই বা প্রমাণ কি? না এখন আর অন্য কথা ভাববো না। এখন শুধু গোপাল ড্রাইভারের কথা ভাববো। কিন্তু অন্য ভাবনা আসে। ডাক্তার টি. হোসেন যে বলেছিলেন "আমরা সব ব্যবস্থা করে এসেছি।" ওরা কি দিল্লীতেও গিয়েছিল নাকি? তবে অস্থায়ী সরকার হয়ে গেছে নাকি? এভাবে কখন যে পোড়া চোখ বন্ধ হয়েছিল জানিনে। রাতশেষে ভোর হলে চোখের জ্বালা নিয়েই ঘুম ভাঙলো। ২৫শে এপ্রিলের অবসন্ন রাতটি কেটে গেল। তাইতো! একমাস হলো আমরা যুদ্ধ করছি। আমি পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করছি। আমাদের দেশে যুদ্ধ হচ্ছে? এর মধ্যে কত মানুষ, নারী-পুরুষ নিহত হয়েছে, আহতও কম নয়। কত অসহায় নারী-পুরুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে। এখন জানা যাচ্ছে ওপারের পথেও চলছে তাদের কাফেলা। লোকে বলে স্রোতের মত চলেছে মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে চলার পথের গতিও বদলে যাচ্ছে।

২৬শে এপ্রিলের সারাটা দিন কি করে যে কাটালাম সে শুধু আমিই জানি, আর জানে আমার অন্তর্যামী (যদি কেউ থাকে)। দিন গেল, রাত নেমে এলো। বাড়িটা নীরব হলে আবার বাজে চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরলো। গোপাল কি বেঁচে আছে? সন্ধ্যার আগে ফিরে এলে তো একবার আমার সঙ্গে দেখা করতো। নার্সিং হোমে বলেও এসেছি, গোপাল এলেই যেন দেখা করে। ওর সঙ্গে তো লাইসেন্স নেই, আমিই তো বারণ করেছি লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাতে। লাইসেন্স দেখালে তো নামেই ধরা পড়বে। গাড়ি না চালানোই ওর পক্ষে ভালো; কিন্তু ডাক্তার বললে, ও তো 'না' করতে পারে না। ফিরবে তো একা। ওর কী উপায় হবে। ডাক্তারের গাড়ি যায় যাবে, গাড়ি আবার হবে। কিন্তু প্রাণ গেলে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এবার ফিরে এলে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। আমার দায়িত্ব কমবে, তাও তো পোড়া জগন্নাথ হলের চাকরি ছেড়ে যাবে না। হল তো শ্মশান, তবুও ঢাকা স্বাভাবিক! ওরা মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রার অফিসের একটা রুমে হাজিরা দেয়। চাকরির এতই লোভ গোপালের। মা, ভাই-বোন গ্রামে, বৌ সে সব শহরে বাপের বাড়িতে ফেলে সে রাজধানীতে গাড়ি চালায়?

আচ্ছা। এ অবস্থায় কি করে ডাক্তার টি হোসেন গোপালকে বাহন করে কলকাতার পথে রওনা দিলেন? যাক ২৭ তারিখের খুব ভোরে গোপাল এসে হাজির। আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। ওর প্রতি আর রাগ রইল না। "গোপাল, তুমি কখন এলে?" গোপাল যেন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। আমি তবুও বকুনি দিলাম, "কেন তুমি গিয়েছিলে?"

গোপাল বলে, "আমারে ডাক্তার দাউদকান্দি ফেরী ঘাটে পৌছাইয়া দিতে কইলেন। আমি কি জানি যে আমারে চৌদ্দগ্রাম লইয়া যাইবেন?"

"অ্যাঁ। তুমি কি চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত গেছিলে?" তখন তো আমি আমার মধ্যে নেই। ওকে বাড়ির পেছনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বলো। বলো। তোমার বীরত্বের কাহিনী।" আমার স্বরে রাগ ও আগ্রহ। গোপাল তখন হিরো হয়ে গেছে। বলে, "আরে! হ্যা তো আটঘাট বাইন্দাই গেছে। ক্যান্টনমেন্ট থেক্যা পারমিট লইছে – মায়েরে দেখতে যায় চৌদ্দগ্রামে। তারপরে গাড়ির সামনে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উঠাইছে। আমি কি জানি আমারে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত লইয়া যাইবো? আরো নিতো, ব্রীজটা বাইঙ্গা গেছে বইল্যা গাড়ি ঐপারে নিতে পারে নাই। তারা রিকশায় হাঁটু জল বাইঙ্গা ঐ পারে গেছে। তখন আমি চিৎকার কইরা কইছি 'আমি ঢাকায় যামু ক্যামনে? আমার তো পেট্রল ফুরাইয়া যাইব!' তখন তিনি একটা লোকরে দেখাইয়া দিলেন। হেই লোকটা আমারে চিনে, আর আমি যে হিন্দু তাও জানে। আর কেউ বোঝে নাই।"

আমি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ওর সমস্ত কাহিনী শুনতে চাইলাম, "তোমরা খেলে কি সেদিন?"

"ব্রীজের আগেই এক মুসলিম লীগারের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খাইলাম। তবে আমি সবকিছু খাই নাই। তাগো ব্রীজ পর্যন্ত দিয়া আইস্যা আমি ঐ বাড়িতেই রাইত কাটাইলাম। সন্ধ্যা রাতে কয়েকটা পোলা লুঙ্গী গেঞ্জী পরা, কইল, 'গাড়িটা জঙ্গলে রাখেন। এক মাসেও, এই পথে গাড়ি আহে নাই। আপনি কেমন কইরা আইলেন?' তখন কইলাম, 'সায়েবে মিলিটারীর পারমিট লইয়া আইছে।'

"রাতে কি খেলে?" বলে, "আমারে এত গুলি গরুর গোস্ত ও টমেটুর অম্বল দিল। ওরা অম্বলরে খাট্টা কয়। গোস্ত খাইলাম না। ঐ বাড়ির কাজের লোকটা তখন আমার নাম জিগাইল। আমি কইছি ঐ আপনে যা শিখাইছেন 'গমেজ', হেইটা কইছি। আর কইছি আমিতো ভাই খৃষ্টান তবে আমি কোন গোস্তই খাই না।" 'আসলে তো আমার মনে ভয়, রাত কাটামু কেমন কইর‍্যা? যাউক, সকাল নয়টায় ঐ লোকটা আইল। কোনখান থিকা দুই গ্যালন পেট্রলের পারমিট লইয়া আইল। তখন বেলা ১২টা, আমরা ঢাকার দিকে রওনা হইলাম।"

"তারপর ফেরার পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?"

"বাপরে বাপ। অইছে না আবার! কুমিল্লা না আইলে তো আর পেট্রল পাওয়া যাইবো না। আমার তো গলা শুকাইয়া কাঠ। কখন গাড়ির তেল ফুরাইয়া যায়। পথে এক চায়ের দোকান

খেইক্যা চা খাইলাম। তো আমারে সববায় জিগায় — 'কইখ্যে আইছেন? এক মাসে তো এই পথে গাড়ি আহে নাই, মিলিটারী ছাড়া?' তখন আমি তাগো জিগাইলাম, 'ঢাকা যাওনের সোজা পথ কোনটা ভাই?' তারা কয় পথ তো ভাই একটাই, যেই পথে আইছেন, হেই পথেই যাইতে অইব।' 'আপনের গাড়িতে ফ্ল্যাগ নাই ক্যান?' তখন আমি কইলাম, 'ফ্ল্যাগ তো ভাই আছিল, ছামড়ারা খুইলা দিল।' তারা কইল, 'ফ্ল্যাগ লাগাই নেন, নাইলে তো কুমিল্লা পার হইতে পারবেন না।' তখন 'ফ্ল্যাগ লাগাইলাম, কুমিল্লায় পেট্রল কিনা রওনা দিলাম। ডঃ টি. হোসেনের লোক আমারে কইল, 'মিলিটারীগো দিকে তাকাইবেন না।' আমি ঢাকার দিকে আইতাছি, এক গাছের লগে লাইগ্যা বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া রইছে এক মিলিটারী। ওরা ইশারা করলেই গাড়ি থামাইতে হয়, নাইলে গুলী করে। ত' গাড়ি আমি থামাইলাম। আমারে উর্দু ভাষায় নামতে কইল। আমি নামলে ওই সব চেক করলো। বলে, 'সীট ওঠেনা ক্যান?' আমি তখন উর্দুতে বলছি, 'সাহেব তো বিলাত থিকা গাড়ি কিনছে।' তখন আমারে ধাক্কা দিয়া সীটে বসাইয়া দিয়া বলে, 'যাও, সামনের মিলিটারী তোমারে গুলী করবো।' আমি বাপ, বাপ কইরা গাড়ি ছাইড়া দিলাম। কিছুদূর আহনের পর আবার দুইটা মিলিটারী বন্দুক দিয়া ইশারা দিল, আমি গাড়ি থামাইয়া দিলাম। আমারে নাম জিগাইল। আমি ফট কইরা কইলাম 'হাবিব।' একটা মিলিটারী এমন জোরে কইল, 'হাবিব?' আমার তো পীলা চমকাইয়া গেল। আমার পাশের লোকেরে নাম জিগাইল। ও তো নাম ভুইল্যা গেছে। বলে 'হাম কম্পাউণ্ডার হ্যায়।' 'কিয়া? কিসকা কমাণ্ডার হ্যায়?' তখন আমি কইলাম, 'ও ডাক্তার সাবকা দাওয়াই বানাতা হ্যায়। কম্পাউণ্ডার। কমাণ্ডার, নেই হ্যায়। তখন জিগায় 'তোমরা লাইসেন্স কাহা?' 'ভুল গিয়া। ঢাকামে রতা হ্যায়।' তখন ধাক্কা দিয়া কয় 'তোমকো সামনেমে গুলী করেগা।'

আমি এতক্ষণ গোপালের কপালে যা ঘটেছিল, তাই শুনছিলাম। বললাম, "এবার তোমাকে ছেড়ে দিলো?"

"না দিদিমণি। কয়কি, 'তোমার গাড়িতে যন্ত্র আছে?' আমি কইলাম, 'নাহ্।' 'তুম্ মেকানিক হ্যায়? কাম জানতে?' আমি মাথা ঝাকাইয়া 'না' কইলাম। তখন আমাকে ওরা ছাইড়া দিলো আর বললো, সামনের ফেরীঘাটে দুইটা গাড়ি আছে। খারাপটা রাইখ্যা ভালটা লইয়া ঢাকা যাইতে বললো। আমি খুশি হইয়া দাউদকান্দির দিকে রওনা দিলাম। তখন আমি বলি, "তারপর দাউদকান্দি আসলে ওরা চেক করেনি?"

"না চেক করেনি। আমি গাড়ি রাইখ্যা একটু চা খামু ভাবছিলাম। আগের মিলিটারী যা কইছে, তা কইলাম। ওরা খুশি হইল। কিন্তু আমার পিছন ছাড়লো না। আমার লগে লগে হাঁটতে লাগলো। আমি আর চা খাইতে পারলাম না। আমাকে বলে, 'তোমারা ফ্ল্যাগ এতনা ছোট্টা কাহে? বড় ফাত্না লাগাও, জলদি।' আমি বাঁশের দোকানে যাইয়া একটা মুলীর লম্বা আগা লইলাম। তারপর গাড়িতে বইস্যা কোলের মধ্যে ফ্ল্যাগটা রাইখ্যা বান্দছি দেইখ্যা ওরা খুশি হইল। ফ্ল্যাগ কোলে না রাখলে মাইর খাইতাম।"

"তার পর কী হলো?"

"জেডীটাতো ঢাকার পাড়ে আছিল, ওটা ঐপাড়ে গেলে তবে আমরা এপাড়ে আসতে পারমু। একবারে দুইটা ট্রাক আর কয়েকটা গাড়ি ধরে। আমি প্রথম চান্সেই গাড়িটা উঠাইয়া দিছি। এই পাড়ে আইস্যা বাঁইচ্যা গেলাম। আর কোন অসুবিধা হয় নাই। ডেমরার থেইক্যা সোজা গুলিস্তানে একটা দোকানে জল খাইয়া, রুটি মাংস খাইয়া সিটি নার্সিং হোমে আইলাম।"

গোপালকে সাবধান করে দিলাম, "আর কিন্তু তুমি এ গাড়ি চালাবে না। গাড়ি মার্কা মারা হয়ে গেল।" গোপল চলে গেল।

ডাক্তার ওয়াহিদকে, এমনকি সুরাইয়াকেও গোপালের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা গোপন করে গেলাম। ২৫শে এপ্রিল বিহারীদের প্রসেশন হবার কথা ছিল, সেজন্যই জামাইকে যেতে দেয়া হয় নি। ঠিক হয়েছে ২৮শে এপ্রিল যাবেন। পাবনা, রাজশাহীতে সরকারের কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জেনে আসবেন। তাহলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে? তারা কারা, পাকিস্তানের ক্ষতি করছে? তারা যারাই হোক দেশের ভেতরে থেকেই তো করছে। তাহলে বি. বি. সি আর আকাশবাণী যা কিছু বলছে, তাতো কিছুটা সত্যি হবেই। 'যা ঘটে, তার কিছুটা সত্য বটে।' কিন্তু ডাঃ টি. হোসেন তো ১৭ই এপ্রিলে মুজিবনগরের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের কথা তো কিছু বলেননি। কেবল বলেছেন, "আমরা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছি।" আর বলেছেন "আমি সব বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি।" তাদের মধ্যে এদেশী কারো নাম তো বলেননি। কোন পথে গিয়েছিলেন আগের বার? এবার তো মনে হলো আগরতলা দিয় গেলেন। আর বলবেনই বা কখন? এক বিকেলে আসা, পরের দিন সারাদিন গুছানো, ব্যাংকের টাকা তোলা। কিছু টাকা বৌয়ের হাতে দিলেন, কিছু হয়তো শ্যালকের কাছে রাখলেন। নার্সিং হোমের সব পর্দা খুলে জড়ো করতে দেখলাম, ওলট পালট কাণ্ড।

দেখা যাক, ৩ নম্বরে গিয়ে বেশি কিছু জানা যায় কিনা। সুরাইয়া বললো, "এরাও খোঁজ খবর নিচ্ছে। পুলিশের মাধ্যমে এদের অফিসে খবর আসে। তবে পুলিশ ও তো বেশি নেই।" বুঝলাম সুরাইয়া এর বেশি কিছু জানে না বা বলতে পারবে না।

২৭শে এপ্রিল রাতে ডাক্তার সাহেবের ছোট্ট নাতনীটা খুব কাঁদছিল, বোধ হয় পেটব্যথা। মিসেস ওয়াহিদ বাচ্চাটাকে ওনার কাছে নিয়ে এলেন। ওনাদেরও মন খারাপ। জামাইটা এই গোলমালের মধ্যে পাবনা, না রাজশাহী যাবেন। নেহাতই দায়ে পড়ে যেতে হচ্ছে, সরকারের আদেশে। ২৮ তারিখে ভোর ছটায় জামাই রওনা হয়ে গেলেন। শুধু ডাক্তার সাহেব ও আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম। অফিসের বিহারী পিয়নকে ডাক্তার সাহেব বলে দিলেন যেন জামাইকে দেখে রাখে। সে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে চললো। সেদিন আর আমি বাইরে গেলাম না। সিটি নার্সিং হোমেও না। এখন তো গল্প করার বা বেড়াবার পরিবেশ নেই। তাছাড়া আমার

সীমানাও সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তো ১৩ তারিখেরপরে আর যাইনি। ওখানকার পাট চুকিয়ে এসেছি। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। ডাক্তার সাহেব বাসায় ফিরলেন।

পরের দিন সকালে উনি প্রাতঃভ্রমণ সেরে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। পথে এক বন্ধু বলেছেন, "জানেন ডাক্তার সাহেব, কাল মীরপুরের বিহারীরা তিনটা গাড়ি আটকে, মানে ওদের মহল্লায় টেনে নিয়ে, বাঙালীদের বেছে বেছে মেরেছে। এসবের তিনি কোন খবরই রাখেননি। একটু বেলা হলে মেয়ের দেওর ফোন করে মেয়ের অর্থাৎ তার ভাবীর খবর জানতে চাইলো।

এত লোক ভর্তি বাড়িটা মুহূর্তের মধ্যে নীরব হয়ে গেল। সকলের মুখেই আশঙ্কার ছাপ। আমার সে কী অবস্থা। আমি ডাক্তার সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। ভাবছি কী ঘটে গেল। দুর্ভাবনায় বাড়িটা বোবা হয়ে আছে। হায়রে। কালই ভোর ছটায় জামাইটা চলে গেলেন আমার চোখের সামনে দিয়ে। তখন কি ভেবেছিলাম তিনি আর ফিরে নাও আসতে পারেন? ডাক্তার সাহেব আবার বেরিয়ে গেলেন। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরলেন পাগলের মতো। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে নয়। প্রথমে নিশ্চয়ই গেছেন সেই কমলাপুরের কোচ ষ্টেশনে। সবাই আত্মীয়হারা, স্বজনহারা ওখানেই তো গিয়েছিলো। তারপর তিনি গেলেন হাসপাতালের মর্গে। সেখানেও কোন হদিস পেলেন না। তারপর তিনি মীরপুরে ঢোকার প্রস্তুতি নিলেন। সে যে কী ভয়ঙ্কর কথা। কেউ কি দুঃসাহস করেছে একাত্তরের সেই ২৮শে, ২৯শে এপ্রিল মীরপুরে ঢুকে লাশ খুঁজতে? প্রিয়জনের লাশ খুঁজতে, আপনজনের লাশ খুঁজতে। মেয়ের বাপ হয়ে জামাইয়ের লাশ খুঁজতে আমার প্রথম আশ্রয়দাতা ডাক্তার ওয়াহিদ দুরূহ কাজটি করতে পেরেছিলেন একাত্তরের সেই ২৯শে এপ্রিল।

বেদনাহত ডাক্তার কমলাপুর কোচ ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মতিঝিলে আসছেন। এক মিলিটারী অফিসার তার গাড়ি থামিয়ে বলেছে, "আমাকে একটা লিফ্‌ট দিতে পারো?" ডাক্তার দেখলেন লোকটা ভদ্র, অনুমতি চাইলো, জোর করলো না। তিনিও উর্দুতে বললেন "নিশ্চয়ই পারবো।" মনে মনে ভাবলেন, 'না' বললে তো গাড়িটাই নিয়ে নিতে পারে। গাড়িতে বসে আলাপ। তারপর বাঙালীদের গালাগালি। মস্তানদের চৌদ্দপুরুষের নিকুচি। এদেশের রাজনীতিকরা উচ্ছৃংখল ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তার ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক করেন তাঁর সঙ্গে। এক পর্যায়ে ডাক্তার বললেন, "দ্যাখো আমি তো তোমার একটা কাজ করে দিলাম। এখন তুমি কি আমার একটা কাজ করে দেবে?" অফিসার বললো, "কি কাজ? সম্ভব হলে করবো।" ডাক্তার তখন বললেন, "কথা যদি দাও, আমার কাজটা করে দেবে, তবেই বলবো।" "আচ্ছা। আমি কথা দিলাম।" তখন ডাক্তার বললেন, 'মীরপুরে যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যেতে চাই আমি। আমাকে নিয়ে যাও।" অফিসার অবাক হয়ে বললো, "তোমার কে আছে ওখানে? কাকে খুঁজতে যাবে?" ডাক্তার বলেন, "আমার ল্যাড়কা।"

তখন সে অফিসার বললো, "দ্যাখো, মীরপুর তো আমার চার্জে না, আচ্ছা। তোমাকে একটা নাম ঠিকানা লিখে দিই। ওটা মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে, সেখানে তাকে পাবে।" অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ডাক্তার মীরপুরের সেই অফিসারের খোঁজে গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে জানলেন, সে অফিসার এখন ডিউটিতে নেই। ওরা সময় বলে দিলো। ডাক্তার তখন বাড়ি ফিরে এলেন। নামাজ পড়ে, খেলেন কিনা জানিনে, আমি শোবার ঘরে শুয়েই ছিলাম। ডাক্তার আবার বেরিয়ে গেলেন।

এর মধ্যে বিকেল পাঁচটার দিকে এ বাসায় একটা কালো 'মরিস মাইনর" ঢুকলো। কাকে যেন খুঁজছে। তার চেহারায় মিলিটারীর ছাপ, গোঁফ আছে, চুলের ছাট মিলিটারী অফিসারের মতো। বাসার লোক ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে না। গলার স্বরটা যেন আমার চেনা চেনা মনে হলো। এক লাফে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে খড়খড়ি ফাঁক করে দেখি, ক্যাপটেন আহমেদ। দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললাম। আহমেদের স্ত্রী হোসনে আরা ইংরেজীতে এম, এ পড়ে। সেই সুবাদে পরিচয়। আহমেদ বললো, "গেণ্ডারিয়ায় আমি রুচি–কনাদের বাসায় গিয়েছিলাম ধূপখোলায়। ওরা বললো আপনি ও দোলা ধানমণ্ডি ডাঃ ওয়াহিদের বাসায় আছেন। ঠিকানা দিয়েছে ই. পি. আর–এর গেটের কাছে। সেখানে তো বিহারীরা থাকে। তারাই এ ঠিকানা দিলো।"

"হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব বছর দুই আগে ওখানে বিহারীদের ভাড়াটে ছিলেন। এটা তার নিজের বাড়ি।" আমি বললাম।

আহমেদ বললো, 'ওরা যে ঠিকানাটা দিয়েছে, এটাই বেশি। ওরা না বললে তো আপনাদের খুঁজেই পেতাম না। যাকগে দোলা কেমন আছে? দোলার স্বর্ণমাসী? আপনাদের ড্রাইভার?

আমি বললাম, 'এ অবস্থায় যেমন থাকা সম্ভব। গোপাল সিটি নার্সিং হোমে, স্বর্ণ গ্রামে–গঞ্জে চলে গেছে।"

আহমেদ বললো, "যখন দরকার হবে, ফোন করে দেবেন। এসে নিয়ে যাবো।" ফোন নম্বর দিয়ে চলে গেল। আমি মনে মনে বললাম যাবার বোধহয় সময় হয়েছে, 'সময় হয়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' এক দুঃসময়ের বন্ধুর আশ্রয় ছেড়ে আরেক অসময়ের বন্ধুর আশ্রয়ের আহ্বান এলো।

রাত হলো নীরবে। ছেলেমেয়েগুলোর পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ড্রইং রুমে কার্পেটের বিছানায় মেয়েরা যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ে রইল। আমার চোখে দোলার অসহায় অবস্থা ভেসে উঠলো। ডাক্তার সাহেব ফিরলেন রাতে, তবু তার সামনে দাঁড়াতে পারলাম না। গাড়ি তিনটে মীরপুরের বাইরে তো যেতেই পারেনি। ওখানে হতভাগ্য যাত্রীদের কপালে কী যে ঘটেছে সবাই বুঝতে পারছি। তবুও ডাক্তার প্রমাণের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারো কি চোখের পাতা বন্ধ হয়? কেউ কাঁদছে না, কাঁদলে তো মনের দুঃখ হাল্কা হয়।

৩০শে এপ্রিল ভোর হলে ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে গেলেন। যন্ত্রের মতো মানুষগুলো আবার চলাফেরা করছে। আমি তো অবশ হয়েই আছি। মেয়েটার কাছে একবারও যেতে পারছিনে। আজ এক মাস হলো হাসপাতালে লাশ ফেলে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। দুপুর হলো, পেটের দায়ে অনেকেই একটু খেয়ে নিলো। বেলা দু'টায় ডাক্তার ফিরে এলেন। আমার ঘরে খাটে বসলেন। কয়েক মিনিট সময়, আমার মনে হলো কয়েক ঘন্টা তিনি বসে আছেন। তিনি যেন কিছু বলতে চান। তখন নিজেই বললাম, 'কিছু বলবেন কি ডাক্তার সাহেব?" ডাক্তার এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, "কয়েক দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন কি?" তাকে এ দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে বলে দিলাম, হ্যাঁ।" ডাঃ টি. হোসেনরা নেই, ক্যাপটেন আহমেদ যে এসেছিলেন কিছুই জানেন না ডাক্তার। তিনি বললেন অনেক মনোবেদনায়, "আজ মেয়েটাকে জানানো হবে। গেণ্ডারিয়ার অনেক আত্মীয়-স্বজন আসবে।" অনেক ঝুঁকি নিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে তো নিরাপদ করতে হবে। আমি আহমেদকে ফোনে বললাম, "আজ আমাকে নিয়ে যেতে পারেন?" আহমেদ বললো, "অবশ্যই। বিকেল ৫টায় গাড়ি নিয়ে আসবো। সম্ভব হলে একটা মশারি আনবেন।" ব্যস, হয়ে গেল আমার ব্যবস্থা।

এবার ডাক্তার বললেন, "একটু পরে আমার বড় ভাবী আসবেন। ঐ ভাবীই একমাত্র মহিলা যিনি মেয়েকে জানাতে পারবেন। তা আপনার কোন চিন্তা নেই। বোরখা পরে ড্রইং রুম দিয়ে পিছনের বারান্দা পেরিয়ে মেয়ের ঘরে গিয়ে কোরআন শরীফ নিয়ে বসবেন। আর মাথা তুলবেন না। আপনি কিছুক্ষণের জন্য পেছনের বাগানে থাকবেন। উনি মেয়ের ঘরে গেলে আপনি আবার ফিরে আসবেন।" হায়রে মেয়ের ভগ্নহৃদয় বাপকেই সকল নাটকীয় ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমি তো তাঁকে এ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে সকালেই চলে যেতে পারতাম। ডাক্তার অন্য ঘরে গেলে আমি একটা ছোট স্যুটকেসে দোলার ও আমার কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ডাক্তার এসে আমাকে পেছনের বাগানে নিয়ে গেলেন। আমি দালানের কোনায় গ্যারাজের কাছে চার পাচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরে ডাক্তার এসে বললেন, "এবার আসুন।" নাটকীয় পটপরিবর্তন। আমি ড্রইং রুমে যাবার পথে বাঁদিকে চেয়ে দেখলাম মেয়ের নীচু মাথা আরো নীচু হয়ে আছে, বড় চাচী কোরআন শরীফ পড়ে যাচ্ছেন। মেয়েকে কি মুখে কিছু বলতে হয়? এদিক ওদিক চেয়ে দোলাকে জানালাম, "আমরা ৫টার সময় চলে যাবো আহমেদের বাসায়।" কাঁটায় কাঁটায় ৫টায় আহমেদ এলো গাড়ি নিয়ে। অলিন্দে গাড়িতে আহমেদ, সিঁড়িতে ডাক্তার নীরব বিদায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে, দোলা ও আমি গাড়িতে উঠলাম।

দীর্ঘ আঠারো বছরে মীরপুরের অভিযান ডাক্তারের মুখে আর শোনা হয়নি। একাত্তরের আটাশে এপ্রিলের কাহিনী উননব্বইয়ের এপ্রিলে আমি যখন তুললাম ডাক্তারের স্ত্রী বললেন, "সেই পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে কেন তুলছেন?" বললাম, "জানেন তো ঘা শুকায়, দাগ থাকে।

আপনার আমার দুঃখ কখনও পুরোপুরি যাবে না।" তিনি উঠে গেলেন। ডাক্তার অনেক কষ্টে মাটির দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে যা বর্ণনা দিলেন তা আমি সব মনে রাখতে পারলাম না, কিছুটা আবেগের আতিশয্যে, কিছুটা স্মরণ শক্তির ঘাটতি পড়ায়। ডাক্তার যা বলে গেলেন তার মর্ম হলো—২৯শের বিকেলে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে গিয়ে সেই নির্দিষ্ট অফিসারকে তার নিজের উদ্দেশ্য জানালেন। অফিসারটি পাঠান ছিলেন, ধৈর্য ধরে ডাক্তারের কথা শুনলেন। তাঁর নাম মমতাজ। তাঁর নিজের গাড়িতে ডাক্তারকে নিয়ে গেলেন সেই কসাইখানার দিকে। ডাক্তার মীরপুরের মেইন রোডের প্রতিটি ম্যানহোল নিজের হাতে খুলে দেখেছেন। কাছের ও গাঁয়ের দিকের ঘরগুলো, যেখানে হত্যাযজ্ঞ চলেছিল – সে সব ঘরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সব ঘরে তো হতভাগ্যদের লাশও ছিল না, ছিল রক্তের চিহ্ন। যেখানে যেখানে লাশ পেয়েছেন, মুখ তুলে দেখেছেন। কোথাও ধানক্ষেতের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তিনটে পাঁচটি লাশ তিনি মুখ তুলে দেখেছেন। ওরা না! ওরা অন্য হতভাগ্য। একটি খালের ধারে পাঁচটি লাশ, দড়ি দিয়ে বাঁধা, উপুড় হয়ে পড়েছিল। একটি একটি করে দড়ি খুলে মুখ তুলে দেখেছেন। না! তারাও না! এভাবে যতদূর ডাক্তার যেতে চেয়েছেন, ততদূর তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন অফিসার। জামাইয়ের লাশ না পেলেও, তিনি চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো। পরে বা ফেরার পথে দুটি তরুণকে তিনি পেয়েছিলেন। তাদের ডাক্তার জিজ্ঞেস করে জানলেন, তারাও ঐ হতভাগ্যদের মধ্যে ছিল। গাড়ির মোড় ঘুরতেই ওরা লাফিয়ে পড়ে প্রাণপণে গাঁয়ের দিকে দৌড়েছিল। ওরা বললো, "যারা শহরের দিকে দৌড়েছিল, তারা কেউ বাঁচতে পারেনি। বিহারীরা যে অনেক ছিল। আমরা দু'জন যেন কেমন করে বেঁচে গেছি।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দোলা ও আমি নিঃশব্দে গাড়িতে বসে ছিলাম। নিঃশব্দেই ওদের সিদ্ধেশ্বরীর বাসার দোতলার ফ্ল্যাটে উঠলাম। হোসনে আরা গাড়ির হর্ণ বুঝে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সবাই ড্রইং রুমে বসলাম। হোসনে আরা স্যারের এভাবে মৃত্যুতে মর্মাহত। বোধহয় শরবত এনে দিল। নিঃশব্দে কতক্ষণই বা থাকা যায়। তাদের দুটো ছেলে শুভ ও সাগর, একজন সাত, আরেকজন পাঁচ বছরের হবে। তারা দু'ভাই-ই দুর্দান্ত, এঘরে একটু দাঁড়িয়ে তাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনে নিজেদের ঘরে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সন্ধ্যায় সবাই ড্রইং রুমে টিভির কাছে বসলাম। নানা কথার পরে জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন আহমেদ নোয়াখালী থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন শেখ সাহেবের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের বিপরীতে। আমি যেন একটু আশার আলো দেখলাম। বললাম, "আপনার ড্রইং রুমে ভোটের প্রতীক চিহ্নের বড় ছবিটা দেওয়ালে ভালো করে টাঙিয়ে রাখুন, যাতে আপনার মিলিটারী বন্ধুরা এলে বুঝতে পারে আপনি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"

"সে আর বলতে হবে না। একটা ছোট ছবি আছে। কাল বড় ছবিটা টাঙাবো। আমার দরজায় বেল টিপলে আপনি বা দোলা দরজা খুলবেন না।"

রাতের খাওয়ার পরে শোবার ব্যবস্থা হলো। খাবার ঘরের পরের রুমটা ছেলেদের। ওদের দুটো বেড টেনে জোড়া দিয়ে আমরা চারজন শুলাম। দোলার মনের কথা বলতে পারবো না। আমি তো ডাক্তার ওয়াহিদের বাসার পরিস্থিতির কথাই ভাবছিলাম। গোপালও জানে না আমাদের অবস্থান পরিবর্তনের কথা।

১লা মে-র সকাল হলো। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে দোলা ও আমি নিঃশব্দে খেয়ে নিলাম। হোসনে আরা ও আহমেদ নীরবতা ভাঙবার জন্যে হাসপাতালের কথা কিছু কিছু জানতে চাইলো। উত্তর যা আমিই দিচ্ছিলাম। সারাদিনই দোলা তো বোবা। বুঝতে পারছি ২৮শে এপ্রিলের মীরপুরের ঘটনায় ৩০শে এপ্রিলে আমাদের মা-মেয়ের আশ্রয় পরিবর্তন ও নীরব বিদায়-মুহূর্তটি ওর মনে লেগেছে। রাতে শোবার আগে আহমেদ জানালো স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের খবর, "ডাঃ টি. হোসেন ওদের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছেন।" নিঃশব্দেই শুনে গেলাম। আমি যে জানি কিভাবে গোপাল ওঁদের চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছে তা কিছুই প্রকাশ করিনি। কিন্তু আর একটি দুর্ভাবনায় আমার রাতের ঘুম উড়ে গেল। গোপালের কি অবস্থা হবে। টি. হোসেনের শ্যালকও স্ত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে ওদের পুরানা পল্টনের বাসায় চলে যাবে। তারা ডাক্তারের দামী জিনিসপত্রও কিছু সরাতে পারবে। কিন্তু আমার শোকেসের দামী বইগুলো, দেরাজ ভর্তি বই আর বড় ট্র্যাংকে অবশিষ্ট মালপত্র কি করবো আমি? ফ্রিজটাও তো ওখানে আছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই চলে গেলাম গোপালের খোঁজে। ডাক্তারের শ্যালক ও পাটতোলার ব্যবস্থা করছেন। গোপালকে এক কোনে নিয়ে বললাম, "এ বাড়ির উপর এখন হামলা হবে। তুমিও সরে যাও। তার আগে আমার কিছু মাল সরাতে পারো কিনা দেখো। বড় ট্র্যাংকটা আর ফ্রিজটা ডাক্তার ওয়াহিদের মত নিয়ে তাঁদের গ্যারেজের পাশের কোঠায় যেখানে তার মেয়ের বাসার মাল আছে, সেখানে রাখো। আর খয়েরী ট্রাংকটা, বিলাতের দু'রঙা বাক্স ও বালতি ভর্তি স্যুভেনিরগুলো ক্যাপ্টেন আহমেদের দোতলার চিলে কোঠায় নিয়ে এসো।" গোপাল জানালো", ক'দিন থেকে ফোন আসছে, ডাক্তার কই গেছে, আসে না ক্যান। রোগী ভর্তি অইব। মিলিটারীদের গলা। তারও ভয় করছে, সে কোথায় যাবে?" গেলাম তো সুরাইয়ার কাছে, জানলাম ওখানে আমগাছটার তলায় পান সিগারেটের দোকানে স্পাই বসে। দুটা পর্যন্ত। ওকে বললাম, "আমার স্কুলের দু'টা সেলাইর কল, আর দু'টা Hermes টাইপ রাইটার তোমার বাসায় রাখতে চাই।" সুরাইয়া বললো, "বেশ! রেখে যাবেন। আমি সুবিধেমতো আমার ড্রাইভারকে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেবো। ও তো গেণ্ডারিয়ায়ই থাকে। কোন অসুবিধে হবে না।" ৩নং ধানমণ্ডি থেকে আবার ৫ নং-এ সিটি নার্সিং হোমে গোপালকে জানিয়ে এলাম দু'টার পরে আমি আবার যাবো। তখন মাল যা পারি সরাবো। গোপাল ডাক্তার ওয়াহিদের অনুমতির জন্য ২০ নং ধানমণ্ডির বাসায় গেল।

আমি দুপুরের খাওয়া সেরে বেলা আড়াইটা নাগাদ গোপালের কাছে গেলাম। গোপাল একটা ঠ্যালা নিয়ে জাহাজে আসা বড় ট্রাংকটা আর ফ্রিজটা নিয়ে ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায়

গেল। আমি নার্সিং হোমের একটি খৃষ্টিয়ান কর্মচারীকে নিয়ে দুটো রিকশায় চড়ে দু'জনে একটা করে সেলাইয়ের কল, আরেকটা টাইপ রাইটার কোলে বসিয়ে সুরাইয়ার বাসায় রেখে এলাম। তারপর একটি রিকশা করে আমার নিজের সিঙ্গার মেশিন ও এ্যাডলার টাইপ রাইটারটা নিয়ে আহমেদের বাসায় যখন পৌঁছালাম তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে। চা খাওয়া শেষ হতেই আহমেদের বাড়ির মালিকের ছেলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। অনেকক্ষণ থেকে গল্প করে গেলেন। তাঁরা হলেন বেগম মনিজা রহমানের ছোট ছেলের (আহমেদুর রহমান) বড় ছেলে ও বৌ। ক্যাপটেন আহমেদ কথায় কথায় বলে, "চলুন, কাল দুপুরে আমরা দোলাকে নিয়ে সিনেমা যাই। ও'তো কিছু কথাবার্তা বলে না।" ছবিটার নাম Divorce in American Style – অভিসার কিংবা মধুমিতায়। পরের দিন (৩রা মে) বেলা এগারটায় ওরা সিনেমায় গেলো। দোলার কোন ইচ্ছা–অনিচ্ছা বোঝা গেল না। ওরা ফিরে এলে আহমেদ বললো, "দোলা সারাক্ষণ নিঃশব্দে ছবি দেখলো। যখন Trailer দেখালো "The Absent Minded Professor" তখন কেবল বললো, 'আমার বাবা এ ছবিটা দেখতে গিয়ে ছিলেন, ফেব্রুয়ারী মাসে জোনাকি সিনেমায়। সেদিন সেক্রেটারিয়েটের কাছে মন্ত্রীর বাড়ি আগুন দিয়েছিল ছেলেরা। আমার বাবার সে ছবিটা দেখা হয়নি।'

তার পরের দিন সকালের দিকে গোপাল আমার একটা ট্র্যাংক, বিলাতের স্যুটকেস ও এক বালতি স্যুভেনির, মুসলিম মিয়ার ঢাকাই শাড়ির গাঁট নিয়ে সিদ্ধেশ্বরীতে আহমেদের বাসায় এসে হাজির। বলে", ওখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। যে কোন সময়ে মিলিটারীরা দখল নিতে পারে। নিরুপায় হয়েই না গোপাল এখানে আশ্রয় নিয়েছে। গোপাল চিলেকোঠায় আশ্রয় নিলো আমার মালপত্র নিয়ে। সারাদিন ওখানে শুয়ে থাকতো, খেতে ডাকলে নীচু হয়ে ছাদ থেকে নেমে আসতো, রাতের বেলা টিভি রুমে একটু বসতো, নয়তো রান্না ঘরে বসে কাজের লোকের সঙ্গে গল্প করতো। এখন আবার সে 'গমেজ।' কোন মাংস সে খায় না। তখন তো এ বাসায় শিং মাছ, খাসীর মাথা, নয় গরুর মাংস। ও শুধু ডাল আর শিং মাছ খায়। গোপাল আসার পরের দিন এ বাসায় দু'তিনজন মিলিটারী এলো। আমরা সবাই ড্রইং রুমে বসে ছিলাম। বেল দিলে আহমেদ আমাদের সরে যেতে বলে দরজা খুলে দিল। তারা বেশ কতক্ষণ ধরে অনেক কথা বললো। আমি ও দোলা তো ডাইনিং রুমে বসে কথা শুনছি। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছে, "এতজন অধ্যাপক তো মারা যায়নি। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা তো আগরতওলায় চলে গেছে।" একথা শুনে আহমেদ বলছে, "আমি নিজে তাকে দেখতে মেডিক্যাল হাসপাতালে গিয়েছি। মারা গেলেও আমি ৭ নম্বর ওয়ার্ডে লাশ দেখে এসেছি। এটাতো আর মিথ্যা হতে পারে না।" ওরা চলে গেলে আবার আমরা ড্রইং রুমে গেলাম। তখন গোপালকে দেখে আহমেদ একটু চিন্তিত হলো। অথচ ওকে পথে বের করেও দিতে পারে না। ওকে ছাদে নিয়ে বললো, "যদি কখনও মিলিটারী আসে চেক করতে, তখন তুমি এই পাইপ বেয়ে পেছনের কচুবনে গিয়ে বসে থাকবে। তোমাকে আমার বাসায় পেলে আমার বাচ্চাদেরও অসুবিধা হতে পারে।"

আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। গোপাল বেচারী যাবে কোথায়? এদিকে জগন্নাথ হলের অফিস খুলেছে, মানে অফিসের কর্মচারীরা রেজিস্ট্রার অফিসের পাশে একটা ছোট কোঠায় রোজ হাজিরা দেয়। হলে তো কেউ পা দেয় না। একদিন আমি ধানমণ্ডি যাবার পথে গোপালকে শাহবাগের মোড়ে নামিয়ে দিলাম। ও এগিয়ে যেতেই দেখে ঢাকা ক্লাবের কাছে, আর একটা আর্ট কলেজের কাছে বাস থামিয়ে মিলিটারীরা চেক করছে। গোপাল কি আর করবে? একটা রিকশা পেয়ে তাতে চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর দিয়ে কোন রকমে রেজিস্ট্রার অফিসে ঢুকে যেন প্রাণ পেলো। সেদিন আর সিদ্ধেশ্বরীতে ফিরে আসার সাহস তার ছিল না, জগন্নাথ হলের দারোয়ান ধীরেনদার সঙ্গে শুভাড্ডায় চলে গেল। আমি তো রাত ও পরের দিন চিন্তায় অস্থির। রেগে আহমেদকে বললাম, "ওকে ওর গ্রামে পাঠিয়ে দেবো।" আহমেদ বললো, "বেচারী এত বিপদেও যখন বেঁচে গেলো, তখন আর বিপদ বাড়াবেন না। পথে বাসে, লঞ্চে চেক করে।" পরের দিন গোপাল অফিসে এসে প্রভোষ্টকে বলে, "আমাকে ছুটি দিন, আমি বাড়ি চলে যাবো।" তখন ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট মীর ফকরুজ্জামান জগন্নাথ হলেরও প্রভোষ্ট। তিনি বললেন, "এখন দেবার অর্ডার নাই।" গোপাল ফিরে এসে এ ঘটনা বললে আমি সুরাইয়ার শরণাপন্ন হলাম। সুরাইয়াও ফিলোসফির ছাত্রী ছিল, সে মীর ফকরুজ্জামানকে চিঠি লিখে দিলো, "আপনি এখন জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট। প্রাক্তন প্রভোষ্টের চাপরাসীকে আপনার আশ্রয় দেওয়া উচিত।" গোপাল সে চিঠি নিয়ে মীর ফকরুজ্জামানের কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করতে পারলো না। সেখানে ঢোকা কী মুসকিল। চিছিদ্র গেট শত ধাক্কায়ও কেউ খোলে না। তারপর অফিসে গিয়ে চিঠি খানা দিলো। তিনি পড়ে তাঁর বিহারী দারোয়ানকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো আমি সামনের মাসে একটা গাড়ি কিনবো, একে আমি ড্রাইভার রাখলাম। তাকে নামাজের ঘরের পাশের ঘরটা খুলে দাও।" সেই থেকে গোপাল যেন নিজের আশ্রয় পেলো। ঐ ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতো, নামাজের সময়ও খুলতো না। চাংখারপুলের দোকান থেকে কিছু কিনে খেতো। রাতে পাউরুটি চিনি।

গোপালের ব্যবস্থা হবার আগেই ঢাকার স্কুলগুলো সব খুলে দিলো। আমাদের স্কুলে, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে ৭ই কি ৮ই মে তারিখে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলাদ পড়ে স্কুলে যোগ দিলেন (অবশ্য যারা ঢাকায় ছিলেন)। ছাত্রীবিহীন স্কুল। এ খবর পেয়ে আমি তড়িঘড়ি ডি.পি.আই-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "সে কি। আপনি এখনও জয়েন করেননি? যে সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিত, আমরা তো তাঁদের নাম ক্যানটনমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। যান। আজই গিয়ে একটা সই দিয়ে আসুন। এমনিতে কথা উঠেছে তিনি (গুহঠাকুরতা) আগরতলায় চলে গেছেন।" তারপর তিনি আরো কিছুক্ষণ সমবেদনার কথা বললেন। ডি. পি. আই অফিস থেকে আমি ডি. ডি. পি. আই অফিসে গেলাম। তিনিও এ রকম উপদেশ দিলেন, আর বললেন, "প্রধান শিক্ষিকার পুরস্কারের জন্য

আমি আপনার নাম ইসলামাবাদে পাঠিয়েছিলাম। সে কারণে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে।" আমি তখন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ নূরুসসাফা সাহেবের কথা ভাবলাম, তিনিও তো বায়োডাটা নিয়েছেন। ডি. ডি সাহেবের মেয়ে ইংরেজীতে অনার্স পড়ে। তিনিও আমার মেয়েকে হলিক্রস স্কুলে ভর্তি হতে সাহায্য করেছেন। ওনার ঘর থেকে আমি গেলাম বিদ্যালয় পরিদর্শিকা বেগম আয়েশা খানম চৌধুরীর ঘরে। তিনি বললেন, "প্রয়োজন হলে আপনার মেয়েকে আমার বাসায় রাখতে পারি। এ বয়সের আরো দু'তিনজন মেয়ে তো আমার বাসায় থাকে।" আমি বললাম, "তাতো আমি রাখতে পারবো না। আপনি 'হাসিনা মঞ্জিলের' পাশে থাকেন, মোড়ের মাথায় ডঃ সাজ্জাত হোসেন থাকেন। তাঁর ড্রাইভারও আমাকে চেনে। আমি কেমন করে আমার মেয়েকে দেখতে যাবো?" এরপরে গেলাম বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর ঘরে। মিসেস বাহারের সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেলাম। বুলবুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে গুহঠাকুরতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমি কাজের কথা বললাম, "ভাই। শাড়িওয়ালা মুসলিম মিয়ার শাড়ির গাঁট আমার কাছে ছিল ২৫শে মার্চ। পরে চুরি হয়ে যা আছে আমি নিয়ে নিয়ে ঘুরছি। এখন আছে ক্যাপটেন আহমেদের সিদ্ধেশ্বরীর বাসায়। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এ ঠিকানায় যেন আসে।" মিসেস বাহার, আমার পুরনো বন্ধু, কাজটি করেছিল। মুসলিম তার গাঁট নিয়েছিল।

মিসেস জয়নাব জলিল কোরিডোরে আমাকে দেখে তার ঘরে নিয়ে গেলো। তার সঙ্গেও 'তুমি' সম্পর্ক। বসে দু'চার কথা বলেই বললো, 'আমার মেয়ে নিলুফার ইংরেজীতে ফাইনাল দেবে। গুহঠাকুরতা ওর রেজাল্টটা জেনে যেতে পারলেন না। আমাদের সকলের দুঃখ। এখানে আর বেশি ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই। আমি এখন বাড়ি যাবো। চলো কোথায় যাবে, নামিয়ে দিই।" আমি তার সঙ্গে রিকশায় উঠলাম। রিকশায় জয়নাব বললো, "তোমার মেয়েকে আমার বাসায় রাখতে পারো। আমার দেওরের ছেলে দোলাকে 'দোলা পা' ডাকবে; দোলা আমার মেয়েকে 'নিলু আপা' ডাকবে। তুমি যদি মেয়েকে দেখতে চাও তো বোরখা পরে আসবে। আমার নীচের তলার ভাড়াটেরা বিহারী।" বাপরে। আবার বিহারীদের পাল্লায় পড়বো? আমার মনের চোখে ২৮শে এপ্রিলের দৃশ্যটা ভেসে উঠলো। বললাম, 'না ভাই, আমি বোরকাও পরতে পারবো না, মেয়েকে না দেখেও থাকতে পারবো না। তাই মেয়েকে তোমার সহৃদয় আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তোমার কাছে রাখতে পারবো না।"

"তবুও তোমার জন্য দরজা খোলা থাকবে, গেটের লেখা 'step in', কাজেই যখন ইচ্ছে ঢুকে যাবে। আমি দোতলায় থাকি।" কথা বলতে বলতে নিউ বেইলী রোডের সিদ্ধেশ্বরী মোড়ের মাথায় নেমে গেলাম।

এখন বাসায় এসে আরেক চিন্তা মাথায় ঢুকলো, কেমন করে স্কুলে গিয়ে সই করে আসবো? গোপাল থাকলে না হয় ওকে নিয়ে যেতাম। কিছুতেই সাহস হয় না। আহমেদকে একথা কেমন করেই বা বলি। আহমেদ ফিরে এলে আমার মুখে চিন্তার ছাপ দেখেই প্রশ্ন

করলো, "আবার কিছু কি ঘটলো?" আমি ডি. পি. আই অফিসের কাহিনী বললে, সে বললো, "তা, আর এমন কঠিন কি? স্কুলে ফোন করে দিন, খাবার পরে আপনাকে নিয়ে সই করিয়ে আনবো।" আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। তখনই একটা দরখাস্ত করলাম এক মাসের ছুটির জন্যে। আর কেরানী সাহেব ও হিসাবরক্ষকের এক মাসের বকেয়া কাজের তালিকা তৈরি করে ফেললাম। ফোনে কেরানী সাহেবকে পেলাম। তাকে জানালাম তিনি যেন জোহরের নামাজটা ঠিক সময়ে পড়ে এসে অফিসে থাকেন। আমি ২০ মিনিটে কাজ সেরে চলে আসবো। নাম সই করার খাতাটা টেবিলে রাখেন যেন। খাওয়া সেরে আহমেদের কালো 'মরিস মাইনরে' চড়ে গেণ্ডারিয়ার দিকে ছুটলাম। গুলিস্তান হয়ে নবাবপুর দিয়ে কোর্ট কাচারী পেরিয়ে লক্ষ্মীবাজার দিয়ে সুত্রাপুরের পুলের ওপারে রজনী চৌধুরী রোডে স্কুলের গেটে গাড়িটা থামলো। আহমেদ বললো, "আমি ধোপখোলায় এক বাসায় গল্প করে ২০ মিনিট পরে স্কুলের গেটে এসে তিনটা হর্ণ দেবো, আপনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবেন।" আমি আচ্ছা বলে নেমে গেটে ঢুকে গেলাম। গাড়ি সাধনার দিকে চলে গেল।

কেরানী সাহেব আমার অফিসে বসেছিলেন। আমি খাতায় সই দিলে, তিনি খাতাটা নিয়ে নিলেন। আমি ছুটির দরখাস্তটা দিলাম। তারপর ওনাদের কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে দিতেই তিনটা হর্ণ বাজলো। আমি চট করে বেরিয়ে এলাম, স্কুল বা বাগানের চেহারাটা চোখ বুলিয়ে দেখার সময় হলো না। আমার মাথায় ঘোমটা ছিল। পথে যাদের দেখলাম, তারা কেউ নামাজ পড়ে ফিরছেন, কেউ বা নামাজ পড়তে যাচ্ছেন। খুব পরিচিত মানুষের মধ্যে আর্টিষ্ট বজলে মওলা সাহেবকে মুখোমুখি দেখলাম। কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন না বা চিনতে চাইলেন না, তা বুঝতে পারলাম। আসার পথেও দেখেছি, এখন যাবার পথেও দেখছি রাস্তার প্রায় সব নামই বদলে গেছে। হেমেন্দ্র দাস রোড ও লক্ষ্মী বাজারের মোড়ে খাকি পোশাক পরা লোক গাড়ি থামালো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে গেল। এক রিকশাওয়ালা ছেলে আরেকজনকে বলছে, "আবে হ্যালায় অখন গাঁজায় দম দিতে পারিস।" এ দুঃসময়েও হাসি পেলো। আহমেদকে কি জিজ্ঞাসা করলো, আহমেদ পোস্তু ভাষায় উত্তর দিলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো। আহমেদ কে বললাম, "তোমার চেহারায় তো মিলিটারীর ছাপ আছে। আবার পোস্তু বলতে গেলে কেন?"

বলে, "দেখাইলাম।"

ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায় যেমন বাইরের খবর কিছু পাওয়া যেতো না, বাইরে, যাওয়াও নিষেধ ছিলো। কিন্তু আহমেদের কাছে শহরের ও বাইরের খবর, এমনকি গুজবও শোনা যেতো। আহমেদ বাইরে যেতো, অনেক সত্য অসত্য খবর পেতো। গুজবের মধ্যেও কিছু সত্য থাকে। ১০ই মে এসে খাবার টেবিলে এক গল্প ছাড়লো, "জানেন বাসন্তীদি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আত্মা এনেছিল। মানে তারা Plan Chette -এ দু'জনের আত্মা এনেছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছে।" দোলা উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কার? কার

কার আত্মা এনেছিল?" আহমেদ দোলার উৎসাহে খুশি হয়ে বললো, "তারা ডঃ দেব ও ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার আত্মা এনেছিল।" আমি বললাম, "ওরা ভাগ্যবান। আমি এত চেষ্টা করেও স্বপ্নে পাচ্ছিনে দেখতে। আশ্চর্য! আমি আবার Plan Chette—এ বিশ্বাসও করিনে।" দোলা জিজ্ঞেস করলো, "তাঁরা কি বললেন?" আহমেদ তো মজা পেয়েছে, বলে, "তাঁরা কেমন আছেন? কোথায় আছেন? দেশ কবে স্বাধীন হবে? না, না কবে দেশ শত্রু মুক্ত হবে?" আমি বলি" ওরা ঢাকায় বসে খায় দায়, ঘুমায়, আর অস্থির হয়ে আত্মা আনে, কবে ওরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।" অবশ্য মনের মধ্যে আমারও অস্থিরতা। কবে এ দুঃখের, এ যুদ্ধের শেষ হবে? আহমেদ বললো, "ডঃ দেব নাকি বলেছেন "অক্টোবরে দেশ পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে।' জ্যোতির্ময় বাবু বলেছেন, 'নভেম্বরের আগে নয়।" আমি বলি, এসবই ছেলেদের মনগড়া কথা। বর্ষায় নাকি যুদ্ধটা জোরালো হবে। পাকিস্তানীদের ওরা মছুয়া বলে, মছুয়াদের এই সময় অসুবিধা হবে।

পরের দিন, বোধহয় ১২ তারিখ হবে, সন্ধ্যা রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে আহমেদ জানালো, কাল থেকে আমাকে নাকি বোরখা পরতে হবে। দোলা জিজ্ঞেস করলো, "কেন? কেন?" দোলারও এখন উৎসাহ লাগছে। আজ কয়েকদিন ধরে শুভ সাগরের সঙ্গে ক্যারামও খেলছে। আহমেদ বললো, "দোলার বান্ধবী রিতা শবনামের চাচা স্ট্যাণ্ডার্ড পালিশার্সের মালিক বলেছেন, 'আপনার সেই অতিথিকে একটা কালো বোরকা কিনে দেবেন। অর্থাৎ কিনা আপনাকে আমি কাল একটা কালো বোরকা কিনে দেবো।"

"তার আগে একজনের অনুমতি নিতে হবে। তিনি আমার স্কুলের সেক্রেটারী ডাক্তার ওয়াহিদ।"

তার পরদিন সকাল আটটায় গিয়ে ডাক্তারকে সব বললাম। তিনি তখন বোঝালেন, "আপনি যা বিশ্বাস করেন না তা করবেন না। আপনি বোরখা পরে ধরা পড়লে, অন্য যারা বোরকা পরে তাদের অসুবিধে হবে।" আমিও ওনার কথা শুনে বোরখা নিলাম না। সেদিন থেকে কালো নাইলনের শাড়ি ও মাথায় ঘোমটা দিলাম। তাতেও রেহাই পেলাম না। আমার কেরানী সাহেবের ভাই সাইকেল থেকে নাক বরাবর আমাকে রিকশায় দেখেছেন। আরেক জন আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী রাবেয়া খাতুন, বর্তমানে প্রাইমারী সেকশনের শিক্ষিকাকে বললেন "আপনার প্রধান শিক্ষিকা মারা যান নি, তাকে আমি দেখেছি।"

রাবেয়া বললো, "বলুন তো তিনি কেমন?"

"তাঁর সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি, পরণে কালো নাইলনের শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, চশমার ফ্রেম গোলাপী, ডান হাতে ঘড়ি।"

রাবিয়া বুঝে নিল। দিদিমণি তাহলে এখন মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেন। যাক বেঁচে আছেন, তাহলে।

সুরাইয়ার বাসায় কয়েক দিন পরে গেলাম। কয়েক দিনের বিশেষ ঘটনাগুলো খুব মজা করে বলে আরাম পেলাম। আর বার বার টোষ্ট মাখন আর চা খেলাম। কথায় কথায় সুরাইয়া জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা বাসন্তীদি, . . .নামের মেয়েটিকে আপনি চেনেন?"

"আমি তো এ নামের মেয়েটিকে চিনি। তবে কেন?"

সুরাইয়া বললো, "ও নাকি কোন ক্যাপটেন, না মেজরের ভাত রান্না করে।"

আমি রেগে গেলাম। বললাম," শুধু কি রাঁধে? না খায়, ঘুমায় সবই করে। কাল আমি খবর পেতে চেষ্টা করবো।" রাতের বেলা ক্যাপটেন আহমেদকে এ গল্পটা বললাম। ও বললো, "কাল যাবো ঐ পাড়ায়।" ঠিক। গাড়ি নিয়ে সেকেণ্ড ক্যাপিটালের লাল বাড়িগুলোর চারদিকে দু'তিন বার টহল দিয়ে এলো। বললো, "চেহারা তো আর চেনার উপায় নেই। কয়েকটা বাড়ির গোল জানালার কাছে মলিন মুখে দাঁড়ানো একটা করে মেয়ের চেহারা দেখলাম। মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।" একটু থেমে বললো, "আরো অনেকে এরকম গল্প করে বাইরের।" জেলিও বলেছিল, হাসপাতালে অনেক আহত অসুস্থ মেয়ে মানুষ আসছে। দিনকাল খারাপই হচ্ছে। বাইরে এবং ভেতরে কত না নির্যাতন চলছে, তার ইয়ত্তা নেই।

মে মাস খুব গরম, কখন সখনো বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম কমছে না। তরি–তরকারীও বাজারে আসে না। মাছ বিশেষ করে নদীর মাছ তো কেউ কেনে না। খায়ও না। মাছের পেটে মানুষের গোস্ত। কিন্তু রুই মাছ তো নিরামিষাশী, তাও বেশি লোকে কেনে না? এ বাড়িতে আসে শিং মাছ, খাসির মাথা, আর গরুর গোস্ত। গোপালকে নিয়ে বড় ঝামেলা। গরুর গোস্ত তো খায়ই না, শিং মাছও না। খাসির মাথা না, শুধু ডাল আর খাট্টা দিয়ে খায়। গোপালকে নিয়ে আহমেদ মাঝে মাঝে বাজারে যেতো। গোপাল গাড়ি চালাতো আর বলতো "তোমাকে আমি ড্রাইভার রাখবো।" ওকে গাড়িতে বসিয়ে আহমেদ বাজার করতো, তখন গোপাল ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকতো।

এত গরমে গরুর গোস্ত খেতে খেতে দোলার এ্যালার্জি হয়ে, গায়ে বড় বড় বাতের গোটার মতো হয়ে গেল। চিংড়ী মাছ খেলে ওর ছোট বেলায় এমন হতো। নিরুপায় হয়ে আমি সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় ডাক্তার মূর্তজার বাসায় ১৪ নম্বরে গেলাম। ভাগ্য ভালো তাঁকে পেলাম। এ সময়ে এ পাড়ায় অনেক ফ্ল্যাটই খালি ছিল। ডাক্তার মূর্তজা আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পলা আমাকে নিয়ে বারান্দায় খাবার টেবিলে বসালো। আমি প্রথমেই আমার সমস্যা জানালাম। ডাক্তার ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে এসে ওষুধের স্যাম্পলগুলো টেবিলে ছড়ালেন। তার থেকে আমাকে দু'রকমের ঔষুধ দিলেন আর ইংরেজীতে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেনঃ

For Dola

Alermine 1 ph.

তারপর আমরা সবাই দু-দিকের খরবা খবর নিতে থাকলাম। আমাদের কথা ওরা লোকমুখে কিছু কিছু জানতো। ওদের খবর আমি তো জানতাম না। ডাক্তার মূর্তজা বললেন, "আমার ভাগ্য ভালো এখনও বেঁচে আছি। তাই আপনি আমাকে পেলেন। আমাকেও ২৬শে মার্চ ভোর ছ'টায় ধরে নিয়ে কত যে লাশ টানালো। ফিরে এসেছি আয়ুর জোরে।"

সেকি কথা! ডাক্তার সাহেবকে দিয়েও লাশ টানিয়েছে ঐ ঘাতকরা? ওরা কেবল মারতেই পারে, লাশ টানতে পারে না? কী আমার বাবুরে!

এর পরে বেশির ভাগ কথাই বললো পলা, "জানেন বাসন্তী দি আমারই দোষ। সারারাত চারিদিকে গুলীর শব্দ আর ইকবাল হলের যুদ্ধে আমরা তো আধমরা। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কোঁকানীর শব্দ শুনতে পেলাম। তখন ডাক্তারকে বললাম, 'যাও তো, গ্যারেজের ওখানে কে যেন কোঁকাচ্ছে।' বোধহয় ইকবাল হল থেকে দেয়াল টপকে গ্যারেজে পড়ে পা ভেঙেছে। আমার কথায় ডাক্তার তুলা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এই রান্না ঘরের দরজা দিয়ে গ্যারেজের দিকে গেল। তখন ওখানে ছিল জিনাত বলে একটি ছেলে, আর পায়ের হাড় ভেঙে পড়েছিল রউফ। ২০ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে ডঃ আজিজ এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। কিন্তু তাঁরা ওকে নাড়তেই পারছেন না। ডাক্তার মূর্তজা বললেন, 'এতো আমার কাজ নয়, হাড় ভেঙে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে সেট করতে হবে। আমি একটা ইনজেকশন দিয়ে দিই আর ট্যাবলেট খাইয়ে দিই পেইন কিলার।' তখন তারা কোন মতে রউফকে নিয়ে ডাঃ আজিজের বাসায় রাখলো। তারপর মূর্তজা সামনের দিক দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলেন সঙ্গে জিনাত।" ওরা বলে চলেছেন, আর আমার তখন ২৬শে মার্চের জগন্নাথ হল আর শহীদ মিনার পাড়ার দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। ভাবি, এর মধ্যে ওরা যেতে চেয়েছিল হাসপাতালে? আমি ঐ মুহূর্তে ২৬শে মার্চের আমার পরিবেশের মধ্যে ডুবে গেলাম।

তখন পলা দেখে, দু'টা বন্দুকধারী মিলিটারী, কোথাও ওঁৎ পেতে ছিল, তারা ওদের দু'জনের হাত ধরে ১২ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে নিয়ে গেল। উত্তরের বারান্দার নেটের ভেতর থেকে পলা দেখতে পেলো আরো দুটো ছেলেকে নিয়ে আরেকজন মিলিটারী বসে আছে। ছেলে দুটো কাঁচুমাচু হয়ে গা ঘেঁষে বসেছিল। ডাক্তারকে পেয়ে ওরা নড়েচড়ে বসলো। মিলিটারীরা ডাক্তারের সঙ্গে উর্দুতে অনেক কথা বললো। আহত ছেলেটির কি যে হলো, পলা আর দেখলো না। ওর চোখ, মন ঐ ১২ নম্বর বাসার দিকে। ওখানে আলী নকী সাহেবের বাসায়ও কাকে যেন মেরেছে। মিলিটারীরা ওদের চারজনকে নিয়ে ফ্ল্যাটের ভিতরে গেল। পলা আপসোস করছে, "এ আমি কি করলাম। আমার দোষেই তো ডাক্তারকে নিয়ে গেল।" একটু পরেই ওরা তিনজন ও একজন, কোন ফ্ল্যাটের কাজের লোক দিয়ে পর পর তিনটা লাশ টেনে নীচে নামালো। এ লাশের মধ্যে ছিলেন ভূতত্ত্ব বিদ্যার ডঃ মুক্তাদির, অধ্যাপক আলী নকীর কাজিন ও আরেক বাড়ির কাজের লোক। হায়রে! ডাক্তার মূর্তজাকে তার সহকর্মীদের লাশ টানতে হলো?

তারপর অনেকক্ষণ হয়ে গেল। যারা লাশ টেনে নিয়ে গেল তারা আর ফিরে আসছে না। কুলীন জল্লাদরা কোতল করেই খালাস। 'লাশ ধরবেন না। পলা একবার এ বারান্দা একবার ও বারান্দা করছে। এর মধ্যে আলী নকী সাহেবের নিজের ভাই এলো পলার কাছে। তার হাতে গুলী লেগেছে। পলা কোন রকমে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো। বেলা প্রায় আটটা নাগাদ কে যেন পলাদের দোরের কড়া নাড়া দিলো জোরে। হয়তো জোয়ানরাই এসেছে। তবুও পলা দরজা খুললো। না! ওরা না। ডাক্তার মুর্তজা রক্তমাখা বীভৎস চেহারা নিয়ে খাবার টেবিলে তার নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটায় মাথায় হাত দিয়ে বসে বললো, "একবার কলকাতায় রায়টের মধ্যে পড়ে ঘরে ফিরে এসেছিলাম, এবার দ্বিতীয় বার ধরে নিয়ে গেলো মিলিটারীর হাত থেকে ফিরে এলাম। আবার যদি নেয়, তবে আর ফিরে আসবো না।"

ডাক্তার মুর্তজার কথাগুলো সেদিন হুবহু পুনরাবৃত্তি করলো পলা। আমি শুনে যাচ্ছিলাম। "জানেন, ইকবাল হলের ছাদে কয়েকদিন ধরে শকুন বসছিল।" তার মানে ওখানেও কয়েকটা লাশ ছিল। এমন সময় ডঃ নীলিমাদির স্বামী ডাক্তার ইব্রাহীম সাহেব পলাদের বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরে তিনি একপথে চলে গেলেন মাথা নীচু করে। আমি একজন চেনা মানুষ দেখে খুশির চোটে নাম ধরে ডাকলাম। তিনি শুনলেন কি শুনলেন না বুঝতে পারলাম না। মনে হলো ইচ্ছে করেই যেন শুনলেন না, চাইলেন না। দুঃখ পেলাম। মূতর্জাকে বললাম, "ডাক্তার সাহেব, কোথায় লাশগুলো রেখে এলেন?"

তিনি বললেন, "বৃটিশ কাউন্সিলে সাজঘরে তেইশটি না ত্রিশটা লাশ ওরা গুনালো। তারপর আমাদেরকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলী করা শুরু করবে এমন সময় একটা ট্রাক এলো, বললো, 'হল্ট'। অমনি ওরা বন্দুক নীচু করে দৌড়ে ট্রাকে উঠে গেলো। আমিই লাইনের শেষ মাথায় ছিলাম।"

ওরা আমাকে দুপুরে খেয়ে যেতে বললো। আমি তো ওদের কাহিনী শুনতে শুনতে ভুলেই গিয়েছিলাম, আমি মেয়ের ওষুধের জন্যেই এহেন পরিবেশে বেরিয়ে এসেছি।

এখান থেকে কোথায় গেলে ওষুধ পাওয়া সহজ হবে? মেডিক্যাল থেকে চানখার পুল পর্যন্ত খোঁজ করে দেখি। যাবার পথে বৃটিশ কাউন্সিলের রোনাল্ড সাইকস্য়ের কথা মনে হলো, ওকেও গুলী করতে চেয়েছিল। "বৃটিশ বৃটিশ" বলতে ওকে রেহাই দিয়েছে। ও এখন কোথায় আছে, কে জানে! অফিস তো বন্ধ, ওরা বোধহয় দেশে চলে গেছে। আমাদের কথা তো জেনেই গেছে। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখি জগন্নাথ হল কর্মব্যস্ত। নর্থ হাউসের সামনে একটা ট্রাক ভর্তি হচ্ছে ভাঙা ইট ও আস্তর দিয়ে ; রাজমিস্ত্রিরা সব কামানের গোলায় ছিদ্রগুলো নতুন করে আস্তর দিয়েছে। দালানের মেঝে সিঁড়ি সব ধোয়া হচ্ছে। ২৫শে মার্চের রাতের অন্ধকারে ছাত্র-কর্মচারীদের রক্তে হোলি খেলেছিল পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী, সে হোলির রক্ত সাফ করাচ্ছে আমাদের লোক দিয়ে, গাড়ি ভর্তি জঞ্জাল সরিয়ে নিচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির লোক দিয়ে, যেমন নিয়েছে রমনা কালী মন্দিরের ভগ্নাংশগুলো।

আমার অজ্ঞান্তেই আমার পা দুটো হলের পুকুরের ঘাটলার ধারে চলে এলো। বালতি বালতি জল নিচ্ছে যোগালীরা। পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে হয়তো ইকবাল হলেও। আজ কি কাল ই. উ. এন-এর প্রিন্স সদরুদ্দিন আসছেন দলবল নিয়ে, ওয়াল্ড ব্যাংকের মিশনও আসবে। দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা মিলিটারীদের ভাষায় স্বাভাবিক অবস্থা, সেটা দেখে যাবে। দেখে যাবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি। শুধু ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনারটি প্রত্যেক হলেই ভাঙা ছিল। আমি নীরব দর্শক নিঃশব্দেই বেরিয়ে এলাম মেইন রোডে তখনকার নাম ফুলার রোড। দেখলাম একটা রিকশা থেমে গেলো এ্যাসেম্লী হলের মেইন গেটে। ভাবলাম আমি এ রিকশায় চানখারপুল পর্যন্ত যেতে পারবো। হায়! পোড়া কপাল! দেখি রিকশাওয়ালা মাথার গামছা খুলে নেংটি পরলো, আর লুঙ্গীটা ফুটপাথে বিছিয়ে লোহার খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তারপর টাল-টাল বই রাখলো লুঙ্গীর উপরে। হায়রে! হলে ছাত্র নেই, হলের লাইব্রেরী চোরের জন্যে খোলাই আছে। তখনও বই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। লুঙ্গী দিয়ে বইয়ের গাঁট বেঁধে রিকশায় তুলে সে নির্বিবাদে চলে গেল।

আমি হাঁটা ধরলাম আমার ৩৪ নম্বর বাসার ফুটপাথ ধরে। ২৬শে মার্চ দিনে-রাতে, ২৭শে মার্চের সারারাত ধরে যে ডিনামাইট দিয়ে সেন্ট্রাল শহীদ মিনারটি ভাঙতে চেষ্টা করলো, মিনারের ভিত তো তাতে ভাঙতে পারলো না? আমার পা আর চলে না। চানখারপুল মনে হলো অনেক দূর। ওষুধ কিনে রিকশায় চড়ে সিদ্ধেশ্বরীতে আহমেদের বাড়ি গিয়ে চান না করেই খাওয়ার টেবিলে বসে গেলাম। খাবার পরেই দোলাকে ওষুধ খাইয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। খাবার পরে আহমেদ জানালো, "বাসন্তীদি, হিন্দুদের ব্যাংকের টাকা সিজ করছে। আপনার ব্যাংকের টাকা সব তুলে ফেলুন। স্যারের নামে আলাদা এ্যাকাউন্ট আছে নাকি?" বললাম, "না, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ব্যাংকে (সোনালী) জয়েন্ট আছে। ২৫শে মার্চের পরে তো আর টাকা তুলিনি। জমাও হয়নি। মনে মনে ভাবছি আমি টাকা তুলে কোথায় রাখবো? যার বাসায় আশ্রিত, তার কাছেই তো রাখতে হয়।"

যাই হোক রাত ভরে চিন্তা করলাম। মানিক বাবুকে (ব্রাহ্ম সমাজের) নাকি ব্যাংক থেকেই ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারীরা। কিন্তু টাকা তুলতে দেয়নি তাতো শুনিনি। বুট দিয়ে মাড়িয়ে তাঁর পা ও হাতের আঙুল ও পায়ের পাতা, হাতের তালু ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। পরের দিন সকাল ন'টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গেলাম পাস বুক ও চেক বই নিয়ে। প্রথমেই কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম "কত টাকা একবারে তোলা যায়?"

ছেলেটি বললো, "আপনি কত টাকা তুলতে চান?"

আমি তখন বললাম, 'ধরুন পাঁচ হাজার।"

"কোন অসুবিধে নেই।"

তখন আমি ম্যানেজার সাহেবের রুমে গেলাম। ম্যানেজার মোকাররম হোসেন আমাদের চেনা, একান্ন বাহান্ন সালে রেস্কিন স্ট্রীটের যে বাড়িটায় ছিলাম ওর আব্বা সে বাড়িটা কিনে নিয়েছেন। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ভাই! হিন্দুদের নাকি টাকা তুলতে দেয়না?"

ম্যানেজার বললো, "কে বলেছে, বৌদি? ও কথা ঠিক না। তবে যাদের টাকা তুলতে দেওয়া হবে না, তাদের লিষ্ট আমাদের কাছে আছে। তাতে আপনাদের নাম নেই।"

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিলাম।

তারপর কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবকে দেখে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি হলেন সেই ছয়জনের একজন, যাঁদের পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। (তাঁরা হলেন ডঃ সাজ্জাত হোসেন, কাজী দীন মুহম্মদ, ডঃ মোহর আলী, রাজিয়া ফয়েজ, ডঃ ফাতিমা সাদেক এবং মাহমুদ আলী)। একজন বাদে পাঁচ জনই শিক্ষাবিদ। আশ্চর্য! শিক্ষাঙ্গন বিনষ্ট করে ছাত্র-শিক্ষক মেরেছে যারা, তাদের দোসর হয়ে মিথ্যা প্রচার করে এলেন এঁরা? তাঁর পাশে বসে রাগে দুঃখে বললাম, "আপনাকে তো ভালো মানুষ বলেই জানতাম। সেই আপনি কিনা অতগুলো মিথ্যা কথা বলে এলেন? আপনারা কেন বলেছেন ডঃ গোবিন্দ দেব আর ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা Cross Firing -এ মারা গেছে ? জগন্নাথ হলে যুদ্ধ হয়েছে। আপনি ২৫শে মার্চ রাতে কোথায় ছিলেন?" আরো কিছু বলতে পারতাম, তিনি হাতে ধরে মাফ চাইলেন, "দিদি, আমি আপনার ছোট ভাই। আপনি তো অনেকদিন ধরে আমাকে চেনেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের সবাই আমার দিকে চেয়ে আছেন। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি আমার হাতে দু'প্যাকেট কড়কড়া পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। ব্যাংকের বাইরে দাঁড়িয়ে সুস্থ হতে চেষ্টা করছি, এমন সময় অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য (পরে শহীদ) উপর দিকে মুখ করে বারান্দার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে চলে গেলেন। তিনি আমাকে চিনলেন না, কাউকেই না। তিনি তো গ্রামে থাকেন শুনেছি, বোধহয় টাকা তুলতে এসেছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো, "ঢাকা শুধু লাশের শহর না, জীবনমৃতের শহর।"

আর সেদিন সন্ধ্যা রাতে হোটেল ইন্টারকনে মাত্র গোটা তিনেক বোধহয় হাত বোমা ফুটলো। বিচ্ছুদের কারবার শুরু হয়ে গেছে। মহামান্য প্রিন্স সদরুদ্দিন ও তাঁর দলবল বুঝতে পারলেন ঢাকা কেমন শান্ত। শান্ত ও শান্তির এই নমুনা এঁদের জানিয়ে দেয়া হলো। পরের দিন ভোরে গেলাম সুরাইয়ার বাসায়। ডেমরার ও. সি সাহেবের ও তাঁর স্ত্রীর অবস্থা জানতে, ক্যানটনমেন্টের হালচাল বুঝতে। সুরাইয়া খুলনার কল্পনার কাহিনী বললো। বিধবা মা ও মেয়ে থাকে তাদের নিজের বাড়িতে। একটা রুমে বোধহয় ডাক্তারের ডিসপেন্সারী। মেয়ে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। ভালো সেলাই জানে। সুরাইয়া তাকে দিয়ে পেটিকোটের এমব্রয়ডারী করাতো, ওদের বাড়িতে নাকি আগুন দিয়েছে। মা-মেয়ে সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে মারা যায় আর কি। পুলিশরাও পালাচ্ছিল। তারা ওদেরকে ধরে ফিরিয়ে আনে। খবরটা সুরাইয়া চা খেতে খেতে বললো, "পুলিশরা যাচ্ছে, আমি কিছু শাড়ি ও টাকা দিচ্ছি।" আমিও কিছু দিতে চাইলাম। দুখানা নাইলনের শাড়ি ও বিশটা টাকা দিলাম। শাড়ি দু'টা খুব কাজে লাগবে। আজও আমার হাসি পায় মাত্র বিশ টাকা দিয়েছিলাম বলে। তবুও সে পুলিশদের হাতে কৃতজ্ঞতার চিঠি পাঠিয়েছিল।

গোপাল যাহোক একটা আশ্রয় পেয়েছে ফকরুজ্জামান সাহেবের ফজলুল হক হলে। শুধু তাই নয় জগন্নাথ হলের একজন হাউস টিউটর, পূর্ণ দত্ত, চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু হল তো তচনছ। ডঃ জামন তাঁকেও ফজলুল হক হলের একজন হাউস টিউটরের তালা ভেঙে রুম খুলে দিলেন। তিনি সস্ত্রীক সেখানে চোরের মত বদ্ধ ঘরে থাকতেন। আবার ভয়ের রাজত্ব শুরু হয়েছে। পথেঘাটে বেছে বেছে লোক ধরে নিচ্ছে, নামীদামী লোকদের পিছনে লেগেছে। দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে ধাওয়া করেছে। তাঁর ছেলের সঙ্গে তখন তিনি খাচ্ছিলেন। ওরা কথা বলে চলে এলো। তিনি পরে ছেলে রবিকে নিয়ে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদেরকে নির্ভয়ে চলে যেতে বলে টিক্কা খান। তারপর আশ্বাস পেয়ে বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে এলে তাঁদের আর হদিস পাওয়া গেল না– সেটা ছিল ১৭ই মে। বড় মানুষ ওরা রাখবে না এদেশে থাকবে গরীব আর পোড়ামাটি।

১৯শে মে হাকিম সাহেব বললেন আমাকে, "এখন থেকে মেয়েকে নিয়ে এক সঙ্গে বাইরে যাবেন না। আপনাদের তো অনেক বিদেশী বন্ধু বান্ধব আছে। সেখানে মেয়েকে রাখার ব্যবস্থা করুন আর আপনি আলাদা থাকুন।" আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কোথায় যাবো আমি? সাহেব বন্ধুরা সব বড় চাকরি করেন। তাঁরা আমাকে কেমন করে রাখবেন? মেয়েকে না হয় দেশী লোকের বাড়ি রাখবো। হাকিম সাহেব বললেন, "মেয়েকেও কোন হিন্দু বা মুসলিম বাড়িতে রাখবেন না।" তাহলে কি হবে? সুরাইয়া ও আমি পরামর্শ করে পরের দিন ২০ তারিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে হলিক্রস স্কুলের প্রিন্সিপাল সিষ্টার টেরেসার কাছে গেলাম। সিষ্টার ভাবলেন দোলাকে (মেঘনা) আমরা স্কুলে পাঠাতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, "না, মেঘনাকে স্কুলে পাঠাবেন না। যশোরে স্কুলে এসে ক্যান্টনমেন্ট থেকে জিজ্ঞাসা করে "হিন্দু লাড়কী লোগ আতা হ্যায়?" তাই আমরা মেঘনার নাম কেটে দিয়েছি।" তখন সুরাইয়া অনেক অনুনয় করে বললো, "সিষ্টার, মেঘনাকে আপনাদের 'Bottomley Home' (orphanase) য়ে ভর্তি করে নিন। সিষ্টার বললেন, "সে কি করে হয়? এটা তো খৃষ্টানদের জন্য।" সুরাইয়া বললো, "মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান তো গায়ে লেখা নেই! তাকে খৃষ্টান বানিয়ে নাও।" তখন সিষ্টার কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুরাইয়াকে বললেন, "আচ্ছা, আপনি মঙ্গলবার ২৫ তারিখে একা আসবেন। দেখি কি করা যায়।" এবার সাহস পেয়ে আমি বললাম, "সিষ্টার আমার তো হাইব্লাড প্রেসার। আমাকে কি Holy Family Hospital–এ ভর্তি করে দিতে পারো? আমি ওখানে আত্মগোপন করে থাকতে চাই। আমার কোন আশ্রয় নেই।" সিষ্টার বললেন, "রোববার আমি ওদের ওখানে যাবো, Sister Sarah–র সঙ্গে দেখা হবে। আমি বলবো। আপনি মিসেস হাকিমের কাছে জানতে পাবেন। আপনি আর আসবেন না।" আমার মনে আশার সঞ্চার হলো।

সোমবার ২৪ তারিখে সুরাইয়া ওর মেয়ে নীলুফার ও ছেলে নয়িমকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে সিষ্টারের সঙ্গে দেখা করে এলো। সিষ্টার বলে দিলেন শুক্রবার ২৮শে মে মেঘনাকে

বিকেল তিনটায় তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে। সঙ্গে একশ' টাকা নিতে বলেছেন তিনি, টাকা দিয়ে ওকে দুটো শাড়ি কিনে দেবেন, আর কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস। আমি তো সুরাইয়ার বাসায় বসেই ছিলাম। সুরাইয়ার কথা শুনে খুব শান্তি পেলাম। পরে দু'জনে মিলে চা টেডি বিস্কিট জ্যাম দিয়ে খেলাম। সুরাইয়া বললো, "একা যাবেন না। ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দেবে। পথে 'মিলিশিয়া' নেমেছে।" সত্যিই। শাহবাগ থেকে মিন্টো রোড পর্যন্ত কিম্ভুত কিমাকার চেহারার জংলীগুলো কালো গায়ের রং, তাতে আবার গাঢ় ছাই রংয়ের পোশাক, 'দানায় দানায়' দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নাকি মায়া দয়া নেই। চেহারায় তার প্রমাণ। বাসায় গেলে দোলা বললো, "মা তুমি রোজই কেন বাইরে যাও? শুধু কি সুরাইয়া আপার বাসায়ই?" দোলাকে তো বলতে পারিনে কোথায় যাই, কেন যাই। সেদিন রাতে সব বললাম। আহমেদকেও এ. আই. জি. হাকিম সাহেবের উপদেশগুলো জানিয়ে দিলাম। দোলার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হলো, বোঝা গেল না। আহমেদ বললো, "হিতৈষী বন্ধুর কথাই শোনা উচিত।"

২৪ তারিখে সোমবার সুরাইয়া বললো, "বাসন্তীদি, আপনারও ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা দশটায় Holy Family হাসপাতালে গিয়ে আমেরিকান সিষ্টার Sarah-র সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি পাতলা, লম্বা, শাড়ি পরেন। সিষ্টার টেরেসা তাঁকে সব বলেছেন।" আমরা খুশি হয়ে অনেক কথাবার্তা বলছি, ওর পুরানো খাসিয়া আয়া রেজিয়া জেলী, মাখন, টেডি বিস্কিট চা নিয়ে এলো। সেই সময় কয়েক মাস ধরে যে আমরা দিনে কতবার কত গুজবের গল্প বলেছি আর এই খাওয়া খেয়েছি বলে শেষ করা যাবে না। সুরাইয়া বললো, "২৭ তারিখে আপনি হাসপাতালে সব চেকআপ করিয়ে ২৮ তারিখে শুক্রবার বেলা বারটায় দোলাকে নিয়ে আমার বাসায় আসুন। দোলাকে নিয়ে এখানে খাবেন। আমি ৩টায় ওকে দিয়ে আসবো।"

২৭শে মে আমি বেলা ১০টায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে গিয়ে শাড়ি পরা 'সিষ্টার সারা'কে পেয়ে আমার পরিচয় দিলাম। সারার তো সবই জানতো। সারা আমাকে বয়স্ক ডাক্তার নুরুল ইসলামের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো। ইংগিতে বললো, 'নিরাপত্তার' জন্য ভর্তি হবে। তবে ব্লাড প্রেসারও খুব বেশি।

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানলাম আমার ওজন দু'মাসে ৭ পাউণ্ড কমে গেছে। প্রেসার খুব বেশি। আমার একা চলা উচিত নয়। সারা জিজ্ঞাসা করলো, আমি প্রতিদিন কতটাকা দিতে পারবো। আমি জানালাম, আমার মাসের বেতনটা মাসে দিতে পারবো। তবে আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চাই, যাতে লোকে আমাকে না চেনে। সিষ্টার বললো, "তোমার কোন ভয় নেই। যত দিন আমাদের একটা কেবিনও খালি থাকবে ততদিন তোমাকে আমরা সিঙ্গল কেবিনেই রাখবো। টাকার কথা তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তোমার নাম কি হবে?"

"আমি তো বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সই করি B.G. আমার নাম হবে, 'বারবারা গমেজ' (B.G.)।" আমি জানালাম, "আমার মেয়েকে অরফানেজে দিয়ে ৩০শে মে আমি তোমার হাসপাতালে আসবো বেলা ১০টায়?" সিষ্টার এ্যাম্বুলেন্সে আমাকে আহমেদের বাসার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

দুপুরে খাওয়ার পর আহমেদ খাবার টেবিলে এক গোছা লিচু, এক প্যাকেট আম ও একটা পাকা কাঁঠাল রেখে বললো, "দোলা তো কোন ফল খেতে পারলো না। আজ সারা বিকেলে এ ফলগুলো খেয়ে শেষ করবে।" ভালো কথাই বলেছে আহমেদ। হোসনে আরা বললো, "দোলা, তুমি যা ভালোবাসো, তাই বেশি করে খাও।" রাতে বিছানায় শুয়ে টের পেলাম দোলার ঘুম আসছে না। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন মন খারাপ করছিস? তোর মঙ্গলের জন্যই তো এসব করছি।" দোলা আমার হাত ছেড়ে ওপাশ ফিরে শুলো। ওর ইচ্ছে নেই 'হোমে' যেতে। উপায় কি? নিরাপত্তার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়। পরের দিন ঠিক বেলা বারটায় সুরাইয়ার বাসায়। সঙ্গে ছোট্ট একটা স্যুটকেসে ওর কয়েকটা জামা, ব্লাউজ, দু'টা পেটিকোট নিয়ে।

বেলা একটায় আমরা খেতে বসবো এলো মিসেস নাজমুন নেসা, আমার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। সুরাইয়ার ড্রাইভার স্কুলের টাইপ মেশিন দু'টো ও সেলাইয়ের কল দুটো পৌঁছে দিয়েছে স্কুলে। তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন সুরাইয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমরা একটু বিব্রত বোধ করলাম। তবুও হাসি গল্পের মধ্যে খাওয়া শেষ হলো। আয়া তো ভোজের রান্না করেছে, আর দোলা যেসব খেতে পছন্দ করে তা সবই আছে। খাবার টেবিলে বসে এবং খাবার পরেও গল্প গুজব চলছিল। কাঁটায় কাঁটায় ৩টায় সুরাইয়া দোলাকে নিয়ে সাদা গাড়িতে চলে গেল। সঙ্গে ছোট্ট স্যুটকেসটা দেখেই নাজমুননেসা ভেবে নিলো দোলাকে কোথাও পার করা হচ্ছে। আমরা দু'জনে বসে গেণ্ডারিয়ার খবর পেলাম। আমাকে নাকি মিলিটারী, না যেন বিহারী একজন খুঁজছিল। নাঈমার স্বামীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমাসেই বার তারিখে না বাইশ তারিখে নাঈমার একটি মেয়ে হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সুরাইয়া ফিরে এলে আমরা চা খেলাম। আমাকে ড্রাইভার পৌঁছে দিলো। নাজমুন নেসা থেকে গেলেন, পরে যাবেন।

মনে হয় আহমেদ গাড়িটা গ্যারেজে দিয়েছিল। তাই শনিবার রেজিষ্ট্রার অফিসে গিয়ে গোপালকে বলে এলাম যেন কাল সকাল দশটার আগে আমার গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে আহমেদের বাসায় যায়। ইংরেজী ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখাও করে এলাম।

সন্ধ্যায় বড় কীটব্যাগে আমার জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলাম। টুকিটাকি সব ঝুড়িব্যাগে নিলাম। রাতে শুয়ে ভাবছি ২৫শে মার্চের পরে এই প্রথম দোলা আর আমি আলাদা হলাম। দোলা এখন শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে কে জানে! ওকে তো ওর ৮/৯ বছরের সময়

১৯৬৫/৬৬ সালে বিলেতে মিঃ টার্নহামের বাড়িতে রেখেছিলাম ইংলিশ পরিবার ও পরিবেশ পরিচিতির জন্যে। সেই দু'সপ্তাহের অভিজ্ঞতা তার জীবনে গেঁথে আছে।

৩০শে মে সকালে আমার ফেয়ারওয়েল ব্রেকফাষ্ট হলো। গোপাল পৌনে দশটায় আমার 'Dove Grey' মরিস মাইনরটা নিয়ে এলো। আমার গাড়িতে এই শেষ চড়া। গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আহমেদ পরিবার দু'জনেই বললো, "দিদি আপনার জন্য আমার দরজা খোলা থাকবে।" হাসপাতালে গিয়ে সিষ্টার সারা কে কাউন্টারে পেলাম। আমার রিপোর্ট দেখিয়ে নাম লেখালেন Barbara Gomez. তারপর দোতলায় ২০৫/২০৬ নম্বর কেবিনে নিয়ে গেলেন। সিঙ্গল রুম দক্ষিণ খোলা সবুজ মাঠে দুটা বড় বড় শিরীষ গাছ-ঝোপঝাড় সবুজ পাতায় ভরা – নীল আকাশের পটভূমিতে অপূর্ব লাগছিল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নার্সরা এলো, প্রেসার মাপা হলো তাপ মাপা হলো। প্রেসার খুব বেশি। ওরা আমাকে কিছুই জানালো না। এবার মনে হলো সত্যিই আমি অসুস্থ। হাসপাতালের রোগী।

প্রফেসর নূরুল ইসলামের প্রেসক্রিপশন মতো ছোট ছোট অল্প বয়সী নার্সরা এলো ট্রলিতে ওষুধের ট্রে নিয়ে। একজন জিজ্ঞেস করলো, "দুপুরে কি খাবেন, আর রাতে কি খাবেন?" আমি কিছু চিন্তা না করেই বলেছিলাম, "দুপুরে দেশী খাওয়া? রাতে ইংলিশ।' ওরা চলে গেলে সিষ্টার সারা এলেন, পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভিজিটরদের নাম ঠিকানা দাও। তুমি তো এখানে আত্মগোপন করতে এসেছো।" তখন প্রথমেই মনে এলো ডাক্তার ওয়াহিদের কথা, তারপর সুরাইয়া হাকিম ও হাসনা হাজারী (জেলী), ক্যাপটেন আহমেদ ও তার স্ত্রী হোসনে আরা। আরেক জন হলেন সিষ্টার টেরেসা (হলিক্রসের প্রিন্সিপাল বা প্রঃ শিঃ)। সবশেষে বললাম গোপালের নাম, "ওই সব খবর নেবে ও দেবে।' সর্বমোট আটজন হলো। তাদের ঠিকানাও দিতে হলো। সারা খুশি হয়ে চলে গেলেন। তারপরে এলেন আরো দু'জন, সিষ্টার মেরী জোনস, ইনিই ডিরেকটর, পাতলা ছোট খাটো মানুষটি, আর সিষ্টার গণজাগা, বিরাট চেহারা, হাসি খুশিতে ভরা চোখ-মুখ। তাঁরা যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

হাসপাতালে এসে যেন আমার মাথাটা বেশি ভারী ভারী লাগছে। বড় ডাক্তার দু'বেলা আসছেন, হাসি গল্পও করছেন কিন্তু প্রেসারের কথা কেউ বলছেন না, এমনকি ছুকরী নার্সরাও না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'ও কিছু না।' আশ্চর্য মেয়ে কটা। এ পর্যন্ত যাদের দেখেছি সব নার্সের গলায় ঝুলানো সোনার কিংবা রূপের হারে একটি করে ক্রস (+) ! এরা সবাই কি খৃষ্টান? হিন্দু-মুসলমান কেউ নেই? সন্ধ্যার পরে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সিষ্টার! তোমরা কি সবাই খৃষ্টান?" মেয়েটি একটু হেসে বললো, "সবাই না, বেশির ভাগ এখানে এখন খৃষ্টান।" এ মেয়েটি মুসলমান, আমাকে খালা ডাকে। পরে দেখেছি খালা, নানী, দাদী, সবাই ডাকে। বোঝার উপায় নেই কে খৃষ্টান, কে খৃষ্টান নয়। মেয়েটি চুপে চুপে বললো, "খালা, রাতেরটা শুনে রাখবেন—স্বাধীন বাংলার খবর, ডিউটি সেরে আপনার

কাছে শুনে যাবো।" আমার ট্র্যানজিস্টার আছে দেখে ওরা সবাই খুশি। আমি বললাম, "কেমন করে ধরে জানিনে। ঢাকা মেডিক্যালে ছাত্ররা ধরতো। আমি আর চালাইনি কখনও।" ও শিখিয়ে দিলো। কেউ এসে ঠিক সময়ে ধরে দিয়ে চলে যায়। যাক আমার একটা কাজ হলো।

৩রা জুন হবে। সিস্টার সারা এলো। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন আমার কাছে ৫০০ টাকা বা ১০০ টাকার নোট আছে কিনা। হাসপাতালে জমা দিলে ওরা বদলে দেবে। ঐ নোট বাতিল হতে পারে। আমার বড়ই হাসি পেলো। বললাম, "২৫ মার্চ রাতে আমার ঘরে মাত্র ৫ টাকার পঞ্চাশখানা কড়কড়ে নোট ছিল। এখনও তাই আছে। আমার আর খরচ কিছু নেই। অন্যের খরচে চলছি।" সারা অপ্রস্তুত হয়ে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বেশি চিন্তা করো না, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।" শাড়ি পরা সারা বাঙালী মেয়েদের মত সহজভাবে চলে গেলেন। ফিরে এসে বলে গেলেন, "তোমার দরজা ভেজানোই থাকবে, তুমি যেন দরজার কাছে এসো না। ভালো না লাগলে দক্ষিণের বারান্দার একটু যেয়ো।" যাবো কি? আমার দাঁড়াবার শক্তিও নেই। হাঁটু যেন ভেঙে আসছে। ভাবতে অবাক লাগছে এতদিন বাইরে চলাফেরা করেছি কেমন করে? ভেতরে বাথরুম, তাও মাথা ধোয়া, চুল মোছা করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। "যা রটে তা বটে।" ৮ তারিখে কাগজে ও টিভিতে ৫০০ ও ১০০ টাকার নোট বাতিল হবার খবর হলো। তারপরই সিস্টার টেরেসা এলেন। শুধু আমাকে দেখতে নয় আমার মেয়ের খবর দিতেও। টাকার কথাও জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আগে নার্সদের রুমে ঢুকে আমার রক্ত চাপের অবস্থা দেখেই আমার কাছে এলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমার মেয়ে মেঘনা, এখন Monica Rossario, ভাল আছে। তার জন্য কোন চিন্তা নেই। সে অরফেনেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে চলছে। তাকে শুধু প্যানট্রি পরিষ্কারের কাজ দেয়া হয়েছে। শুধু প্রথম দিন খাবার পরে বমি করেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী খেয়েছিল সেদিন?" তিনি বললেন, "শুধু লালশাক।" আমি সিষ্টারকে আশ্বাস দিলাম, "কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ও কোন দিনই লালশাক খেতো না। এ জন্য ওর বাবা ওর সঙ্গে কত রাগ করতো।" সিষ্টার ওকে দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছেন। আর এক প্যাকেট বিস্কিটও দিয়েছেন। ওর নাকি আর কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, "মনিকার দেশ বগুড়ায়। হোমে বগুড়ার কোন ছেলেমেয়ে নেই। কেউ চিনবে না তাকে। মনিকা সবাইকে বলেছে, "বাবা মারা গেছেন, মা হাসপাতালে আছে। তাই আমি এখানে এসেছি।" আমি কিন্তু তাদের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েই খালাস। আমার আর দায়িত্ব নেই। দুশ্চিন্তাও করিনে। তবুও সিষ্টার আমার চেহারা দেখে আঁচ করতে পারছেন, আমি যেন বেশি চিন্তা করছি। সিষ্টার জিজ্ঞেস করলেন "তুমি এত কি চিন্তা করছো? মেঘনা তো ভালই আছে। তুমি যদি বলো আমার গ্রামে মায়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারি। সেখানে লাইব্রেরী আছে। সে পড়তে ভালবাসে।" আমি তখন বলেই ফেললাম, "সিষ্টার আমার মনে হয় আমি মরে

যাবো। একটা Trust করার কথা ভাবছিলাম। যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারো। " সিষ্টার বললেন, "দ্যাখো, তোমার ভিজিটর লিষ্টে যাদের নাম দেখে এলাম তার মধ্যে ডাক্তার ওয়াহিদ, মিষ্টার হাজারী, মিসেস সুরাইয়া হাকিম আর আমি — আমরা চারজনে কি তোমার একটি মেয়েকে মানুষ করতে পারবো না? তুমি মেয়ের জন্যে কোন চিন্তা করবে না। সৃষ্টিকর্তা যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।" আমি তখন বললাম, "সিষ্টার, তোমার যে বিশ্বাস আছে, আমার সে বিশ্বাস নেই।" তিনি বললেন, "আমিও মায়ের এক মেয়ে। আমি তোমার মনের কথা বুঝি।" তখন আমি ভাবছি যে মায়ের এক মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছে, আমি কেন আমার মেয়েকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারবো না? আমি তার হাত চেপে ধরলাম। সিষ্টার সেদিনের মতো চলে গেলেন। এতকথা বলে মনে হলো যেন আমার প্রেসার কমে যাচ্ছে। আরামে আমার চোখ বুজে এলো।

শহরে কলেরা হচ্ছে, বাইরেও নিশ্চয়ই হচ্ছে। এ খবর শহর নগর, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে, 'নদীতে লাশ ভেসে যাচ্ছে'। এ শুনেই নদীর মাছ খাওয়া লোকে বন্ধ করে দিয়েছে। পুকুরের মাছ দিয়ে কি শহরের চাহিদা মেটে? তবে ভাগ্য ভালো শহর ছেড়ে অনেকে সুদূর গ্রামে চলে গেছে, গ্রাম ছেড়ে লোক দলে দলে ওপারে আশ্রয় নিচ্ছে। তাই হাসপাতালেও রোগী কম, যাদের না এলে চলে না, তারাই শুধু আসছে। দেখাশোনা করতেও লোক লাগে, সে রকম জোয়ান ছেলেও তো অনেকের ঘরে নেই। আমার না হয় কেউ নেই। কে আসবে দেখতে। তবে সুরাইয়ার আয়া এসে ময়লা কাপড় জামা নিয়ে যায়। আবার সেসব ধুইয়ে ইস্তিরি করে দিয়ে যায়, তাচাড়া খাবারও এটা সেটা দিয়ে যায়। আমার তো সেকথা মনেই ছিল না, নইলে সিষ্টাররা হয়তো বিশ্বস্ত আয়া ঠিক করে দিতেন। ১২ তারিখে সন্ধ্যার আগে আহমেদ ও হোসনে আরা এলো। ওরা থাকাকালীন আমার ইংলিশ ডিনার এলো, তিনটা কোর্স। ঢাকনা খুলে সব আইটেম দেখে আর গন্ধ পেয়ে আহমেদ বললো, "আ! দোলা যে সব খাবার পছন্দ করে, ঠিক সে খাবারগুলোই দিয়েছে। দোলা ওখানে কি খাচ্ছে, কে জানে।" আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আমি স্যুপে চুমুক দিলাম। ওদেরকে মুরগীর রোষ্টের ডিসটা এগিয়ে দিলাম। "দ্যাখো, আমি তো খাবার খেয়ে শেষ করতে পারিনে, দোলার হয়ে তোমরা একটু কমিয়ে দাও। তবে স্যুপ আর পুডিং দেবো না।" ওরা আমার সঙ্গে খেলো, গল্প করলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখি। বাগান খুব সুন্দর দেখায়। ঘরেও সারা দিন আলো থাকে। ফুলদানীতে রং বেরংয়ের ফুল। মনটা ভরে ওঠে। ওরা চলে গেলে বালিশ নেড়েচেড়ে শুতে গেলাম। দেখি বালিশের তলায় একটা ৫ টাকার নোটের নতুন প্যাকেট। ও! আমি জোর করেই হোসনে আরাকে এ প্যাকেটটা দিয়ে এসেছিলাম। দোলা ও আমি একমাস, গোপালও দিন পনের ওদের বাড়িতে ছিলাম। ডায়েরীর ভেতরে প্যাকেটটা লুকিয়ে রেখে গেছে।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার নুরুল ইসলাম এলেন ঠিক সময়ে। ঢুকেই বললেন, "এ ঘরে কি ফুলদানীতে ফুল শুকায় না?" বলি, "না, এ স্বর্গের পারিজাত।" প্রেসারের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার সাহেব তো খুবই খুশি। ডাক্তার ইসলাম চলে গেলে নার্স ফিলোমেনা বলে গেলো, "দিদি, চরমপত্রটা মন দিয়ে শুনবেন, পরে আমাদেরকে হুবহু বলবেন।"

দুদিন পরে সিষ্টার টেরেসা এসে প্রেসারের রিপোর্ট দেখে হাসি মুখেই কেবিনে ঢুকলেন। গতকাল আমার কেবিন বদলে গেছে। সিষ্টার তাও জানেন। কেমন করে জানেন? পাবনা থেকে ফাদার রোজারিও আমার আগের রুমে ভর্তি হয়েছেন। পাবনার চার্চে আশ্রয় নিয়ে ছিল জনা পঞ্চাশেক হিন্দু — ফাদারের বাধা সত্ত্বেও গুলী করে মেরেছে তাদের। সে দৃশ্য দেখে তিনি এখন পাগলের মতো। টেরেসা জানিয়ে গেলেন, "তুমি কাল Monica কে দেখতে পাবে। Bottomley Home–এর পঞ্চাশ জন ছেলে–মেয়েদের টি. এ. বি. সি ইনজেকশন দিতে কাল ওখানকার সিষ্টাররা এখানে নিয়ে আসবেন। তোমার মেয়ে Monica Rossarioকেও নিয়ে আসা হবে Father Rossario কে দেখাতে। সেই ফাঁকে ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসা হবে।" সে রাতটায় একটু ঘুম হলো। পরের দিন সকাল থেকে আশায় আশায় থাকলাম, কখন দোলা আসবে। আয়া এসে ধোয়ানো জামা কাপড় ও রাজশাহী থেকে আনা ন্যাংড়া আম ও চাকু দিয়ে গেল। আমি সে আম খেতে পারলাম না। আমার স্বামী ন্যাংড়া আম খুব পছন্দ করতো। আমি কলকাতা গেলে প্রথম মৌসুমের ন্যাংড়া নিয়ে আসতাম। আর সে বন্ধুবান্ধব ডেকে মজা করে খেতো। তাকে তো ১৯৬৩ সালের পর আর ভারতে যেতে দেয়নি পাকিস্তান সরকার। বিলেত যাবার পথে ৭২ ঘন্টার ট্র্যানজিটে ভাইবোন ও মাকে দেখে গিয়েছিল। বেলা দশটার দিকে একজন নতুন সিষ্টার এসে "Monica is here. She will come to see you" বলেই বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দরজাটা ফাঁক হলে দেখলাম দোলা যেন ধাক্কা খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো আর সেই সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বোধহয় সিষ্টার বাইরে পাহারা দিচ্ছেন। দোলা একখানা নীলপাড় শাড়ি গ্রামের মেয়েদের ধাঁচে পরে আমার কাছে এগিয়ে এলো। ওর পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডাল "কিরে! স্যাণ্ডাল কোথায় পেলি?" ও বললো, "মেয়েদেরটা পরেছি। আমি তো এরকম পরিনে। ওখানে খালি পায়েই থাকি।" আমি ওর সারা গায়ে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, দোলা রোগা হয়নি। বললাম, "কিরে! তুই তো রোগা হোসনি?" দোলা বললো, "সবাই ভয়ে, দুঃখে রোগা হয় না। এটাতো Secretion –এর ব্যাপার। তাছাড়া আমরা তো খারাপ খাইনে। একদিন দু'বেলাই লালশাক দিয়ে খেয়েছিলাম বলে বমি হয়েছিল। তুমি জানোই যে আমি লালশাক কোনদিন খেতাম না।" একটু থেমে আবার বললো, "ওখানে অনেক আম গাছ আছে, কাঁঠাল গাছও আছে। আম পড়লে আম খাই। ছেলেরা গাছে ওঠে পাকা কাঁঠাল পাড়ে, আমরা গাছতলায় বসে সবাই মিলে কোয়া খাই। তারপর বীচিগুলো চুলায় পুড়িয়ে খাই। সিষ্টাররা জানতেও পারেন না। তাছাড়া 'টুনটুনী' সিষ্টার দেখলে কিছুই বলেন না।" ও হোমের মেয়েছেলেদের সঙ্গে

মানিয়ে চলতে পারছে জেনে আমার খুবই শান্তি হলো। বলি, "আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, সেখানে?"

এমন সময় সেই সিষ্টারটি ঝট করে ঢুকে প্রায় ছোঁ মেরে দোলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন ডাক্তাররা এলেন। ডাক্তার ইসলাম বেরিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন, "ওটি মেয়ে বুঝি?" আমি মাথা ঝেঁকে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।" ডাক্তাররা চলে গেলে কিছুক্ষণ পরে সেই সিষ্টার মেম সাহেব দোলাকে আবার ঢুকিয়ে দিলেন। দোলা আগের কথার জের টেনে বললো, "না, কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তবে আমাকে একটা মশারি দিয়েছিলো। আমি নেইনি। ওখানে সবাই মশারি ছাড়া শোয়। হ্যাঁ, মা, একটু অসুবিধে হয়েছিল। ওরা তো আমাকে কেউ চিনতে পারেনি। আমি তো বগুড়ার, কিন্তু বগুড়ার কিচ্ছু জানিনে, ভূগোল বইয়ে যা জেনেছি, দৈ খুব ভালো। অনেক প্রশ্ন করে মেয়েরা।

বলে, 'তোমার বাবা না হয় মারা গেছেন। তোমার কি মাও নেই?'

আমি বলেছি, 'মা তো হাসপাতালে।' ওরা বলে,

'তোমার কি মামাবাড়িও নেই?'

তখন মিথ্যে কথা বলেছি, 'মামারা সবাই ভারতে চলে গেছে।'

তোমাকে ফেলেই?'

বলেছি, 'হ্যাঁ'। মা, একটা মিথ্যে বললে, অনেক মিথ্যে বলতে হয়। জানো একদিন রাত তিনটার দিকে মিলিটারী এসেছিল। সিষ্টাররা সব কথাবার্তা বলেছেন। আমরা টের পেয়েছি। 'টুনটুনী' সিষ্টার অনেক কথা বলেছে বাংলায়। উনিতো প্রায় ৩৫ বছর ধরে এদেশে, সব ধরনের বাংলা বলতে পারেন। মিলিটারীরা ওনার বাংলা শুনে তো অবাক। বলে ওরা অন্যদিন দিনের বেলায় আসবে। সিষ্টার বলে দিয়েছেন 'এখানে খৃষ্টিয়ান ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য ধর্মের কেউ নেই।' জানো মা, আমি তো ওদের সঙ্গে গীর্জায় যাই। ওরা সব বাংলায় প্রার্থনা করে। আমি ইংরেজীতে প্রার্থনা তো জানিই তাই কোন অসুবিধে হয় না।"

দেখলাম দোলা অনেক কথা বলছে। আমি খুশি হলাম। জিজ্ঞাস করলাম, "তোকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন সিষ্টার?" দোলা বললো, "ঐ তো, তোমার পাশের রুমে Father Rossario র কাছে — বলেছেন — 'Monica Rossario wants to see you'. তা এটা ওটা অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন।" আমি সুরাইয়ার দেওয়া ন্যাংড়া আম দুটো দোলাকে খেতে সাধলাম। ও খেলো না। নিয়ে যেতে বললাম তাও নিলো না। বলে, "ওখানে ৫০ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে দুটো আম কি হবে? তাছাড়া আমরা তো ভালই খাই।

সিষ্টার আমাকে প্যানট্রিতে এসে চকোলেট ঢুকিয়ে দেন মুখে — বলেন, "আমার মা দেশ থেকে পাঠিয়েছেন।" আমি আরো খুশি হলাম দোলা তার প্রিয় চকোলেট খেতে পাচ্ছে জেনে। সকলের টি. এ. বি. সি দেয়া হয়ে গেলে সিষ্টার এসে আমাকে বললেন, "Monica is no problem to us. She can stay with us as long as she wants. আমি সিষ্টারকে ধন্যবাদ জানালাম।

পরের দিন সকাল বেলা ৯টায় দিকে আর্টিষ্ট বন্ধু বজলে মণ্ডলা সাহেব এলেন। ওনার নাম তো ভিজিটর লিষ্টে নেই। তাই কাউন্টারে অনেক জেরা করে আমাকে একটা স্লিপ পাঠালো ছেলেটি। আমি অনুমতি দিলে উনি এলেন। আমার দু'মাসের মাইনা দিয়ে গেলেন। "একা কেন এলেন?" তিনি বললেন, "ইচ্ছে করেই। নাজমা আপা পরে আসবেন।" অল্প সময়ে গেণ্ডারিয়ার খবর কিছু বলে তিনি চলে গেলেন।

ভরদুপুরে নাজমুন নেসা এলেন একটা নতুন পেটিকোট, একটা হরলিক্সের কৌটা, আর চাউলের রুটি – হালুয়া নিয়ে। আমি বললাম, "এখন তো শব – এ – বরাত না, রুটি হালুয়া কেন এনেছেন?" বললেন, "দাদাবাবু আমার হাতে এগুলো খেতে ভালোবাসতেন।" আমার হাসি এলো। বললাম, "আবেদাকে আনলেন না কেন? ওকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।" আবেদা আমার ছাত্রী এবং বর্তমানে মনিজায় শিক্ষকতা করে। নাজমুন নেসা বললেন, "ওর পেটে কথা থাকে না। কাকে কি বলে দেয় ঠিক নেই।" আমি মনে মনে হাসলাম। যে তার স্বামীর আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কাহিনী কাউকে বলে নি, সে আমার কথা বলে দেবে? সে তো আমাকে কম ভালো বাসে না, যাক। বিকেলে শহীদকে নিয়ে আবেদা এসে হাজির। আবার কাউন্টারে জেরা, তারপর স্লিপ পাঠানো। আমি অনুমতি দিলাম। হামিদ ভাইয়ের ছোট ভাই শহীদ, বোধহয় জগন্নাথ কলেজে ভূগোলের টিচার, তাকে নিয়ে আবেদা এলো। বেশি লোক এলে এঁরাও রাগ করেন। আমার ভয়, ক্রমেই লোকে জেনে ফেলছে আমার আস্তানা। ওদের সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমাদের চেনা–জানারা কে কোথায় আছে, অনেক জানলাম। টিফিনের পরে আর স্কুল চলে না। টিচাররাও পুরা বেতন পান না। শতকরা বিশ ভাগ ছাত্রী স্কুলে আসে কিনা সন্দেহ।, তাই ছাত্রী বেতন ওঠে না। আবেদারা চলে গেলে মনে হলো, 'আজ বড় বেশি কথা হলো।'

পরের দিন বিকেলে বোধ হয় ১৭/১৮ তারিখে হবে, গোপাল এসে খবর দিলো – অধ্যাপক হাই সাহেব ও আমাদের গাড়ি – দুটোই চুরির চেষ্টা হয়েছিল। ওনাদের গাড়ির যন্ত্রপাতি ও চাকা চুরি হয়েছে, আমাদের গ্যারেজ থেকে শুধু যগটা নিয়েছে! আমি টাকা দিয়ে একটা পাহারাদার রেখেছিলাম – অবশ্য সব কিছু চুরি হবার পর– ৫টা ফ্যান, টেলিফোন, ব্যবহারিক সব কিছু। মাত্র দুটা আলমারীতে কিছু বই অবশিষ্ট ছিল। সে পাহারাদার গোপালকে জানালো, চায়ের দোকানের ছেলেরাও বললো। এ খবর পেয়ে আমার রাতে ঘুম হলো না। পরের দিন যখন ডাক্তার ইসলাম প্রেসার মাপলেন, দেখলেন, প্রেসার অনেক বেড়েছে। তিনি রসিকতা করে বললেন, "আপনি কি ইচ্ছা মতো প্রেসার বাড়ান কমান নাকি? এক রাত্রে এত প্রেসার বাড়লো কেমন করে?" নার্সরা বললো, "ওষুধ তো ঠিক মতোই দিচ্ছি।" আমার সমস্যার কথা জানতে চাইলে, গাড়ির কাহিনী বললাম। তিনি রাউণ্ড শেষ করে আবার আসলেন। চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি সমস্যা আপনার , বলুন এবার।" বললাম, "আমার গাড়িটা তো চুরি হয়ে যাচ্ছিল কাল রাতে। এখন ভাবছি কি

করবো। বিক্রি করেই দেবো কিনা, চিন্তা করছি।" তিনি বললেন, "সত্যিই বিক্রি করে দেবেন? আচ্ছা দেখবো কেউ কেনে কিনা। সন্ধ্যায় আবার আসবো, তখন আলাপ হবে।" সন্ধ্যায় তিনি এলেন দু'জন ছোকরা ডাক্তার নিয়ে। তাঁরা কিনতে আগ্রহী। কিন্তু দাম দিতে কৃপণতা করছেন। মাত্র তিন-চার হাজার টাকা দাম বলেন। নতুন মরিস মাইনর ১৯৬৭ মডেল। ঢাকার বাইরে ২ দিন গিয়েছে মাত্র। আমার মন সায় দিলো না। অনেক যাচাই করে সাত হাজার দাম উঠেছিল। এদিকে গাড়ির চিন্তায় আমার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল।

এদিকে বোধ হয় ২০শে জুন দুপুরে বেগম ফিরোজা বারী একাই এলেন আমাকে দেখতে। আমি ভাবছি এত লোকে কি করেই বা জানছেন আমি এ হাসপাতালে আছি। ভাবলাম হাজারীকে ফোন করে জেনেছেন, যেমন জেনেছিলেন ৩০শে মার্চ। কাউন্টার থেকে আবারও স্লিপ পাঠালো, "বেগম ফিরোজা বারীকে পাঠাবো কি?" আমি অনুমতি দিলাম। তিনি দোলার কথা আমার স্বাস্থ্যের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করলেন। তারপরে সরাসরি জানালেন, তিনি অসুস্থ বারী সাহেবকে নিয়ে লণ্ডনে যাচ্ছেন অপারেশন করাতে। তার আগে আমাদের ভারতে পাঠাতে চান। বললেন, "দেখুন আমরা স্কুটার ঠিক করেছি। আপনি বোরখা পরে বর্ডার পার হয়ে যাবেন। নেপালী ড্রাইভার । কোন ভয় নেই।" আমি বললাম, "বাপরে। তা পারবো না। মেয়েকে যদি ছিনিয়ে নেয়, তাহলে আমার কী হবে। মা – মেয়ে অচেনা গ্রামে পথ চিনে যেতেও পারবা না।" তিনি আমাকে রাজী করাতে পারলেন না।

এমনি করে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে আমি যে হলি ফ্যামিলিতে আছি। একবার তো কেবিন বদলেছি, আর ক'বার বদলাবো? তাছাড়া এক বেডের কেবিন খালি হলে তো? সারা দিন শুয়ে থাকলে, আমার রুমের দরজা খোলা থাকলেও কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু কত দিনই বা সারা দিনরাত শুয়ে থাকা যায়। কখনও বিনা কারণেই কেউ কেউ দরজা খুলে চুপি দেয়। একদিন এমনি ঢুকলেন মিসেস সামাদ, আরমেনীটোলার আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং আমাদের ৩৪ নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের শহীদ ডঃ মনিরুজ্জামানের সহোদরা। তিনি ঢুকেই কেঁদে ফেললেন। তাঁর জিজ্ঞাসা, "দিদি, আপনি বলুনতো, আমার ছেলেটাকে নাকি জ্যান্ত কবর দিয়েছে?" আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ডঃ মনিরুজ্জামানের বাসায় চারজনেই মধ্যে আপনার ছেলেই সবার পরে মারা গেছে। সে 'পানি' 'পানি' করছিল। আমাদের স্বর্ণ আর আমার মেয়ে তাকে পানি খাইয়েছে, তারপরই সে মারা যায়। পরের দিন ২৬ শে মার্চ বেলা নটার দিকে তাদের লাশ জগন্নাথ হলেরগণকবরে নিয়ে গেছে।"

মিসেস সামাদও বোরখা পরা – বলছেন, "কেউ যাতে চিনতে না পারে, তাই বোরখা পরছি। আমার তিনটা বড় বড় ছেলে, তারা ঘরে নেই। কী যে আমার অবস্থা। আমার অসুস্থ স্বামীকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়েছিল। আমাকেও তাই ওখানে যেতে হয়েছে স্বামীর জন্যে। কেমন করে যে দিন যায়, রাত হয় — সে আমিই জানি! আমি উলফাতের মা, এই আমার দোষ। এ দুর্গতির শেষ কবে হবে, কে জানে।"

এর মধ্যে আমার এক ছাত্রী ডলীর স্বামী জেড রহমান, নারায়ণগঞ্জ ডকের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, রোগী হয়ে আমার দুটো কেবিনের পরে আশ্রয় নিয়েছে। ডলীর আব্বা মুক্তাদির সাহেব রিটায়ার্ড সিটি ডি. এ. পি। তিনি আমার স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। ওরা তিন বোনই আমার ছাত্রী। ডলীর স্বামীর গ্যাস্ট্রিক আলসার। ২৫শে মার্চের পরে যা দেখেছে, তাতে তার ঘুম বন্ধ, সারাক্ষণই প্রায় সিগারেট ধ্বংস করে। তার রক্তবমি হলে এ হাসপাতলে এসেছে। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে। ডলীর বড় বোনের স্বামী জি. পি. ও-তে কাজ করেন। কোয়ার্টার বেইলী রোডে। ডলী বোনের বাসায় খেতে গেলে, একা আমি ওর স্বামীর কাছে বসি, গল্প করি। সময় কেটে যায়। এখন আর আমি অজ্ঞাত বাসে আছি বলে মনে হচ্ছে না। আরেক পাশের একটি কেবিনের দক্ষিণের ব্যালকনি থেকে গলা বাড়িয়ে কথা বলে একটি বৌ। বাসায় ঠিকানা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া বলতেই বৌটি কেবিনে ঢুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিজিটর ছোকরা গলা বাড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে আর আমার গোপন আবাস জানাজানি হয়ে যায়।

এর মধ্যে একদনি হামিদার (হোম ইকনমিকস কলেজের প্রিন্সিপাল) ছোট বোন বাদল এসে হাজির। বাদল কেমন করে খোঁজ পেলো? আমিই তো এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ওদের খোঁজ পেয়ে ওদের ভাই সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল আহাদের সরকারী কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করেছিলাম।

বাদলের কাছে শহরের অনেক খবর ও গুজব শুনলাম। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ের একটি খবর যা বাদল বললো, "জানেন বাসন্তীদি? যাদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নেয়, তাদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে নাকি তাদের একটা করে ফরম দেয়। তারপর সেই লিখিত ফরম পড়ে কোনটায় লাল টিক, কোনটায় কালো টিক (√), কোনটায় লেখে Clear. "আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ সবের মানে কি?" বাদল বললো, "অত তো জানিনে, সব আমার শোনা কথা। ফরম পড়েই ওরা জেরা করে, তারপর এই দুই রংয়ের টিক দেয়। 'Clear '- দের ছেড়ে দেয়।" পরে অবশ্য জেনেছিলাম, কালো কালো টিক আলারা ভাগ্যবান, তাদের জেলে দেয়। লাল টিক আলারা হতভাগ্য – তাদের নির্যাতন, তারপর কোতল। যাক বাদল আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। এরপর কেবিনের দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাসপাতালে পুলিশ ঢুকতে দেখলেও আমি ভীত হয়ে রুমে ঢুকে অপেক্ষা করতাম, বারান্দা দিয়ে পুলিশ অফিসাররা চলে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম।

আমার জন্যে হাসপাতালের নার্সদেরও অনেক চিন্তা ভাবনা। কেউ বলে, "আপনার মেয়ে তো টেন এ পড়ে। তাকে হোম থেকে এনে এখানে Aid Nursing–এ ভর্তি করে দিন। মার্গারেট বলছে, "আপনি তো দিদি ভালো হয়ে যাচ্ছেন, ভালো হয়ে কোথায় যাবেন?" তাই তো! কোথায় যাবো? ভাবতেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় মনটা দুলে ওঠে। এক দিন মরিয়ম বললো, "খালা, আমাদের নার্সের কোয়ার্টারে নীচেরতলায় কয়েকটা রুম খালি।

অনেকে তো দেশে চলে গেছে। আপনি সিস্টারদের বলে ওখানে থাকতে পারবেন।” তখন আমি সিস্টার সারাকে বললাম, “সিস্টার, ভালো হলে তো রিলিজ হয়ে যাবো। আমাকে হাসপাতালে একটা কাজ দাও না। আমি ভালো ইস্তিরি করতে পারি। তোমাদের তো প্রতিদিন কত চাদর, বালিশের ওয়ার, এ্যপ্রন ইস্তিরি হয়।” সারা বললেন, “আমি সিস্টার জোনস্‌কে বলবো।” পরদিন সারা এসে জানালেন, “ইস্তিরি এখানে খুব Heavy কাজ। তুমি পারবে না। তবে আজ থেকেই তুমি আমাকে বাংলা পড়াতে শুরু কর। সপ্তাহে তিন দিন হলেই হবে। আমি অফিসের কাজ সেরে তোমার কাছে আসবো। বাংলা পড়া ও লেখা কিছু হলেই হবে। আর হিসাবটা বুঝলেই চলবে।”

সারার বাংলা শিক্ষার আসর আরম্ভ হলো। ওর তিন দিন বদলে দুদিন হলো, এক ঘন্টা আধ ঘন্টা দাঁড়ালো। বুঝলাম আমাকে ব্যস্ত রাখা, ভবিষ্যতের আশ্বাস দেওয়ার জন্যেই সারার পড়ার ভান। একদিন নার্সিং স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস বি. শ. ডিনারের সময় আমার ঘরে এলেন। ছোটখাটো মহিলাটির কোঁকড়া চুল – বয়স বোঝা যায় না। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার তো অনেক খরচ হচ্ছে – রুম ভাড়া, খাওয়া – এটাতো পেইং বেড। ইত্যাদি। আমি বললাম, “আমি কিছু জানিনে। সিস্টাররা জানেন।”

কয়েক দিন ধরে রাতের বেলা বোমা ফাটে। ঘুম না, তন্দ্রা ভেঙে যায়। মনে হয় বোমাগুলো যেন এয়ারপোর্টের দিকে ফাটে, ওগুলো আকাশ থেকে পড়ে না। রাতে আর চোখের পাতা বন্ধ হয় না। মনে হয় বোমাগুলো তেজগাঁ অরফানেজের কাছেই পড়ছে। একদিন সন্ধ্যার দিকে ডলীর স্বামীর ঘরে বসে এসব গল্প করছি, এমন সময় একটা বোমার শব্দ হলো — আমরা হেসে উঠলাম। বোমার গল্প করতেই বোমা ফাটলো? তার সঙ্গে সঙ্গেই আরো দুটো খুব জোরে। আমরা কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম কাছেই কোথাও হবে, দক্ষিণ–পশ্চিমে। শহরে বড় বিল্ডিং থাকলে দিকও ঠিক ধরা যায় না। আধ ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালের ভেতরে এ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে লাগলো। আহতদের আগমনে ইমারজেন্সি ভরে গেলো। অনেককে First Aid দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। অনেককে বেডে আনা হলো। কয়েকজনকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। সিস্টাররা নিজেরাই সবাই রক্ত দিলেন। ওঁদের রক্ত পরীক্ষা করাই আছে। আমরা যারা ভালো, তারাই সাহায্য করতে গেলাম। রাত এগারটার দিকে জানলাম হোটেল ইন্টারকনে সাততলায় বোমা ফেটে ফ্লোর ভেঙে পড়তে পড়তে একদম নীচের তলায় ভাঙা ইট–পাটকেল, বড় বড় কংক্রীটের চাঁই সামনের দোকান পর্যন্ত নেমেচে। 'জয়া' দোকানটিতে সেলস গার্ল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাটির প্রায় কাঁধ পর্যন্ত কংক্রীটের স্তূপ ঢেকে গিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত মিলিটারীরা তাকে বের করেছে। যাকগে মহিলা বেঁচে গেছে। জ্ঞান হয়েছে, মাথা ফাটেনি। জ্ঞান হলে তার অবস্থা আরো খারাপ হলো। যতই ভাবে তার কি হতে পারতো, ততই তার কাঁপুনি ওঠে। আমরা তার কাছে গিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, সান্ত্বনা দিচ্ছি। যাদের বেশি আঘাত

লাগেনি, তারা ক্ষুধায় কাতর। নার্সরা এসে আমাদের ঘর থেকে বিস্কিট, হরলিকস, কলা নিয়ে ওদের খাওয়ালো। পরেরদিন 'জয়া' দোকানের এক মহিলা সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাকে দেখতে এলেন। আমরা কয়েকজন রোগী তার দেখাশুনা করছি দেখে খুশি হলেন। তাদের মধ্যে একজন খোরশেদী আলম (ডলী)। মানসিক স্থিতিশীলতা আসতে মহিলার কয়েক দিন লাগলো।

নার্সরা শুনেছে এসব বিচ্ছুদের কাম। রেডিওতে বলে দুষ্কৃতকারীদের কারবার। একই কথা, বুঝে নিলেই হলো। সিস্টার সারা খুব ব্যস্ত, তাই ১০/১৫ মিনিট পড়ার ভান করে চলে যান। জুন শেষ হয়ে এলো। আমার প্রেসার কমে এলো। আর শহরের অবস্থা মন্দের দিকে চললো। বিচ্ছুদের কাজের তৎপরতা বাড়তে লাগলো। আমার মনটা রাতের বেলা দোলার জন্যে ছটফট করতো। নার্সদের কাছে এসব কথা বলতাম। ওরা বললো, "ওকে আপনার কাছে কাছে রাখুন।" হায়রে! অমারই স্থিতি নেই। এ সময়ে মনে হলো ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে ফিরেছেন। তাঁকে ফোন করে তাঁর খবর নিলাম। আমার ও দোলার সব খবর তাঁকে দিলাম। তখন তিনি বুঝে নিলেন, আমি দোলাকে ওনার আশ্রয়ে রাখতে চাই। বললেন, "আমার তো পাঁচটি মেয়ে আছেই, তোমার একটি হলে ছয়টি হবে। অসুবিধে কিছু নেই, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।" কিন্তু পাঠাবো কেমন করে? সেও তো আরেক অসুবিধে। সুরাইয়ার শরনাপন্ন হতে হবে।

ফোনে সুরাইয়াকে সব জানালাম। ও তখন সিস্টার টেরেসাকে জানালো। সিস্টার হাসপাতালে এসে আমাকে বললেন, "তোমার মেয়ে তো ওখানে ভালই আছে। কোন অসুবিধা নেই আমাদর। কেন জায়গা বদল করতে চাও।" আমি তো তাঁকে বোঝাতে পারিনে কেন সরাতে চাই। বললাম, "দ্যাখো সিস্টার, অনেক দিন ধরে তো ওকে দেখিনে, নতুন জায়গায় গেলে আমি সামনের সপ্তাহে ছাড়া পেলে মাঝে মধ্যে মেঘনাকে দেখতে পারবো।" এদিকে সারা এসো জানালো, "তোমাকে কয়েক দিন পরে রিলিজ করা হবে। তখন তোমাকে নার্সদের কোয়ার্টারে একটি রুম দেবো। ওখানে থাকবে আর নার্সিং স্কুলের লাইব্রেরীটা গুছাবে। বড়ই অগুছালো হয়ে আছে। রেকর্ড মিলিয়ে বই সাজাবে। তোমাকে একজন হেলপার দেবো। আরো একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে-তারা ম্যাট্রিক পাস হলেও — ইংরেজী শুদ্ধভাবে পড়তে ও লিখতে বলতে পারে না। তুমি সপ্তাহে তাদের তিনটা ক্লাস নেবে। মিসেস শ তোমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবেন।" একটু পরেই বললেন, "ভাল কথা। তুমি কিন্তু রিলিজ হয়ে বাইরে যেতে পারবে না একা একা, সিস্টার জোনস বলেছেন। আমাদের একজন কর্মচারী ছেলেকে গেটের বাইরে থেকে লিফট করে নিয়ে গেল। সিস্টার জোনস সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী নিয়ে ক্যানটনমেন্ট পর্যন্ত ফলো করলেন কিন্তু তার আর হদিস পাওয়া গেল না।" এটাই তাঁদের ভয়ের কারণ।

জুলাই মাসের সাত তারিখে সুরাইয়া হোম থেকে Monica-র নাম কাটিয়ে, তাকে নীলিমা আপার বাসার দরজায় নামিয়ে দিয়ে এসে আমাকে ফোনে জানালো। আমিও

হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে নার্সদের কোয়ার্টারে একটি রুম পেলাম। তিনটি খাট, তিনটি পড়ার টেবিল ছিল। একটি খাট সরিয়ে ফেলে দুটি রাখা হয়েছে – ছিমছাম ঘর। আমি নিজের জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজালাম – যেন হেষ্টেলে এলাম। আমার রুমের বিপরীতেই লন পেরিয়ে একদিকে লাইব্রেরী, আরেক দিকে ক্লাস রুম। আরেকটি ছোট – সেটি লনের পর প্রিন্সিপালের রুম – টিচারদের রুম। নিরিবিলি পরিবেশ, দক্ষিণে বাগান, হাসপাতালের গেট থেকে দেয়ালের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে এসেছে – দক্ষিণের বারান্দা পর্যন্ত। প্রথম দিন লাইব্রেরী পরিষ্কার করানো। পরের দিন থেকে একবেলা লাইব্রেরীর কাজ, দ্বিতীয় বেলায় সপ্তাহে তিন দিন তিনটা ক্লাস নেওয়া। বেশ ভালো লাগছিল স্কুলের পরিবেশে ফিরে। সকালে নার্সরা ব্রেকফাষ্টের সময় আমাকে ডাক্তারদের খাবার ঘরে নিয়ে যেতো। যেখানে আমি রাতের শোনা 'চরমপত্র' বলতাম। দুপুর ও রাতের খাওয়ার সময়ও তারা ডেকে নিতো। ওখানে থেকে মনে হতো সব নর্মাল হয়ে গেছে। এর মধ্যেই কেউ চাঁদা চাইলো – চাঁদা আমি কাউকে দিতাম না । কি জানি আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়ি। সারার সঙ্গে দেখা করে জানলাম কাউন্টারে আমার বিল আছে। বিল নিয়ে দেখলাম ৫৪৫০ টাকা। সারাকে দিলাম বিলটা। পরের দিন সারা আমার কাছে মাত্র ৪০০ টাকা চাইলো।

নার্সিং স্কুলের সঙ্গে জড়িত হয়ে আমি যেন শান্তি পেলাম। তিন বেলা খাবার সময়ে স্কুলের ছাত্রী-নার্সরা আমাকে ডেকে নিয়ে যায় ডাইনিং হলে। নিজের সংসার না থাকলেও ওদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মিলে মিশে আনন্দ পাচ্ছি। তবুও মাঝে মাঝে মনে হতো, প্রায় চার মাস হতে চললো – স্বর্ণ, গোপাল, দোলা ও আমি – এই চার জনে আমরা এক সঙ্গে কথা বলা, খাওয়া পরা করতে পারছিনে। কতদিন এভাবে চলবে কে জানে? স্বর্ণ যে কোন গ্রাম থেকে কোন গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানিনে।

কিন্তু সংসার না থাকলেও বেঁচে থাকলে সমস্যা থাকে। জ্যোতির্ময় চলে গেছে, আমি বেঁচে আছি। তাই সমস্যা আমার কাছে আসছে এবং আমাকে তার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক দিন গোপাল খবর নিয়ে এলো যে, জগন্নাথ হলের আসবাবপত্র যা প্রভোষ্টের ৩৪ এ নং কোয়ার্টারে ছিল, তা ফেরত দিতে হবে, আর হলে চিঠি এসেছে প্রাক্তন প্রভোষ্টের বাসার পাঁচটি ফ্যান ও প্রভোষ্টের বাসার ফোনটি (২৮০২৮৪) ফেরত দিতে। না পারলে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। আমরা লিষ্ট করে ফানির্চার ফেরত দিলাম, বাকী কথা রেজিস্ট্রার ও কেয়ারটেকারকে বুঝিয়ে বললাম, "২৫শে মার্চের মর্মান্তিক ঘটনার পর কোয়ার্টারের দায়িত্ব তো আপনাদের। আপনাদের অফিসের দায়িত্ব এসব মালপত্রের।" তারপর লিখিত একটা আবেদনপত্র দিলাম। আর, নীলিমাদির কথামতো ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে এসব কথা বললাম এবং আবেদন জানালাম, আমার থাকার ব্যবস্থা তিনি যেন করে দেন। তিনি জানালেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে থাকতে হলে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মৃত্যুকালীন বেতনের শতকরা সাড়ে ৭ ভাগ বাড়ি ভাড়া দিতে হবে। আমি জানালাম, "সে ক্ষমতা আমার নেই, একা থাকার সাহসও আমার নেই।"

আমার মনে হলো, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার ১৯৭১ এর মার্চের ৩০ তারিখ পর্যন্ত বেতন পাওনা আছে। গেলাম হিসাবরক্ষকের কাছে। জানলাম এ টাকা পেতে Death certificate লাগবে এবং Succession certificate লাগবে। গেলাম সুরাইয়ার বাসায় – এ সব ঝামেলার কথা বললাম। সেখানে দেখা হলো ওদের আত্মীয়-বন্ধু মশিউর রহমানের সঙ্গে, তিনি গুলশানে থাকেন। সুরাইয়া তাঁকে বলে দিলো আমার স্বামীর লাইফ ইনস্যুরেন্সের টাকাটার ব্যবস্থা করতে। তিনি বললেন, একটা দরখাস্ত দিতে। ফরম পেলে পুরণ করে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যালের সার্টিফিকেট দিতে। তিনি জানেন আমি তা পাইনি। তাই বললেন, "Death certificate না পেলে, তবে রেজিস্ট্রারের থেকে একটা চিঠি দিলেই হবে।" তবুও পরের দিন গেলাম মেডিক্যাল ৭ নম্বর ওয়ার্ডে সার্টিফিকেটের জন্যে। সি এ প্রফেসার আলী আশরাফ ছিলেন না। অন্য ডাক্তার বলে দিলেন, দুতিন দিন পরে যেতে। তখন গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নুরুদ্দিন সাহেবের কাছে। তিনি সার্টিফিকেট দেবেন কেমন করে? তিনি তো জানেনই না আমার স্বামী মারা গেছেন। কোন প্রমাণ নেই। তিনি আগরতলায় গেছেন, না কোথায় গেছেন, কে জানে! তখন আমার এত রাগ হলো যে, আমি বলেই ফেললাম, "আপনার জানা উচিত ছিল। প্রথম দিন 'মাত্র' নয়জন শহীদ হয়েছেন, তাদের খবর অন্যেরা যেমন জানে,রেজিস্ট্রার হয়ে আপনার জানা উচিত ছিল। আমাকে তো একটা সার্টিফিকেট দিতেই হবে, অন্য আরো আটজনের সার্টিফিকেটও দিতে হবে। আমি এটা না নিয়ে যাবো না।"

তিনি বুঝলেন, আমি খুব চটেছি, তখন বললেন– "লিখে দিন কি লিখতে হবে।" আমি লিখে দিলাম, "আমার জানামতে ইংরেজীর রীডার ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ২৫শে মার্চ রাতে গুলিতে আহত হয়ে ৩০শে মার্চ সকাল নটায় ঢাকা মেডিক্যালের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর বেডে মারা যান।" বললাম, "লাশ দিয়েছে কি দেয়নি – তাতো আপনার ব্যাপার না।" কাগজটা নিয়ে উনি টাইপিষ্টকে দিলেন। আমাকে এক কাপ হালকা সোনালী রঙয়ের লেমন কফি দিয়ে বললেন, "ডঃ গুহঠাকুরতা আমার ঘরে এলে এই কফিটা খেতে খুব পছন্দ করতেন।" আমি কফি খেতে খেতে টাইপ হলো। উনি সই দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম। পরের দিন ইস্টার্ণ ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে দরখাস্ত দিলাম আমেরিকান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে আমার মেয়ে ও তার বাবার নামে জয়েন্ট এডুকেশন ইনস্যুরেন্স ছিল, তাদেরও চিঠি দিয়ে দিলাম যে, মেঘনার পিতা মারা যাওয়ার আর প্রিমিয়াম দেবো না।

আমার কিন্তু হলিফ্যামিলী হাসপাতালের বাইরে যাওয়া বারণ। তবুও দায়ে পড়ে আমাকে বেরুতে হচ্ছে। মনে হলো ডঃ গুহঠাকুরতার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ দিতে হবে। পরের দিন একটি দরখাস্ত দিলাম তিনি শহীদ হয়েছেন ৩০শে মার্চ। তার নামে যেন আর নোটিশ না দেন। দরখাস্ত আর ইনকাম স্টেটমেন্ট জমা দিতে গেলাম মতিঝিলের অফিসে। সেখানে যে

ছেলে অফিসারের হাতে কাগজপত্র জমা দিলাম তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক আসকার আলী সাহেবের ছেলে, তাঁর মেয়ে ফরিদা আমার ছাত্রী ছিল। কথায় কথায় পরিচয় হলো। সহজে সবকাজ সমাধা হলো।

এ সময়েই খবর হলো বন্যা আসছে। বন্যার পানি গত বন্যার মত সীমানায় ওঠেনি। তবুও সরকার ক্যাম্প খুলে বসে আছেন। অন্য সময়ে গেণ্ডারিয়ার এলাকার ছেলেরা 'আশ্রয় শিবির' খুলে দেয় – সব স্কুলে স্কুলে। পরে সরকার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমরাও শিবিরে কাজ করি। এবার সেই ছেলেগুলি পাড়ায়ই নেই। যারা পাড়ায় আছে তারা বন্যাপীড়িতদের শিবিরে আসতেই দেয় না। শ্বশুর–শাশুড়ি দেয়না বৌদের, মা–বাপ দেয়না ছুকরী মেয়েদের আগুনের মুখে ছেড়ে দিতে। তার চেয়ে সাপের সঙ্গে মাচানে বাস করাও ভালো। যোয়ান ছেলেরাও ক্যাম্পে যেতে ভয় পায়–রাতের অন্ধকারে তরুণী মেয়ে বৌ, জোয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে যেতে পারে ঐ নেকড়েরা। তবুও কিছু বুড়ো–বুড়ী ক্যাম্পে এসেছে সাহায্য পাবার আশায়। লোহার পুলের ঢালের বস্তি আর রেল লাইনের নীচে ক্ষেতের জমির গরীবদের সবাই স্কুলে আসেনি। অন্য সময়ে এরাই আসে আগে, জোর করে ঢুকে যায়। মেয়েরা সতীত্ব আর ছেলেরা জীবন রক্ষার জন্যে সুন্দর একটি আশ্রয় কন্দ্রেকে এড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কি করে? তবুও নোটিশ দেয়া হচ্ছে পরীক্ষা হবে। ফরম তো জানুয়ারী মাসেই জমা দিয়েছে সবাই। স্বাধীন বাংলার খবরে নিষেধ করছে পরীক্ষা দিতে। অথচ, এরা বলছে পরীক্ষা হবেই হবে। বন্যা এলেও শহরে খাবার পানি, মানে ট্যাপের পানির সমস্যা দেখা দিয়েছে। পাওয়ার স্টেশনগুলোতে নাকি ট্র্যান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। একদিন, দুদিন, তিনদিন ধরেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আলোও থাকে না শহরে। এগুলো সরকারী ব্ল্যাক আউট না। কেউ বলে এ সবই বিচ্ছুদের কারবার, কেউ বলে দুস্কৃতকারীদের ব্যাপার। আমার চিন্তা কি? আমি তো এখন হাসপাতালবাসী। রান্নাবান্নার চিন্তা নেই। গ্যাস লাইন গেলেও হাসপাতালে রান্না চলবে। মণে মণে লাকড়ী এনে পাহাড় বানিয়েছে, বড় বড় চুলা বানিয়েছে—শামিয়ানার নীচে। কোন কাজই থেমে নেই। আমিও দিনের পর দিন নার্সিং স্কুলে পড়াচ্ছি।

এক দিন বেলা একটায় গেলাম ঢাকা মেডিক্যালে আমার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট আনতে। ৭নং ওয়ার্ডের নার্সরা যারা তখন ডিউটিতে ছিল, তারা এগিয়ে এলো। ছোকরা ডাক্তারকে পেলাম না। আমার প্রাক্তন ছাত্রী নার্স ভারতী যে ২৭, ২৮, ২৯শে মার্চ অনেক সাহায্য করেছে, সে এগিয়ে এসে বললো, "বড়দি, মেডিক্যালের ছাত্র ডাক্তাররা দাদাবাবুর লাশটা চেয়েছিল পরীক্ষা করার জন্য। এরকম সুস্থ লাশ তারা তো পায়না। প্রফেসর আলী আশরাফ দেননি কিন্তু।" আমি বললাম, "গোপালের কাছে শুনেছিলাম।" আরেক জন নার্স বললো, "আপনাদের লাল ক্যাণ্ডেল উইক বেড কভারটি আমি একজনকে দিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করেছি উনি দাদা–বাবুর নিকটআত্মীয়, তখনও লাশ ছিল।" সত্যিই তার কাছে যারা আসতো তারা সবাই তার নিকট আত্মীয় ছিল।

আমরা যখন কথা বলছি এ সময়ে একজন ডাক্তার আমার হাতে ডেথ সার্টিফিকেটটি দিলেন। একটু চোখ বুলিয়েই আমার মনে হলো যেন নীল আকাশ থেকে বাজ পড়লো। বুকে হাত দিয়ে আরেকবার পড়লাম সেই টুকরো কাগজটি। এ কি। ডাহা মিথ্যে কথা! জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা 'নিউমোনিয়ার' মারা গেছেন? আমার চোখে তখনও ২ নম্বর বেডে ঝুলানো প্লেটে 'বুলেট ইঞ্জুরী' লেখাটা জ্বলজ্বল করছে। গেলাম সুরাইয়ার কাছে। সুরাইয়া বললো, " এতেই হবে। কেমন করে মারা গেছেন তাতো আপনি জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তুলতে এটা কাজে লাগবে, আর সাকসেশন সার্টিফিকেট পেতেও এটা কাজে লাগবে। কাজ হলেই হলো।"

এর মধ্যে আমি ইংল্যাণ্ডের বাঙালী ও বৃটিশ বান্ধবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বেবীর বুবু রাবিয়ার সঙ্গে মুখে খবর পাঠিয়েছি। বেবী যেন জ্যোতির্ময়ের কিংস কলেজের সুপার ভাইজারদের, বন্ধু হ্যারল্ড ব্লাকহামকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। আমার দেবরকে কলকাতায় জানিয়ে দেয়। আমার কোয়েকার বান্ধবী মার্গারেটকে জুনের প্রথমেই জানিয়েছি বার্মিংহামে। মার্গারেট জুলাই মাসের ১০ তারিখে আমার দ্বিতীয় চিঠির (২১/৬/৭১) উত্তর দিয়েছে। ওরা তো ভাবছে আমি চাকরি নিয়ে বিলেতেই চলে যাবো এবং যাওয়া উচিত। তাই মার্গারেট ওদের কাছে বার্মিংহাম বা লেইষ্টার কিংবা আমার পুরনো চাকরির সূত্র ধরে লণ্ডনে যেখানে আমি যেতে চাই, ওরা সেখানের 'এ' ক্যাটাগরি ভাউচার বা 'বি' ক্যাটাগরি ভাউচারের চেষ্টা করবে বৃটিশ ইমিগ্রেশন ল' অনুসারে। এর আগেই জুনের শেষ দিকে সিষ্টার গনজাগা আমাকে বৃটিশ হাই কমিশন অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা বললো, "আমরা তো অফিস তুলে দিচ্ছি এখান থেকে, তবে সে যদি যেতে চায় পাসপোর্ট নিয়ে এলে আমরা এন্ট্রি পারমিট সীল দিয়ে দেবে। হায়রে, পাসপোর্ট তো আমার কাছে নেই। ৩০শে মার্চ হাসপাতালে অরবিন্দু চৌধুরী সই নিয়ে গেলেন, পাসপোর্ট তুলে দেবেন। এখন তিনিই বা কোথায় আর পাসপোর্টই বা কোথায়? ফিরে এলাম। তখন সিষ্টার বললেন, "আমি করাচী হয়ে দিল্লী যাচ্ছি, আবার করাচী হয়ে দেশে যাবো। তুমি যদি ভারতে তোমার কোন আত্মীয়কে চিঠি দিতে চাও, দিতে পারো। দিল্লী থেকে আমি পোষ্ট করে দেবো। তোমার চিঠি নিতে আমার অসুবিধে হবে না। গলার স্কার্ফয়ের ভেতরের ভাঁজে ভাঁজ করে নেবো।" তখন ভরসা পেয়ে আমার বড় ভাইকে একটি বিস্তারিত চিঠি দিলাম। বেবীর কাছে (রাজিয়া ওয়াহাব) লণ্ডনে চিঠি দিলাম—আমার দেবরকে চিঠিটা কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে। অবশ্য কলকাতায় যারা স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে, তারা সকলেই খবরটা জানে, তবুও আমার হাতের লেখায় আমাদের খবর পাওয়া আরেক কথা। এর মধ্যে বেবীর (রাজিয়া) চিঠিতে আমাদের মর্মান্তিক সংবাদ জেনে লণ্ডন থেকে জ্যোতির্ময়ের সুপারভাইজার সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি দিলেন ১-৬-৭১ তারিখে - সে চিঠির একটি বাক্য এখনও মনে জেগে আছে . "We share the memory of a man of sterling character and great courage and integrity"

Holy Family Hospital-এর নার্সিং স্কুলের সকল কাজ নিয়মের চাকায় চলছে। ক্লাস হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা হাসপাতালে ডিউটি দিচ্ছে, পরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে জুলাইয়ের চতুর্থ সপ্তাহে Capping ceremony হলো। সে অনুষ্ঠানে নীলিমাদি ও তাঁর স্বামী ডাক্তার ইব্রাহীমকে দাওয়াত দিলাম। তাঁরা এলেন, আমার থাকার জায়গা ও স্কুলের পরিবেশ দেখে খুব খুশি হলেন। সেদিনই শুনলাম যাত্রাবাড়ী, ডেমরার দিকে খুব লরি চলাচল করছে। দুটো লরি ধাক্কা খেয়ে হৈ হৈ কারবার। বোধহয় ঐদিক দিয়ে নারায়নগঞ্জে, মিল এলাকায় ওরা যায় সায়েস্তা করতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলতে হলে আগে ঋণ শোধ করতে হবে, তারপর সাকসেশন সার্টিফিকেট তো লাগবেই এবং সেটা কোর্ট থেকে নিতে হয়। নিয়মকানুন কার কাছে জানবো? ফোন করলাম রকিবাকে। সে আমার ছাত্রী ছিল, ওর আব্বা এক সময়ে পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ওর স্বামী এ্যাডভোকেট – যে চল্লিশ জন এ্যাডভোকেট এ জামানায় শেখ মুজিবুর রহমানের ক্রিয়াকর্মের বিপক্ষে সই দিয়েছেন, তাঁদেরই একজন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট জজের ও অধ্যাপক খান সারায়ার মুর্শিদের বন্ধু। গেলাম রকিবার কাছে – তার স্বামীকে দিয়ে আমার এ কাজটি করিয়ে দিতে হবে। পরের দিন রকিবা খবর নিয়ে এলো। ওকে দু'শ টাকার একটা চেক দিয়ে দিলাম কাগজ কিনে টাইপ করাবার জন্যে। রকিবা গেণ্ডারিয়ার অনেক খবর দিলো। এককালে সে হাবিব ফকিরের বাড়ীতে ভাড়াটে ছিল। রকিবা বললো, "দিদিমনি, আমি হাবিব ফকিরকে অনেক কথা শুনিয়ে এসেছি। বলেছি, দিদিমিনি, যে এই স্কুল করলেন, সে স্কুলে আসতে পারেন না। আপনি কি করেন? পরিবেশ ঠিক না করলে, দিদিমণি স্কুলে আসতে না পারলে, স্কুল আমি জ্বালিয়ে দেবো।" এই হাবিব ফকির আইয়ুব খানের গলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মালা পরিয়ে নাকি তমঘা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দিদিমনির ভালোর জন্যেই তাঁকে আসতে মানা করা হয়েছে।" রকিবা খবর আনলো যে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। "স্থাবর সম্পত্তি?" বরিশাল বানারীপাড়ার জ্যোতির্ময়দের বাড়ি – সে তো ১৯৫৩ সালে ছেলেদের হাই স্কুলকে দান করে দিয়েছি। কথা ছিল ভবিষ্যতে নবম দশম শ্রেণীতে মেয়েদের আলাদা ক্লাস হবে সে বাড়িতে। অস্থাবর যা ব্যাংকের টাকা, এন. আই. টি, জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার মালিকানা মা ও মেয়ের । এ সবের জন্যেই সাকসেশন সার্টিফিকেট লাগবে। এবং টাকার পরিমাণের ওপর ষ্ট্যাম্প লাগবে। পাওয়া গেল টাকার হিসাব, ষ্ট্যাম্পের মূল্য দিত হলো ১,৫০০ টাকা । তার উপর খরচপত্র নিয়ে পড়লো আরো ৬০০ টাকা। এসব করতে মাস দেড়েক সময় লাগবে সেটা জানা গেল।

স্কুলে যাইনে, যেহেতু মাইনে পাই, তাই ফোনে কেরানী সাহেবকে বুদ্ধি পরামর্শ দেই আর কাজের কথা বলি, কখন কি করতে হবে। ২৭ শে জুলাই ফোনে তাঁকে বললাম, টিচারদের পে-বিল করতে আর ৭০-৭১ -এর সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের স্টেটমেন্ট তৈরি

করতে। ২৮ শে জুলাই আমি আহমেদদের বাসায় গেলাম ওদের খোঁজ নিতে। ফেরার পথে একটা ট্রাংকে কিছু শাড়ি কাপড়, স্কুলের কিছু হিসাবের বই খাতা, বালতিতে যে কটা স্যুভেনীর ছিল, ব্ল্যাক আউটের জন্যে যে ক'টা মোম ছিল, দোলার ইতিহাসের এ্যালবাম নিয়ে সন্ধ্যায় আগেই নার্স কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। বেঁচে থাকলে খেতে হয়, খেতে পেলে কাজ কর্ম করতে হয় – মাথা খাটাতে হয়। রাতের বেলায় ছোট ঘরটাকে গুছিয়ে, স্বাধীন বাংলার খবর শুনে, শোবার আগে ডায়েরীতে পরের দিনের করণীয় কাজগুলো লিখে বিছানায় গেলাম। ঘুম না এলে 'ফুটফাট' শব্দগুলি বেশি শোনা যায়। এখনও আমি কোন বই পড়ায় মন দিয়ে পারিনে।

৩০শে জুলাই সকালের নাশতা খেয়ে ডাক্তার নার্সদের 'চরমপত্র' শুনিয়ে হাজারীকে ফোন করে ওদের দিকের খবর নিলাম। ইন্দিরা রোডের মোড়ের মাথায় পাহারাদার মোতায়েন থাকে, তাই আমি একা ঐ গলিতে যাইনে। শহরের এত রাস্তার নাম বদলালো। লেন হয়ে গেলো রোড বা স্ট্রীট। এই সরু গলি 'ইন্দিরা' নামও বদলালো না, –এতবড় ভুল? ফোন সেরে গেলাম ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায়, ধানমণ্ডি ২০ নম্বরে। সেখানে আমি কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা বলিনে। তাঁর মেয়েদের খোঁজ নেইনে। সেখানেই সবাই বিমর্ষ। ২৮শে এপ্রিলের পর সে বাড়ির চেহারা অন্যরকম। স্কুলের রাফ হিসাবের খাতা, ক্যাশ বই, টিফিনের হিসাব বই, যে সব আগে জমা দেইনি – সব দিয়ে দিলাম স্কুলের সেক্রেটারী ডাক্তার ওয়াহিদকে। বোধ হয় লকারের চাবিটাও দিলাম। বলে দিলাম ক্যাশ টাকা তিনজন সাক্ষী রেখে যেন বুঝে নেন সহকারী প্রধান শিক্ষিকা। এর আগে ১লা জুলাই থেকে আরো দেড় মাসের ছুটির দরখাস্ত আমি সহকারী প্রধান শিক্ষিকার কাছে তার ভাইয়ের বাসায় কে. এম. দাস লেনে দিয়ে এসেছি। আর শিক্ষক হাজিরা খাতায় সই দিয়েছি। তিনি এখন টিকাটুলীতে থাকেন।

জুলাই মাস গিয়ে আগস্ট মাস এলো। সরকারের ও বিচ্ছুদের মধ্যে কর্মতৎপরতা বেড়ে গেলো। মিলিটারী জান্তারা নব নব পদ্ধতিতে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে – বিচ্ছুরা ভাঙচুর, অনিষ্ট করছে। রাতের বেলা ব্ল্যাক আউট তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফুটফাট গুলীর শব্দে তো এখন আর কেউ বেশি চমকায় না। মনে করে ওরা ভয় দেখাচ্ছে, কিংবা নিজেরাই ভয় পেয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

মিলিটারীরা খবর নিচ্ছে কোন কোন বাড়িতে জোয়ান ছেলেরা ঘরে নেই। ওদের না পেলে বাপদেরকে ধরে নিচ্ছে। অত্যাচারও করছে। যে ছোকরা বয়সী ছাত্ররা বড়িতে আছে, তারা লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়, জেরা করলে বলে, তারা ছাত্র না। কেউ বলে গম ভাঙার কল আছে, কেউ রেশন দোকানে কাজ করে।

আজিজের বাপকে তো ধরে নিয়ে গেছে, তিনি জগন্নাথ কলেজের বোটানির অধ্যাপক। তাঁর তিন মেয়ে আমার স্কুলের ছাত্রী। বাপকে ধরে নিয়ে গেছে, বড় ভাইটা ঘরছাড়া। ওদের

না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। আহা ! এই আজিজ আমাকে কত জ্বালিয়েছে। ছেলেগুলো আমার অফিস থেকে Oxford–এর Advanced Learners Dictionary খানা নিয়ে গেছে। এইতো একাত্তরের জানুয়ারীতে। আজিজকে বললে বলে, "আরতো কিছু নেয় নাই দিদি, ওরা ডিকশনারী নিয়েছে। পড়লেও তো কিছু শিখবে।" আমি বলি, "ছাই শিখবে।" সেই আজিজ বোধ হয় এখন বন্দুক কাঁধে জঙ্গল জঙ্গলে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা বাদ দেওয়া গেল না। বোধহয় ৭ বা ৮ই আগষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হলো। হলে হবে কি ? ছেলেরা কত ভাগ পরীক্ষা দিয়েছে জানিনে। মনিজা রহমান স্কুলের ছাত্রীরা যাদের আবব্বা সরকারী পুলিশ, আইবিতে চাকরি করেন, তারা বাধ্য হয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। ছেলেরা উধাও হয়ে বাপদের জ্বালাচ্ছে, মেয়েরাও বাড়িতে থেকে মা বাপের অসুবিধের কারণ হয়ে রয়েছে। পরীক্ষার সময়ে আমি আবার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে জেনারেল হেডে সেপটিক টনসিল জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছি। কাজেই পরীক্ষা না দেওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারো শাস্তি হয়েছে কিনা জানিনে। জ্বর না হলে পরীক্ষার হল দেখতে যেতাম হয়তো। ছাত্রী নার্সরা আমাকে ধরে নিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। এবার আমি ওদের অতিথি নই। সিট ভাড়া দশ টাকা। কোনার দিকে একখানা বেড। ভিজিটিংয়ের সময়ে খুব অসুবিধে হয়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি। এর মধ্যেও অন্য রোগীর আত্মীয় স্বজন চিনে ফেলেন, কেউ বা এগিয়ে এসে কথা বলেন। বাফা'র হুদা সাহেব একদিন বলেন, "আরে ! বাসন্তী তুমি এখানে ?" তখন আমি তাঁর আত্মীয়ার কাছে এগিয়ে গেলাম।

নাজমার কাছে একটা ভয়ের কথা শুনলাম। ওনার ভাইয়ের বিহারী কর্মচারীরা নাকি জানে যে আমার সঙ্গে তাঁর দেখাশুনা হয়। তাছাড়া আরো শুনলাম আমাদের আরেকজন সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিস আর্জুমান্দ সরকার ঘোষিত নির্ধারিত তারিখে অসময়ে জয়েন করেছেন। আমি তখন বললাম, "আমি যেমন তোমার ভাইয়ের বাসায় এসে খাতায় হাজিরা দিলাম, সে রকম সবাই করে, সব অফিসে ব্যাংকে হয়। যারা নদীর ওপারে দূর গ্রামে থাকে, তারা সপ্তাহে দুদিন, তিনদিন পালা করে কামাই করে। আর্জুমান্দ অবিবাহিতা মেয়ে, নোয়াখালী থেকে একা আসতে পারেনি এবং নির্দিষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার পরে দুটায় এসেছে বলে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।"

চিঠি আসলে আমি খুব খুশি হই, সে সুজনেরই হোক আর দুর্জনেরই হোক। ছোটবেলায় আমার চিঠি আসতো না, তাও পিয়ন দেখলে দৌড়ে যেতাম। এখন প্রিয়জন, দূরের বন্ধুবান্ধবের চিঠি এলে খুব ভালো লাগে। তবে আপনজনের বৈষয়িক চিঠি আমার মোটেই ভালো লাগে না। তবুও হাসপাতালে শুয়ে সেসব চিঠি পেতেও ইচ্ছে করে। চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে একদিন সিষ্টার সারা একখানা ছোট্ট সাদা কাগজে মিষ্টি হাতের লেখা চিঠি আমাকে দিলো। চিঠিটা সিষ্টার গনজাগার। চিঠিটাতে অল্পকথায় তাঁর প্রাণের শুভেচ্ছা ছড়িয়ে আছে। সেই মোটা লম্বা সিষ্টারের সরু নিবে ছোট্ট ছোট্ট অক্ষরের চিঠিখানা আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিলো। আমেরিকায় পৌছে তিনি ৫ই আগষ্ট লিখেছেন ঃ

Many many thanks for the beautiful little vase. It is lovely, everyone here keeps asking about it and I have to watch carefully for fear it will vanish. I trust that things will work out for you and that the passport will appear near future. You must get to England before the cold weather sets in. Meanwhile keep up your good work and your wonderful spirit. I shall not forget you and let us both pray that all works out well. All the best to you and Monica. Gratefully Sister Ganzaga Pearsels.

কয়েক বার পড়েও চিঠিটা হাত থেকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। সিষ্টার এসে আমাকে দেখে অবাক। বললে কি সুখবর এলো দিদি? ওকে চিঠিটা দেখালাম। বললাম, "আজ ১০ তারিখ, ১২ তারিখের আগে আমাকে ছেড়ে দিলে ভালো হয়, সিষ্টার। আমার মেয়েকে দেখতে যাবো। ১২ তারিখে তার জন্মদিন সেটা আমার মনেই ছিলনা।"

ওরা আমাকে ১২ তারিখে সকালে রিলিজ করে দিলো। আবার নার্সদের কোয়ার্টারে গেলাম। পথে যেতে দেখলাম তাঁবুর নীচে বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে লাকড়ির চুলায় যেন বিয়ে বাড়ির রান্না। তার মানে গ্যাস লাইন নেই - সিদ্ধিরগঞ্জের যোগাযোগ নষ্ট। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নিজেদের অসুবিধে করে বিচ্ছুরা এসব কাজ করে যাচ্ছে।

আগষ্টের ১২ তারিখে ছুটি পেয়েই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব রক্ষকের কাছে গেলাম। আমার স্বামী নিজের খরচে পি. এইচ. ডি. করতে গিয়েছিলেন '৬৩ সালে ৮০০০ টাকা ঋণ নিয়ে। ঋণ শোধ হয়েছে ৫৫০০ টাকা, বাকী আছে ২৫০০ টাকা, তা আবার সুদে আসলে হয়েছে ৩৮৬৫.৯০ টাকা। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ন্যাশনাল ব্যাংকের ২০৭ নং এ্যাকাউন্ট থেকে ক্রস চেক দিয়ে এলাম। পথে বেরিয়ে বৃটিশ কাউন্সিলের পাশ দিয়ে জগন্নাথ হলের দিকে গেলাম। ভেতরে ঢুকে চারদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে, "মালী ভাই, শ্রীপ্রসাদ, গোবিন ব'লে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" এত নীরব যেন গাছের পাতাও নড়ছে না। গানের কলিটি মনে এলো, "ঝিম ধরেছে, ঝিম ধরেছে, গাছের পাতায়।" হঠাৎ চোখে পড়লো একটা বড় গাছের নীচু ডালে একটা হাফ শার্ট ঝুলছে। ভয় পেলাম প্রথমটায়, হয়তো কেউ ফাঁসিতে ঝুলছে। পরে বোধ হলো কেউ না কেউ বাগানে কাজ করছে। ঠিকই, সেই গোবিন মালী গোলাপ গাছের গোড়া পরিষ্কার করছে। এত দিনে ওদের হাতে পায়ে বোধহয় জোর এসেছে। ওরা উর্দু বলতে পারে বলে আর ডোম পরিচয় দিয়ে সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের রাতে জল্লাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এদের অনেককেই ২৬শের দুপুর পর্যন্ত ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীর লাশ টানতে হয়েছে। অন্য মালীরা এলো। ওদের পেয়ে আমিও খুশি, আমাকে দেখে ওরাও শান্তি পেলো। আমি কিছু ফুল চাইলাম। ওরা যেন ধন্য হয়ে গেলো। বলে, "নেন মা, কেউ তো আর ফুল ছিঁড়ে না এখন।"

ওরা যখন ফুল তুলতে ব্যস্ত, আমি সে ফাঁকে গণ-কবরের পাশে চলে গেলাম। জানি মিলিটারীরা এখন আর এদিকে বেশি আসে না। ওদের কাজ শেষ। তুও আমার ভয় হচ্ছিল।

লম্বাটে চৌকো প্যাটার্ণের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ঘাসগুলো বেশ বড় হয়েছে। মালীরা অনেক রকমের ফুল দিয়ে দুটো তোড়ার মতো করে দিলো। আমি কিন্তু গণ–কবরে তোড়া বা ফুল দিতে পারলাম না। আমার সাত বছর আগে লণ্ডনে টিভিতে শোনা একটি ইংরেজী গানের স্তবক মনে এলো ঃ

> প্রান্তর ভরা ফুল ছিল ফুলগুলি সব কোথায় গেল? তরুণীরা সব তুলে নিল। সেই তরুণীরা কোথায় গেল? তারা সব তরুণদের কাছে গেল। সেই তরুণরা সব কোথায় আছে? ওরা সব কবরে ঘুমিয়ে আছে।

দেশের জন্যে যুদ্ধ করে যে তরুণরা প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধশেষে তাদের উদ্দেশে এ গান। আমাদের তরুণরা যুদ্ধ না করেই তাজা রক্ত ঢেলেছে এখানে। তাদের এখন গণ–কবরে ফুল দেবার সাহস নেই কারোর। আমারও নেই।

ফুল নিয়ে পথে বেরিয়ে রিকশায় চড়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের দিকে রওনা দিলাম। পথে শাহবাগের মোড়ে একটা মিলিটারী পুলিশের গাড়ি যাচ্ছিল। তাদের খাকী পোশাকের হাতে লাল রং লেখা ব্যাজটা জ্বল জ্বল করছিল। আমি মাথায় ঘোমটা দিয়ে রিকশার ঢাকনার নীচে ফুল হাতে বসা। ওরা নিচু হয়ে আমাকে চুপি দিয়ে দেখলো। ওরাও নিশ্চয় অবাক হয়েছে। ঢাকা শহরে এখন কেউতো ফুলের তোড়া নিয়ে চলে না। হোষ্টেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে নার্সদের কিছু ফুল দিলাম রোগীদের দিতে, কিছু ওদের ঘরে রাখতে। তারপর কিছু ফুল নিয়ে বেরিয়ে গেলাম নীলিমাদির বাসার উদ্দেশ্যে। পথে শাহবাগ হোটেলের পূর্ব দিকের, যেখানে এখন Out Door, একটি দোকান থেকে কেক কেনার চেষ্টা করলাম। কেক নেই, তখন এক পাউণ্ড বিস্কিট আর একটা Ice cream–এর প্যাকেট কিনে চললাম বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। নীলিমাদির দরজায় বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলো। দরজায় দাঁড়িয়েই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হলো এঁরা কোন সমস্যায় পড়েছেন। নীলিমাদি, তাঁর স্বামী, তাঁদের মেয়েরা ও আমার মেয়ে সবাই বসে আছে। মনে হয় কেউ কেউ গালে হাত দিয়েই ছিল।

নীলিমাদি বললেন, "বসো বাসন্তী, তুমি না এলে আমরা দোলাকে তোমার হোষ্টেলে দিয়ে আসতাম। গতকাল আমাদের পাড়ায় সব বাড়ি থেকে লিষ্ট করে নিয়েছে, কাদের বাড়িতে কত লোক। পাড়ার কেউ যদি জানিয়ে দেয় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মেয়ে এখানে আছে তাহলে অসুবিধে হবে। তুমি এসে ভালই করেছো।" আমার মনটা খারাপ হলেও কথাটা ঠিক। আমি আর বলতেই পারলাম না, "আজ দোলার জন্মদিন।" আমি ফুলগুলি একটা ফুলদানিতে রেখেদিলাম। ফুলের দিকে কারো মন নেই। মন তো সকলেরই খারাপ। চা খেয়ে দোলাকে নিয়ে আমি বিকেল ৫ টার দিকে হলি ফ্যামিলির নার্স হোষ্টেলে রওয়ানা দিলাম। আবার অনেক দিন পরে মা–মেয়ে একসঙ্গে রিকশায় চলছি। দোলা বললো, "আমার ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল আমার পালা বদলের সময় এসেছে।" এই ধারণা ওর বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কারণ তাকে এক মাস গেলেই আস্তানা বদলাতে হয় কোন না কোন কারণে।

দোলা ওর অভিজ্ঞতার কথা বললো, "মা, আমি ডাক্তার সাহেবের বাসায় শিখলাম তাস খেলা, শুভ সাগরের কাছে ক্যারাম খেলা, নীলিমা আপার বাসায় অনেক বাংলো বই পড়া। আরো যে কত কি শিখতে হবে, কে জানে।"

দোলাকে নিয়ে নার্সদের কোয়ার্টারে এলাম। ওকে নিয়ে ছোট সবুজ লনে বসে গল্প করছি। এদিকে একজন ছাত্রী সিষ্টার সারার খোঁজে গেলো। মেয়েটি এসে জানালো সিষ্টার সন্ধ্যার পরে ফিরবেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমাদের কোয়ার্টার তিনতলার ছাদের রেলিংটা মেট্রো ডিজাইনের; সন্ধ্যার আগেই ছোট চড়ুই পাখিগুলো থরে থরে বসলে যেন আরেকটি ডিজাইন হয়। অন্ধকার হলে পাখিরা সব তাদের গাছের শাখায় উড়ে যায়, কেউবা গর্তে, কেউ বা খোঁড়লে। সিষ্টার ফিরে এলে আমি তার কাছে গেলাম। যাবার পথে ভাবছি সিষ্টারকে কেমন করে বলবো। যদি ভাবে "বসতে পেলে শুতে চায়।" কিন্তু বলতে তো হবেই। তাঁর টেবিলের কাছে গিয়ে বললাম, "দেখো সিষ্টার। তুমিতো আমার জন্যে অনেক করেছো। এবার আমার মেয়ের জন্যে একটু করতে হবে। ওর সর্দি জ্বর হয়েছে, ওকে জেনারেল বেডে ভর্তি করে দাও। যেখানে ছিল, সেখানে অসুবিধে হয়ে গেল।" সিষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "সেকি ! তোমার মেয়ের জন্য তো আরেকটা 'কট' আগেই দিয়েছি। তুমি আমাদের অতিথি, তোমার মেয়েও আমাদের অতিথি।"

দোলাকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম। চারদিক দেখে দোলার খুব ভালো লাগলো। তাই বিছানায় বসেই বললো, "তোমার রুমটা কি cosy! রাতের খাবার সময় ছাত্রী নার্সরা দোলাকে ডেকে নিয়ে গেলো আর আমাকে বলে গেলো, "এখন থেকে মেঘনাকে আমরা ডেকে নেবো।" আমি বেঁচে গেলাম। রাতে 'চরম পত্র,' কখনও 'জল্লাদের দরবার' শুনে আমি খেতে যেতাম। সকালে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে ডাক্তার–নার্সদের কাছে সেগুলো মজা করে বলতাম।

নার্সিং স্কুলের পরিবেশটি দোলার খুব ভালো লাগলো। আমি যখন লাইব্রেরী গুছাতাম ও আমাকে সাহায্য করতো। তাছাড়া ও বই খুব ভালোবাসে, তাই যেন বেঁচে গেল। পরের দিন সুরাইয়ার বাসায় গিয়ে দোলার আশ্রয় পরিবর্তনের কাহিনী বললে সুরাইয়া বললো, "দোলার এখানে খুব ভালো লাগবে।" দুজনে অনেক দিন পর বসে গল্প করতে করতে চা–টোষ্ট খেলাম। আমার হাতে সুরাইয়া কল্পনার চিঠিখানা দিলো। চিঠিখানা এসেছে খুলনা থেকে পুলিশের হাতে। যাকে কখনও দেখিনি, চিনিনে, সে মেয়ে লিখেছে ঃ

শ্রদ্ধেয় বাসন্তী দিদি,

আশা করি ভালই আছেন। আপার পত্রে আপনার কথা শুনে দুঃখের সময় খুব আনন্দ পেলাম। আজ হইতে আপনি আমার একজন দিদি হইলেন। দিদি, আপনার পরিচয় দিবেন। দাদা বাবু এবং ছেলেমেয়ে কেমন আছেন ও আছে জানাইবেন। আপনার দেয়া দুখানা শাড়ি ও ২০ টাকা পেয়েছি। শাড়ি পেয়ে খুব উপকার হয়েছে। আপাকে (সুরাইয়া) আমার কথা বলিবেন। তিনার নিকট আলাদা পত্র দিলাম না। পরে আবার পত্র দিব।

ইতি আপনার বোন, কল্পনা।

হায়রে! কল্পনার নিজের বাড়ি থেকেও নেই। দু'খানা পুরানো শাড়ি ও ২০ টাকা পেয়ে সে কত উপকৃত। তবে মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে আছে।

আমার মেয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতালের নার্সদের কোয়ার্টারে এসে খুব খুশি। আমি যখন লাইব্রেরীতে থাকি তখন আমাকে সাহায্য করে, ঘুরে ঘুরে বই দেখে। ছবির এ্যালবামতো আগেই এনে রেখেছি। তাই ঘরে একা থাকলেও ওর খারাপ লাগে না। আমাদের অতীতটা যেন বিলীন হয়ে গেছে। ২৫শে মার্চের আগের জীবনটা তো আর ফিরে আসবে না। স্বর্ণ মাসীও নেই। সে থাকলে কথায় কথায় দাদাবাবুর গল্প করতো আর কাঁদতো। আমার কুকুর 'টমি'ও নেই। টমি এখন স্কুলে আছে। বীরবল ওস্তাকার ওকে খাওয়ায়, রমজান বিবি দাই ওকে গোসল করায়, বিস্কিটের দোকান থেকে টোষ্ট দেয়। যে টমির শব্দে পাড়ার দুরন্ত ছেলেরা ভয়ে অস্থির, সেই টমি এখন গুলীর শব্দে আমার অফিসের টেবিলের তলায় নাকি মাথা গুঁজে পড়ে থাকে।

আগষ্টের ১৪ তারিখ শনিবার আমি ক্যাপটেন আহমেদের বাসায় গিয়ে ছোট ট্রাংকে দোলার জামা কাপড় ও আমার ইতিহাসের এ্যালবাম নিয়ে এলাম। ফিরে এলেই মিসেস শ বললেন, "একজন আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন আপনার খোঁজে। আগামী বুধবার বিকেল তিনটায় আসবেন বলে গেছেন।" আমি তো প্রথমে ভয় পেলাম, সাংবাদিক কিনা! আমি এখন বিদেশী সাংবাদিকদের ভয় পাই, যদি এদেশের কথা কিছু জিজ্ঞেস করে। পরে ভাবলাম আমাদের তো অনেক কোয়েকার বন্ধু আছেন তাঁদের কেউ খোঁজ নিতে পারেন। কিন্তু আমি যে এখানে আছি তা কেমন করে জানবেন! তাও যেমন তেমন নয় খোদ জায়গায়, নার্সিং স্কুলেই এসেছেন! যাক আমি আগামী বুধবারের (১৮ই আগষ্ট) জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বুধবারের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে জীবন বীমার পলিসি বন্ধক আছে সেটা নিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পেতে হলে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগবে। এর মধ্যে লাইব্রেরিয়ানকে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নামে ইস্যু করা বই ফেরত দিতে হবে। তাই আবার ৩৪-এর বাসায় যেতে হবে। একা যাওয়ার সাহস নেই সেই শূন্য পুরীতে। রেজিষ্ট্রার অফিস থেকে গোপালকে নিয়ে ওই বাড়ির আলমারীতে অনেক খুঁজেও ওসব বই পাওয়া গেল না। তখন গেলাম ইংরেজী বিভাগের প্রধানের রুমে। সেখানে দেখলাম তিন চারজন অধ্যাপক বিরস বদনে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করার পরে বলে দিলাম, "যদি কাউকে ধরে ক্যানটনমেন্টে নেয়, তাহলে জানবেন একটা ফরম দেবে। তারপর ঐ ফরমের উত্তর পড়ে লাল, কালো টিক দেয়। কোনোটাতে সি বা 'ক্লিয়ার' লেখে। ক্লিয়ারদের ছেড়ে দেয়, কালো টিক ওয়ালাদের জেলে পাঠায়। লাল টিকওয়ালা হতভাগ্য তাদের করে নির্যাতন, তারপর কোতল। যাঁরা সে ঘরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব আহসানুল হক ও পরে একজনকে রাশিদুল হাসান (১৪ই ডিসেম্বর শহীদ) জেরা করতে থানায় নিয়ে গিয়েছিলো। আমি যত

সহজে কথাগুলো বললাম তাঁরা তত সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তারপর আমি আমার স্বামীর রুমটি খুলিয়ে আলমারীতে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বইগুলো খুঁজে সব বই পেলাম। কিন্তু ওয়েবষ্টারের দুটি ভলিউম পাওয়া গেল না। আমি যখন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার রুমে গিয়েছিলাম তখন আমার মনটা অনুভূতিশূন্য ছিল। এর পরের কাজটি ছিল লাইব্রেরীয়ানের, সেখানে সব বই ফেরত দিলাম, যে দুটি বই দিতে পারিনি, তার জন্য নাকি ওয়েবষ্টারের পুরো সেটের দাম দিতে হবে। মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে গেল বললাম, "ঠিক আছে। পুরো সেটের দাম আমি দেবো, যদি বাকী বইগুলো আমাকে দিয়ে দেন। যা ঠিক হয় লিখে জানাবেন।" বুঝতে পারলাম, সাকসেশন সার্টিফিকেট পেলেও ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট লাগবে, তার জন্যে আবার যেতে হবে রেজিষ্ট্রার অফিসে, 'এক বছরের আয়ের পরিমাণ' বের করতে।

১৮ই আগষ্ট আমার কোন্ ভিজিটার আসবেন কে জানে। ঠিক বেলা তিনটার দিকে নার্সিং স্কুলের অফিস থেকে আমার ডাক পড়লো। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আশায় গেলাম ওখানে। দেখি মধ্য বয়সী এক সাহেব, কিন্তু তাঁর দাড়ি পাকা। সম্প্রতি পাকা দাড়ি ওয়ালা কোন সাহেবের কথা তো মনে এলো না? সাহেব বুঝতে পারলেন আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। যেই বললো, "হ্যালো বাসন্তী!" অমনি তার গলার স্বর শুনেই পঞ্চাশ সালের তার তরুণ বয়সের দাড়িবিহীন মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি আনন্দে বলে উঠলাম "তুমি হেনরী? আমি তো বুঝতেই পারিনি মিঃ সেলজকে (হেনরী সেলজ)। তুমি কেমন করে আমার ঠিকানা পেলে?" হেনরী বললো, "নাইরোবিতে আমার স্ত্রী ক্যান্সারে মারা গেলে "কেয়ার" আমাকে ইসলামাবাদে বদলী করলো। তখন সেখানে না গিয়ে ঢাকায় 'কেয়ার–এ চলে এলাম। এসেই পুরানো বন্ধুদের খোঁজ নিলাম। ফ্রেণ্ডস সেন্টারের কেরামত আলী তালুকদার বললো তুমি ধানমণ্ডিতে কোথাও আছো।"

হেনরী পঞ্চাশ সাল থেকে কোয়েকারদের সঙ্গে কাজ করছিল। এখানেই পাঞ্জাবী মেয়ে সোয়ারান শিরীন (স্বর্ণলতা) কে বিয়ে করে আমেরিকায় চলে যায়। পরে 'কেয়ার'–এ চাকুরী করতে করতে আবার ঢাকায় 'কেয়ার'–এর ডিরেকটার হয়ে এসেছে। হেনরীর স্ত্রী ক্যান্সারে মারা গেছে শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছিল।

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে আমি বললাম, "আচ্ছা, এবার বলো কেমন করে আমার আস্তানা খুঁজে পেলে।"

"অনেককে জিজ্ঞেস করে সদুত্তর পাই নি। শেষটায় ফাদার টীম–এর কাছে জানলাম। তিনিও জেনেছেন হলিক্রস স্কুলের সিষ্টার টেরেসার কাছে।"

তারপর অনেক কথা হলো। ফ্রেণ্ডস সেন্টারের পুরানো বন্ধুদের কথা হলো, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হলো। হেনরী ছয় সপ্তাহের জন্যে আমেরিকায় যাচ্ছে তার মাকে দেখতে, মায়েরও ক্যান্সার। বোধহয় দিন ঘনিয়ে এসেছে। হেনরীকে পেয়ে মনে হলো আমাদের আপনজন কেউ ফিরে এসেছে।

পরের দিন সুরাইয়ার বাসায় গিয়ে এ ক'দিনের সব কাহিনী বলে হাল্কা হলাম। মশিয়ুর রহমান বলেছেন দুটো জীবন বীমার পলিসি ও ফরম পূরণ করে সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেট বা যে কোন প্রমাণ দিলেই ওরা চেক দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। চেক আনার সময় আমাকে যেতে হবে। কারণ, আমার তো ঠিক-ঠিকানা নেই। কখন কোথায় থাকবো স্থিরতা নেই। হাকিম সাহেব অফিস থেকে এলে খাওয়ার পরে গল্প হলো। তিনি বললেন, "এখন আপনি মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে পারেন। তবে রোজ যাবেন না, একই সময়ে যাবেন না, একই পথে যাবেন না।" আমার কাছে ওর চেয়ে ভালো খবর বর্তমানে আর কি হতে পারে? বিকেলের চা খেয়ে খুশি মনে কোয়ার্টারে ফিরে দোলাকে সব বললাম। একুশ তারিখে শনিবার গোপালকে সব ব্যাপার জানাতে গেলাম রেজিষ্ট্রারের অফিসে। গোপালের আস্তানায় তো আর আমার যাওয়া সম্ভব না। গোপাল শুনে খুশি হলো, বললো, "এখন ছুটির দিনে স্কুলের কোয়ার্টারে থাকতে পারবো।" দিনে সিদ্ধ ভাত, রাতে পাউরুটি খেয়ে গোপাল তো কাহিল হয়েছেই, ওদিকে স্বর্ণ ও সুভদ্রা-দাই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরের বাড়ি থেকে খেয়ে মাসখানেক আগে স্কুলে ফিরে এসেছে নিঃস্ব হয়ে। সুভদ্রা স্কুলেই রান্না করে খায়, আপাদের কমন রুমে শোয়, দরজা বন্ধ করে না যে কোন মুহূর্তে অন্ধকারে দৌড়ে পালাতে পারে ভেবে। 'টমি' এখন ওদের ঘরেই থাকে টমি চালাক হয়েছে। আগে ফুল গাছের পাতা নড়লেই 'ঘেউ' করে উঠতো, এখন আর করে না। আর্টিষ্ট বজলে মওলা স্বর্ণকে একখানা শাড়ি কিনে দিয়েছেন। মোসলেমা, স্কুলের পাশের বাড়ি থাকে, আমাদের টিচার, ওকে টাকা দিয়েছে কিছু খেতে। আমি স্কুলে যাবো শুনে ওরা শান্তি পেলো। দোলার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। কেরানী সাহেবকে জানিয়ে দিলাম অডিটের কাগজপত্র সব তৈরী করতে, এ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে ষ্টেটমেন্ট শেষ করে রাখতে।

২৪শে আগষ্ট আমি স্কুলে যোগ দিলাম। তার আগে নার্সিং স্কুলের রুটিনের সঙ্গে মিলিয়ে স্কুলে যাবার সময় ঠিক করে নিয়েছি। যেদিন পড়াই সেদিন অন্য বেলায় স্কুলে যাই, সে দিন লাইব্রেরীর কাজ করিনে। চব্বিশের সকালেই মতিঝিলে "খান ওয়াহাব" কোম্পানী'র অডিটরের সঙ্গে দেখা করি অডিটের দিন নির্দিষ্ট করতে। তারপর স্কুলে যখন গেলাম শিক্ষিকারা সবাই চুপ-চাপ, শিক্ষকরাও। ছাত্রী সংখ্যা এত কম যে ক্লাসগুলো কোচিং ক্লাসের মতো মনে হলো। টিফিনে ছুটি হয়ে যায়। সব টিচারের খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি। নতুন রুটিন করে জোড়াতালি দিয়ে চলছে। মেয়েরা যারা স্কুলে আসে, তারা বেশিরভাগ কাছে হাঁটা দূরত্বের মধ্যে থাকে। রাস্তাঘাট এখন নির্জন, আগের মতো জমজমাট নয়। সেই ২৪শে মার্চ শেষ এসেছিলাম। ৭ই মার্চের পরে তো স্কুল চলতো না, তখনও এসে অফিসের কাজ করতাম। ছেলেরা স্কুলের ভেতরে ঘুরে দেখতো আর বলতো, "আপা, আপনি অফিসের কাজ করেন, কিন্তু মেয়েদের পড়াবেন না।" হায়রে সেই দুরন্ত ছেলেগুলো কোথায়!

যেদিন বাইরের কাজ করি সেদিন স্কুলে যাইনে। যাবো কি। টিচাররা একটা দুটা ক্লাস নিয়ে চলে যায়, নয় তো ভয়ের গল্প করে। ২৬ তারিখে ডি. পি. আই অফিসে গেলাম বাড়তি গ্র্যান্ট–এর জন্য তদবির করতে। হায়রে, এখন ভিক্ষে করছি স্কুলের জন্যে। ছাত্রী বেতন ওঠে না, যে বিশ ভাগ মেয়ে যারা আসে তারাও মায়না দেয় না। শিক্ষক বেতন চালানো কঠিন। যাক স্কুলটা ধরে আছি। অফিসে আমাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা বলেন, "এর মধ্যেও টাকা টাকা করে ঘুরছেন?" তাঁরাও হাসেন, আমিও হাসি।

পরের দিন স্কুলে কয়েক জন অভিভাবক দেখা করতে এলেন, তাঁরা সবাই মিলব্যারাক, পোস্তগোলায় থাকেন। তাঁদেরকে বললাম, "মেয়েদের পাঠান না কেন? এখন তো আমি এসেছি।" বলেই মনে মনে হাসি পেলো। হায়রে, আমারই নিরাপত্তা নেই, আমি আবার অন্যদের আশ্বাস দেই। কেউ বলেন, "আমাদের ছেলেরা ঘরে নেই। মেয়েদের নিয়ে কত ভয়ে ভয়ে ঘরে থাকি।" কেউ বলেন, "দেখেন নি তো আপা। নদীর পাড়ে বাসা, যে দৃশ্য দেখেছি, জীবনে আর এমন দেখিনি। পুরুষের লাশের সঙ্গে মেয়েদের লাশ আছে। এ অবস্থায় মেয়েদেরকে বাইরেই বা ছাড়ি কেমন করে?" তাই তো। মনে মনে তাঁদের কথায় সায় দিতে হয়। ভাবি এই কি নর্মাল? রোজই কিছু কিছু অভিভাবক আসেন। দেখা গেল ছাত্রী সংখ্যাও কিছু বাড়ছে। মেয়েগুলো পাড়াতেও বেরুতে পারে না। ঘরে বসে ওদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শুধু স্কুলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন।

স্কুল থেকে ফেরার পথে বেইলি রোড জেরিনার বাসায় খেলাম। স্বামী A.G.P.O বিদেশে আছেন। ছোট বোন ডলীর স্বামী রক্তবমি হয়ে হাসপাতালে ছিল, একটু জেনে গেলাম এখন কেমন আছে। এদিকে গাড়ি বিক্রির চেষ্টা করছি। গাড়ির রুট ট্যাক্স, গাড়ির ইনস্যুরেন্স, অনেক ঝামেলার কাজ বাকী। গিয়েছিলাম নীলিমাদির কাছে, "আপনার মেয়েরা তো গাড়ি চালাতে শিখেছে, আমার নতুন গাড়িটা কিনুন না, নীলিমাদি।" দিদি বলেন, "পাগল হয়েছো। আমার মেয়েরা বলেছিল গাড়ি কিনে মেশোকে আগে চড়াবে। না, জ্যোতির্ময়ের গাড়ি কিনবো না।"

"ও গাড়িতো জ্যোতির্ময়ের নামে কেনা হয়নি, আমি বিলেতে চাকরি করে গাড়ি এনেছি।"

তা–ও নীলিমাদি রাজী হলেন না। তারপর বললাম, "১লা সেপ্টেম্বর আমাদের ৩৪ –এ বাসা ছেড়ে দিতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়। আপনি সে কোয়ার্টার নিন না, তাহলে আমরা মাঝে মাঝে যেতে পারবো।" নীলিমাদি তাতেও রাজী হলেন না, "না। না। ও বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না।" এ. আই. জি. হাকিম সাহেবের ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ির লাইসেন্সটা নবীকরণ করাতে দিয়েছিলাম কোর্টে। নেয়নি। বলেছে, "তোমার সাহেবকে আসতে বলো।" তখন হিন্দুদের লাইসেন্স জমা নিতো না। হাকিম সাহেব বললেন, "এখন তবে থাক। পরে দেখা যাবে।" ঝামেলার কি শেষ আছে? বাসা ছাড়তে হবে, গাড়িটা তো গ্যারাজে আছে। ডাক্তার ওয়াহিদ বললেন, "এখন তো স্কুলে জয়েন করেছেন, স্কুলের গ্যারাজে রেখে দিন।'

রাখবো কি, গোপাল তো এ গাড়ি চালাবে না বলেছে। বেঁচে থাকলে ঝামেলা পোয়াতে হয়, যারা বেঁচে নেই তারা মুক্তি পেয়েছে। মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেটটার কয়েক কপি ফটোষ্ট্যাট করে ঘরে ফিরলাম কাজ হলেই হলো।

২৯ তারিখে রোববার স্কুলে গেলাম। কমিটি মিটিং ছিল সকাল ৮টায়। আলোচ্য বিষয় বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের ছুটি মঞ্জুর। সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাই বর্তমানে ৩০% কম বেতন নিতে রাজী হলেন। আমি অর্ধেক বেতন নিতে রাজী হলাম। ছুটির বিষয়ে যে আলোচনা— যারা সরকারী নির্দেশের নির্ধারিত সময়ে যোগদিতে পারেনি, তাদের মধ্যে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে অর্ধ বেতনে ছুটি দেওয়া হলো। সেজন্যে আমিও আমার বাড়তি ছুটির দেড়মাস অর্ধবেতন নিবার আবেদন জানালাম। সে আবেদন মঞ্জুর হলো। গোপালকে আগেই জানিয়েছিলাম ৩০শে আগষ্ট আমাদের ৩৪-এ বাসার অবশিষ্ট ফার্নিচার যা লুটের পরেও রয়ে গিয়েছিল সরিয়ে বাড়ি বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই গোপাল স্কুলে এসে বেগম ও রমজান বিবি এবং মালীকে বলে গেল ৩০শে আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় হাজির থাকতে। গোপাল ট্রাক নিয়ে হাজির হবে।

পরের দিন সোমবার স্কুল খোলা। গোপাল ও আমি আমাদের সেই বাসায় হাজির। দাইদের ও হলের মালীদের সাহায্যে মাল উঠে গেল। আমি রিকশায় স্কুলে গেলাম। শুনলাম গেণ্ডারিয়ায় কিছু লীডার গোছের লোক পলাতক, আবার কিছু কিছু লোকের প্রতাপ বেড়েছে। তবে ও পাড়ার চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন সাহেব সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। আমার ভয় ছিল। এখনও আমার ভয় করার কিছু আছে নাকি, তাতো জানা দরকার। স্কুলের পুরানো দাই শামসুন নাহার (হাজী বিবি) গেল হাবিব ফকিরের কাছে। তিনি জানালেন, আমার এখন ও পাড়ায় কোন ভয় নেই। "এ পাড়ার লোকেরা দিদির ক্ষতি করবে না। দিদি যদি ২৫শে মার্চ স্কুলে থাকতেন তাহলে দাদাবাবু এভাবে মারা যাইতো না। আমি তো আঞ্জুমানের গাড়িতে কত লাশ আনছি, দাদাবাবুর লাশ আমারে সাধছিল। কিন্তু তাতো আমি আনতে পারি না।" পরে আমি তাঁকে বলেছি, "এনে বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই পারতেন। উনি জেদী মানুষ-যুক্তিতে চলেন, এদেশ ছেড়ে যেতেন না। তাহলে আরো নির্যাতিত হতেন। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে।"

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবছি। আমার দেশী-বিদেশী বন্ধুরা আমার মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে দেশের বাইরে নিতে চাচ্ছে তাদের ডাক আমার প্রাণে সাড়া জাগাচ্ছে। এদিকে এদেশের শিকড় আবার মাটিতে গেড়ে যাচ্ছে। স্কুলে যেতে পেরে মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। এই সেদিন যশোর কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক কাশেম সাহেব (যশোরের নাম পাগলা কাশেম) সীমান্তে যাবার ব্যবস্থা করে স্কুলে নাকি খুঁজতে এসেছিল। তাকে দেখে ভয় পেয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বলেছেন যে, তিনি আমার ঠিকানা জানেন না। ভালোই হয়েছে, নইলে কাশেম সাহেবের জোরাজুরিতে আমার মনে ভাঙন ধরতো।

ভাবলে এখনও হাসি পায়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসবাবপত্রগুলোও রিফিউজির মত পালা বদল করে। আমাদের সুখ-দুঃখ, ভয়ভীতি আছে। আমরা ভয়ে আস্তানা বদল করি। কিন্তু আসবাবপত্রগুলোর পায়া থাকলেও স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। চোর ডাকাতরা ওদের লুটে নিতে পারে। লুটের পরে যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো স্কুলের কেয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিলো। সেগুলো হলো দুটো মিটসেফ, আলনা, একটি মাত্র চেয়ার, একটি ফিতার খাট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর প্রধান Jhon Turner থেকে কেনা একটি বুকশেলফ, আমার বিয়ের ড্রেসিং টেবিল ও খাটটি, আর আমার শাশুড়ির দেরাজখানা, যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শ্বশুরের থেকে। আমরা সেটাকে বলি "শশী নাজিরের দেরাজ।" সব অস্থাবর সম্পত্তিগুলো যেন লাটুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার রাঙা মাসীমা নিঃসন্তান বিধবা, থাকতেন আমার বড় ভাইয়ের কাছে ফতুল্লায়। ভাই ১৯৭০ সালে যে কলকাতায় গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেননি। সেই থেকে মাসীমাকে আমি খরচ পাঠাতাম। এ চার মাস সে বৃদ্ধার খোঁজ নিতে পারিনি। আগষ্ট থেকে তাঁর দুধ ও বাজার পাঠাতাম দাইদের দিয়ে। বেগম, আফসুরন দাইরা গিয়ে তাঁকে স্কুটার করে ফতুল্লা থেকে স্কুলের কোয়ার্টারে নিয়ে এলো। স্বর্ণতো গ্রামে টিকতে না পেরে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে আগেই। কাজেই মাসীমাকে নিয়ে স্বর্ণ সংসার পাতলো সেখানে। আমিও এখন থেকে দুপুরের খাওয়াটা ওখানে সেরে নেই। মাসীমাকে নিয়ে আমারও একটা আংশিক সংসার পাতা হলো। কিন্তু শান্তি নেই কোথাও। রাতের বেলা ভয়ের রাজত্ব ওখানে। তবে মাসীমা বুড়ো মানুষ, ফতুল্লার দোতলার বড় বড় রুমে একা থাকার চাইতে এখানে 'টমি'কে নিয়ে ভালই আছেন। গোপালও সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে এখানে দু'রাত ঘুমিয়ে যায়, স্বর্ণর হাতে রান্না খেয়ে মুখের স্বাদ বদলায়। রাতের বেলায় কিন্তু স্কুলের এককোনায় বেড়ার ঘরে ক্লাস রুমে ঘুমায়, বিপদকালে যাতে দেয়াল টপকাতে পারে।

১লা সেপ্টেম্বরই প্রথম আমি স্কুলের টাকা তোলার ব্যাপারে সদরঘাট ন্যাশনাল ব্যাংকে গেলাম। স্বাভবকিভাবে পরিচিতদের সঙ্গে কথা হলো। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত টহল দিলাম। অনেক দিন ঘরসংসারের জন্যে কিছু কিনিনি। ইচ্ছে হলো কিছু কিনি। কি কিনবো? এমন জিনিস কিনবো যা ফুরিয়ে যাবে। তাই কলা, পেপে কিনে নিলাম, পেটে গেলেই ফুরিয়ে যাবে। দোকান অনেক কম বসেছে। শহরের লোকজনও কমেছে বলে নদীর পারের ভিড়ও অনেক কম। তবুও বন্দুকধারী খাকি পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুটপথের দোকান থেকে দাইদের জন্যে শীতের চাদর আগেই কিনেছিলাম। চাঁদার টাকা দিয়ে দু'জন হিন্দু দাইয়ের শাড়িও কিনলাম। আমার নিজের বড় তোষকের একটা কেটে দুটো বানিয়ে ওদের দু'জনকে দিলাম। আফসুরন দাই বলে, "হিন্দু দাইগো তো 'খ্যাতা ওতা নাই। পুরান কম্বল থাকলে দিতে পারেন, আপা।" হিন্দু দাইদের সাহস দেবার জন্যে মুসলমান দাইরাও নিজেদের বাড়ি থাকতেও স্কুলে থাকে রাতের বেলা। গল্প গুজব করে মনটাকে সরস রাখে।

সেদিন রাতে আমার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। নতুন করে স্কুলের কোয়ার্টারে কিছু কিছু জিনিস দিয়ে সংসার পাতা হচ্ছে। তখন আরো কত জিনিস যা ফেলে ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিক্যালে গিয়েছিলাম, সেই অস্থাবর কত কিছু, ধীরে ধীরে খোয়া গেল সে সবের কথা মনে হলো। যার কিছু আছে, সে আরো চায়, এই হলো পৃথিবীর নিয়ম। আমার তো কত বই, দু' আলমারী ভর্তি, যে গুলো বাসায় পড়ে ছিল, বেশির ভাগ গিয়েছে ঐ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোয়ার্টারের পাশের মসজিদের বইয়ের দোকানে। ভালো নতুন বইগুলো, যা বিলেতে সাড়ে তিন বছরে কেনা হয়েছিল, আর রবীন্দ্র–নজরুল–বঙ্কিমের সেট, আমার এম এ পড়ার সময় কেনা সব বাছা বইগুলো ডাঃ তাজুল হোসেনের সিটি নার্সিং হোমের একটি রুমে শো–কেসের মধ্যে ছিল। অনেক ছবির মধ্যে দুটো পেন্টিংয়ের জন্যে মনটা টাটাচ্ছে, একটা হলো এক ছাত্র শিল্পীর আঁকা মধুর ক্যান্টিন, তেল রং, আরেকটি হলো শিল্পী সুলতানের জল রঙের ছবি, পড়ন্ত রোদে সুন্দবনের ছবি। আহারে!

সুলতানের ছবিটার কথা মনে পড়ে বুকটা আজও ব্যথায় টন টন করে। যখন ১লা মে ’৭১–এ ডাঃ তাজুলের স্বাধীন বাংলা বেতারে ‘ডিরেক্টার জেনারেল’ –এর পদ প্রাপ্তি প্রচারিত হলো, তার পরেই বাড়িটা আলবদর–এর হেড কোয়ার্টার হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে ৫নং রোডের ধারের গাছগুলি কেটে সাবাড় করে দিলো। আমি যখন মে মাসে ধানমণ্ডির এপথে গেছি, ৩নং রোডে, তখন আড়চোখে চেয়ে দেখেছি খাকী পোশাক পরা দানবরা প্রায় দশ হাত দূরে দূরে বন্দুক হাতে মূর্তির মতন নট নড়ন চড়ন দাঁড়িয়ে আছে। ছাদে ও কোনায় কোনায় হাতের বন্দুক কাঁধে ঠেকিয়ে আকাশের দিকে বন্দুক খাড়া করে দাঁড়িয়ে আরো অনেকে ষ্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে। আজ মনে হলো আমার বইগুলোর কথা, শেলফ ভর্তি, শো–কেস ভর্তি বই। বড় কষ্ট পেলাম। পরের দিন গেলাম সুরাইয়ার তিন নম্বর রোডের বাসায়। বইয়ের কথা বলায় হাকিম সাহেব বললেন, “দেখা যাক কোন হদিশ পাওয়া যায় কিনা। আপনাকে নিয়ে সে বাসার পাশের বাড়ি যাবো।”

দুপুরের পরে আমরা তিনজনে সিটি নার্সিং হোম–এর পাশের বাড়িতে গেলাম।

বাড়ির নাম “মধুবন”। নামেই মধুবন, মধু নেই, বনও নেই, তবে বনের গাছ আছে। গেটের কাছ থেকে সারি ধরে সেগুন গাছ দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে। ওরা গাছের সব ডাল–পালা কেটে ছিমছাম করে দিয়েছে। যাতে আলবদররা চারদিক পরিস্কার দেখতে পায়। আসলে ভয় ওদেরই বেশি। আমি তো ওদের দিকে কখনও চাইনে, এ পথে আসা–যাওয়ার সময় এধারও মাড়াইনে। আজ পুলিশ অফিসারের গাড়িতে বসে নির্ভয়ে ‘মধুব’নের’ গেটে ঢুকে গেলাম। ওরা শ্যেন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমরা নেমেই মিষ্টার জামালউদ্দিনের ড্রইং রুমে ঢুকে গেলাম। বদ্ধ ঘরে বসে কথা বললাম। সুরাইয়া আমার পরিচয় দিলো। তিনি অনেক দুঃখ করলেন। ওনার মেয়ে ও জামাই আমার স্বামীর ছাত্র–ছাত্রী ছিলো ইংরেজী বিভাগে। তারা সুইজারল্যাণ্ডে বোধহয় আছে। এদের জামাইকে আমি ভালো

করে চিনি, ওয়ালিউর রহমান। আমরা এখানে আসার উদ্দেশ্য জানালে খুবই আফসোস করলেন, "আহা। আগে জানলে তো আপনার মালগুলো আমিই রেখে দিতে পারতাম। মালামাল বুঝে নেওয়ার সময় আমাকে ওরা সাক্ষী রেখেছিল। এখন তো রমনা থানায় জমা আছে। আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, উদ্ধার করতে পারেন কিনা।" না। আর উদ্ধার করার চেষ্টা করে ফ্যাসাদে পড়তে চাইনে। চা খেয়ে, গল্প করে চলে এলাম। হাকিম সাহেব বললেন, "থানায় আর যেতে হবে না। যা হবার হয়ে গেছে।"

পরের দিন থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণশোধ, লাইব্রেরীর বইয়ের ঝামেলা মেটানো, সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য টাকা পয়সার হিসাব দেওয়া, নানা রকম ঝামেলায় জড়িয়ে গেলাম। স্থাবর সম্পত্তি তো দান করাই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে এমন কিছু কাজ নেই, তাও আমার কাজগুলো এগোয় না। ইনকাম ষ্টেটমেন্ট না দিলে ট্যাক্স দেওয়া যাবে না, সকল টাকার হিসাব না পেলে কোর্টের কাজ এগোবে না, লাইব্রেরীর ক্লিয়ারেন্স না পেলে মার্চের বেতনও পাওয়া যাবে না। একটার সঙ্গে আরেকটার শিকল বাঁধা। তবুও আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

সেদিন সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ স্কুলে ২টায় মিটিং ছিল, মুখেমুখে শুনলাম ইয়াহিয়া নাকি একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে। কাদের জন্য? সরকারী কর্মচারী যারা কাজে যোগ দিচ্ছে না তাদের জন্যে? তারা তো কিছু ওপারে, কিছু এপারে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। না, কি যাদের ধরে নিয়েছে তাদের জন্য? তাদের কিছু থানায় থানায়, কিছু ক্যানটনমেন্টে, জেলেও আছে কিছু। জিজ্ঞাসাবাদ যাদের করেছে বা করছে, তাদের কি সাধারণ ক্ষমা হবে? না, কিছু লোক আটকাবার জন্যে নতুন ভাঁওতা? ওরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে না, আমাদের লোকও তাদের বিশ্বাস করে না। শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো ৫ই সেপ্টেম্বর। তাতে সরকারের কতটা লাভ হয়েছে জানিনে, আমাদের অনেককেই সে ৫ তারিখের আগে বন্দী শিবিরে (?) কোতল করা হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা বুদ্ধি দিয়েছে অনেককে, তারা যেন যোগ না দেয়। এসময়ে বেশ কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী কোর্টে এফিডেভিট করে মুসলমান হয়েছে। অফিসে সেই দলিল জমা দিয়ে নাম বদল করে বহাল তবিয়তে আছে হাকিম সাহেবের অফিসেও এসব কারবার হয়েছে। তাছাড়া বেনামীতে মুসলমান সেজে অন্যের বাড়িতে আশ্রিত রয়েছে আমাদেরই চেনা কতজন। পুরনো ঢাকায় অনেকে উর্দু বোঝে এবং বলেও। যারা বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়ায়, তারা বলে, "আসলাম এখানে হিন্দু মারতে, ইণ্ডিয়ার হিন্দুরা সব এখানের মুসলমানদের মারছে। আর এখন দেখি আযান দিলে সকলেই নামায পড়তে যায়।" হিন্দু যারা আছে, তারাও এখন লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়।

আমি স্কুলে যাওয়া-আসার পথে চোখ-কান সজাগ রেখে চলি। দোলার জন্যে ভাবনা-চিন্তা নেই। হলিফ্যামিলির কোয়ার্টারে নিরাপদেই আছে। গোপাল আমার বাসা থেকে কালো গোলাপের টবটি ফুলসুদ্ধ দোলার কাছে রেখে গেছে। নার্সদের ও দোলার যত্নের আতিশয্যে

গাছটি অনেক ডাল ছেড়ে সূর্যের আলো কেড়ে নিচ্ছে। হেনরী আমেরিকায় গেছে মাকে শেষ দেখা দেখতে। মার্গারেটের ২৯–৮–৭১–এর চিঠি Leicester থেকে পেলাম, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বি–ভিসা পেতে দেরী হলে যেন আমি 'এ' ভিসা পেতে পারি, পাসপোর্ট ছাড়াই আমি দরখাস্ত করতে পারি, যেহেতু আমি লণ্ডনে আড়াই বছর পড়িয়েছি। কিন্তু Employment Voucher–এর দরখাস্ত তো পাসপোর্ট ছাড়া হয় না। কোথায় গেলেন অরবিন্দ চৌধুরী? কোথায়ই বা আমাদের পাসপোর্ট? বেবী লিখছে লণ্ডন থেকে, "আপনার শুভার্থীরা এখানে সকলেই আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমাকে দিয়ে যখন যা দরকার হয়, সবই আমি করবো। আমার মেয়ে আপনার মেয়ের কথা সব সময় বলে।" তাছাড়া বেবীর মারফত যে আমার আত্মীয়ের কাছে কলকাতায় চিঠি দিয়েছিলাম, তারা লণ্ডনে বেবীর কাছে সে সব চিঠির জবাব দিয়েছে। বেবী কায়দা করে সেসব চিঠির সারমর্ম লিখে জানিয়েছে। তার অর্থ কেবল বেবী আর আমিই বুঝবো।

হাসপাতালের ঠিকানায় আরেকটি চিঠি এলো। লিখেছেন ডাক্তার মিসেস এস (শকুন্তলা) খান–বার্মিংহাম থেকে। তিনি জুন – জুলাইতে দেশে এসেছিলেন। তাঁর মেয়ে মিনু খানের ১৯৭১ সালে আমার স্কুলে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মেয়েকে বিলেতে নিয়ে গেছেন। মেয়ে যেতে চায় নি। এক শর্তে সে যেতে রাজী হয়েছে যে, দেশ স্বাধীন হলে সে দেশে ফিরে আসবো। মা এখন মেয়ের টেষ্ট পরীক্ষার নম্বর চেয়েছেন, ওখানে ভর্তি করবেন বলে। এদিকে আরেক ফ্যাসাদ মিনুর বোর্ডে নাম বদ্লাবার দরখাস্ত গেছে— এখনও সে নাম বদল হয় নি। মা বাপের নাম বদলের কোন আগ্রহ নেই। কোন্ টিচার নাকি বলেছেন এটা মুসলমানী নাম হয়নি তাই মেয়ের এই নাম বদলের ইচ্ছা। বাপ বললেন, "দিন, আপনিই একটা নাম এস' দিয়ে। আমিও মা বাপের নামের প্রথম অক্ষর 'এস' দিয়ে নাম দিলাম 'সোহেলী'। বাপ সেই নাম এফিডেবিট করলেন wish to change my daughter's name. কিন্তু তাতে হলো না। শুধু এটা করলেই হবে না, বলতে হবে 'মিনু' মুসলমানী নাম নয়। এত ঝামেলা পোহাতে তিনি চান না, তাই 'মিনু খান' নামেই সে বিলেতে ভর্তি হবে, তাছাড়া পাসপোর্টও ঐ নামে। দিলাম 'মার্কশীট' পাঠিয়ে।

নিজের নেই ঠিক ঠিকানা, অথচ দায়িত্বের কাজগুলো করতেই হয়। ১০ই সেপ্টেম্বরের তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অব এ্যাকাউন্টস্ একটি হিসাব দিলেন – ১/৭/৭০ থেকে ২৬–৩–৭১ পর্যন্ত। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ঢাকা মেডিকেলে মারা গেল ৩০শে মার্চ। গুলী খেল ২৫শে মার্চের রাত ১২টার পরে। রেজিষ্টার তো মানতেই চান নি গুহঠাকুরতা মারা গেছে। ডিরেক্টর অব এ্যাকাউন্টস্ বেতনের হিসাব দিলেন ২৬শে মার্চ পর্যন্ত, কেমন করে? যাই হোক আমার কাজ হলেই হলো। এখন আমি ইনকাম ট্যাক্স ফরম পূরণ করতে পারবো, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা পেতে অনেক খড়কুটা পোড়াতে হবে। ২–৯–৭১ তারিখে তো ইনস্যুরেন্সের চিঠি দুটো নিয়েছি।

এখন প্রায়ই রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ব্ল্যাকআউট হয়। এ সময়টা বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ ছিল। শহরের সব বাতি নিভে গেলে (ঘরের বাতি না নেভার তো প্রশ্নই ওঠে না) আকাশের মিটি মিটি তারার আলোতে পৃথিবীটা বীভৎস দেখায়। তখন একটি মাত্র হেলিকপ্টার একচোখের প্রখর আলো ফেলে ধীরে ধীরে শহরটা খুটে খুটে দেখে। আমরা তখন ঘরের মোমবাতিটাও নিভিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ওটার পরিক্রমণ দেখি। এদিক ওদিক ফুটফাট শব্দ শোনা যায় হয়তো কারো বাড়িতে একটু বাতি জ্বলছে, তাই রাতের প্রহরীরা ফাঁকা আওয়াজ করছে। 'অল ক্লিয়ার' সাইরেন বাজলো, পথের বাতি জ্বললো, আমরা মা-মেয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুলাম। কিন্তু ঘুম আসে না এরকম অবস্থায় আমরা কথা বলি। ২৫শে মার্চের আগের জীবনটা যেন আমাদের সুদূর অতীত। আমাদের এই চলমান জীবনের গতির কথাই আমরা চিন্তা করি, ভাবি, বলি। দোলা ভাবছে, "প্রায় একমাস হয়ে গেল এখানে এসেছি, আবার না জানি কোথায় ও যেতে হয়। একমাস হয়ে গেলে মনে হয় অন্য কোথাও যেতে হবে।" আমি বলি, "এইতো জীবন গতিই জীবন, স্থিতি মরণ। কবি বলেছেন, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।" দোলা হাসলো আমার কবিতা শুনে। অন্যান্য আশ্রয়ে মনে হতো অন্যের বাড়িতে আছে দোলা, এখানে তা মনে হয় না। অথচ এখানেও সবাই পর। আসলে ইচ্ছা করলে এখানে আমরা একান্ত মনের কথা বলতে পারি। এ ফাঁকে আমি কথাটা পাড়লাম, "জানিস দোলা, সিষ্টার মেরিয়ান টেরেসা, তোর প্রিন্সিপাল খবর পাঠিয়েছেন, "মেঘনা এখন স্কুলে আসতে পারে। ওদের প্রিটেস্ট হবে। এ বছর আর টেস্ট পরীক্ষা হয়তো হবে না। তবে ওকে বকেয়া মায়না দিতে হবে, তা সাত মাসের মাইনা জরিমানা সহ।" দোলা বললো, "বইতো আমার নেই, পড়বো কেমন করে? এতদিন তো ক্লাশও করিনি। কী পরীক্ষা দেবো?"

"তুই রাজী হলে আমি সব ব্যবস্থা করবো। আর নার্সিং স্কুলের প্রিন্সিপালের ছেলে হলিক্রসে পড়ে। তিনি বলেছেন, হলি ফ্যামিলির এ্যাম্বুলেন্সে তাঁর ছেলের সঙ্গে তুই যেতে পারিস।" দোলার মুখটা যেন বন্ধ হয়ে গেল। পরে দোলা বললো, "২৫শে মার্চ রাতে না তোমাকে এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করতে বলেছিলাম?" বুঝেছি, "এ্যাম্বুলেন্স" বলতেই দোলার সেই অসহায় অবস্থাটা মনে পড়লো। অন্য কথায় চলে গেলাম, "তুই সুরাইয়াদের গাড়িতে আসবি।" পরের দিন স্কুলে যাবার পথে আমি সুরাইয়ার বাসা হয়ে গেলাম। ঠিক হলো দোলা ফেরার পথে ওর মেয়ে নিলুফার ও ছেলে নাঈমের সঙ্গে ওদের গাড়িতে ওদের বাসায় আসবে। ওখানে চান করে খেয়ে বিশ্রাম করবে। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি ওকে হলি ফ্যামিলিতে নিয়ে আসবো। দোলা বোধহয় ১৫ তারিখে প্রথমে স্কুলে গেল। ওদের ক্লাশে বেশ কিছু মেয়ে স্কুলে আসছে। ডঃ কে. এস. আলমের মেয়ে সামিনা বলেছে, এ দেশে সে কোন পরীক্ষাই দেবে না। সে আমেরিকায় বড় বোনের কাছে চলে যাবে। দোলাকে ওর বইগুলো দিয়ে যাবে। দোলা খুব কষে পড়া শুরু করলো। সব বিষয়ে পরীক্ষা হবে না।

ফেরার পথে আমি গেণ্ডারিয়া থেকে ছোট্ট ছোট্ট 'টেডি' টোস্ট বিস্কিট নিয়ে আসতাম আর সবাই মিলে চা আর টোস্ট খেতাম মাখন দিয়ে।

দোলা নার্সিং স্কুলের প্রিন্সিপালের ছেলের সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সে হলিক্রস স্কুলে যেতো, সুরাইয়ার মেয়ে নিলুফা ও ছেলে নাঈমের সঙ্গে ওদের গাড়িতে বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতো। আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে দোলাকে নিয়ে হলিফ্যামিলিতে আসতাম।

রাতের বেলা এখন দোলা বেশ কথা বলে। নানা কথা, স্কুলের গল্পও। দোলা বললো, "জানো, মা। তারান্নুমরা পাকিস্তানে চলে গেছে।" আমি তো জানি। ওরা নয় শুধু, অনেক বিহারী, অবাঙ্গালী বড় বড় অফিসার পরিবার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওর মা দু'ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে আগেই গিয়েছে। কেবল ওর আব্বা ডঃ মঈয়ুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে ছিলেন। বিলেতে আমরা এক পাড়ায় থাকতাম, ওঁরা বাইরে গেলে তারান্নুমকে আমাদের বাসায় রেখে যেতেন। আমরা বাইরে গেলে দোলাকে ওদের বাসায় নিয়ে যেতাম। ফেরার পথে বাড়ি নিয়ে আসতাম। তারান্নুমের আব্বাও জুনের শেষে চলে গেছেন। একদিন গোপালকে ব্যাংককে দেখে বলেছিলেন তিনি আমাকে একটু দেখতে চান। গোপাল আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলাম, "ওনাকে আসতে বলো।" মানুষ ভালো মন্দ আছেই, বিহারী বাঙালী কোন কথা নয়। একদিন এসেছিলেন শেষ দেখা দেখতে। কিন্তু হাসপাতালের ওরা বিহারী বলে আসতে দিতে চায় নি। পরে আমার অনুমতি নিয়ে ওরা ওনাকে নিয়ে এলো আমার কেবিনে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ঢাকা শহরটা একটু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। তবে রাজাকার, আলবদরে শহর ছেয়ে গেছে। যে ছেলেগুলো গ্রামে ছিল, তারা আর গ্রামেও থাকতে পারছে না, সেখানে রাজাকারে ভরে গেছে। তবে সব রাজাকার খারাপ নয়। ওপারে যেতে পারবে না, এপারে থাকতে হলে ছাত্র হয়েও থাকা যাবে না, তখন রাজকার না হয়ে উপায় কি? বেশ কিছু জোয়ান গেণ্ডারিয়া পাড়ায় ফিরে এসেছে, আবার কতগুলো উধাও হয়েছে। এমনও হতে পারে তার পালা করে যাওয়া-আসা করে। স্কুলে বোনদের কাছে ভাইদের খবর জিজ্ঞাসা করা যায় না। সত্যি কথা বলাও সহজ নয়। এই তো আমার খুড়তুতো ভাইটা, কেশব, মাথায় সাদা চুল গালভরা কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো দাড়ি, মনে হয় নকল দাড়ি, পায়জামা শার্ট পরে গেণ্ডারিয়ায় সদরঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ভয় ডর নেই, বিপদে পড়লে মসজিদে ঢুকে। দেখা হলো সদরঘাটে। ওর কাছে খবর পেলাম পূর্ণবাবু, আমার স্কুলের ত্রিশ বছর সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে নিজের গ্রামের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার খুবই অসুবিধে, ডাল আর মিষ্টি কুমড়া সিদ্ধ, নইলে ভাজি, নয়তো ঘন্ট। সেই যে ২৭শের মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা শুনে একবস্ত্রে বেরিয়ে, বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটেছেন, এর শেষ কোথায় কে জানে। শীত আসছে তা ছাড়া গাঁয়ে চাদর নেই, আমি একটি মোটা চাদর কিনে দিলাম গায়েও দেবেন, আবার

বিছানার চাদরও হবে। আর এক কৌটা দুধ, কিছু ভিটামিন ট্যাবলেট। কেশবকে বললাম, "তুই আর ঢাকায় আসবিনে এই মুক্তিযোদ্ধার চেহারা নিয়ে।" শুনলাম গেণ্ডারিয়া বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধীর রায়, যদিও অকৃতদার, তবুও তাঁর নাতি অনিমেষ, নাতবৌ পুতুল আরো অনেককে নিয়ে নিজের বড় বাড়িঘর ছেড়ে কলাকোপা বান্দুরা আছেন। সেখানে খৃষ্টান বেশি। হলে হবে কি। শহরের লোক যেখানে যায়, সেখানেই ডাকাতি হয়। বড়ই মুছিবত। ওনার খুব ইচ্ছা শহরে চলে আসেন। তাঁর দু'টাই নেশা; একটা সিগারেট খাওয়া আরেকটা সিনেমা দেখা। এক হল থেকে আরেক হলে পরের 'শো' তে যেতে পারেন। সিগারেট তো যোগান দেন তিনজন শিক্ষক – হামিদ স্যার, বজলুর রহমান, রব স্যার, কিন্তু সিনেমা হল তো তাঁরা গ্রামে নিয়ে যেতে পারেন না। শুনলাম সুধীর বাবুকে তাঁরা ঢাকার কোথাও গোপন আশ্রয়ে এনে রাখার চেষ্টা করছেন। হামিদ স্যার বলেছেন উনি এলে আমাকে নিয়ে যাবেন।

স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা নগণ্য হলেও, প্রতিদিন হাফ স্কুল হলেও বিদ্যালয় প্রধান ও অফিস কর্মচারীদের কাজের অভাব নেই। যাকে বলে 'আয়নার থেকে বায়না বড়।' একাত্তর বাহাত্তর সালের বাজেট কর, গ্র্যান্ট-ইন-এইড, টিফিন গ্র্যান্ট, টিচার বেনিফিট, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দরখাস্ত, ষ্টেটমেন্ট কর, খান ওয়াহাব কোম্পানীতে অডিট রিপোর্টের জন্য মতিঝিল দৌড়াদৌড়ি কর। পার্টটাইম এ্যাকাউন্টান্ট বেলা দু'টার পর এলে আমাকে হয়তো কখনও পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। স্কুলের বিহারী দারোয়ান সেই যে ১৭ই মার্চ সাত দিনের ছুটি নিয়ে মীরপুর ১২ নম্বর সেকটারে গিয়ে বসেছে, তার আর পাত্তা নেই। পাড়ার পুরানো রাজ ওস্তাকার 'বীরবল' এখন স্কুল দেখাশুনা করেন। তিনি স্কুলের নতুন দালানের ভিত্তি থেকে (১৯৬৩ সাল) কাজ করছেন, তাই তাঁর মমতা স্কুলের জন্য। তাছাড়া এ পাড়ার বাসিন্দা তিনি। তাঁকে অনুরোধ করলে 'না' করতে পারেন না। কিন্তু রাতের বেলায় তিনি থাকেন না। স্কুলের দাই, আয়ারা আর 'টমি' স্কুল পাহারা দেয়। এখন এমন অবস্থা যে চোরও চুরি করতে ভয় পায়। এক একটি রাত যায়, দিন হয়, দাইদের মনোবল ফিরে আসে। স্কুলের রিজার্ভ ফাণ্ড, সদরঘাটে ন্যাশনাল ব্যাংকে Fixed Deposit টা, নবীকরণ করা হলো ১৬ই সেপ্টেম্বর।

এদিকে দোলার পড়াশুনা চলছে, ইতিহাসের ছবির এ্যালবাম তৈরী করতে হচ্ছে। ছবি চাই টিপু সুলতান, বুদ্ধদেব, তাজমহল, আকবরের দরবার। তাছাড়া ৭ম শ্রেণীর ইংরেজী ইতিহাস বই দরকার। এর যোগান দিতে হচ্ছে আমাকে। ওর একটা জামা, নাইটি বানাতে হবে আমাকে। গেলাম আহমেদের বাসায়। সেখানে আমার শেলাইয়ের কলটি ছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর ডি. পি. আই অফিস থেকে গ্র্যান্ট-ইন-এইড, শিক্ষক বেনিফিটের অর্ডার নিয়ে বিল করে পরের দিন বিল পাশ করিয়ে ২৫ তারিখে শনিবার বিল এ. জি. অফিসে জমা দিলাম। টাকার অভাব, জরুরী ভিত্তিতে বিলটি পাশ করানো হলো।

ক'দিন থেকে শুনছি, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল Red Cross নিয়ে নেবে বা Red Cross কে দিয়ে দেওয়া হবে। সিস্টাররা সবাই চলে যাবেন। নতুন মালিক, নতুন সেট নিয়ে বসবেন। আমাকেও চার মাস পরে এই আশ্রয়টি ছাড়তে হবে। ১২ই সেপ্টেম্বরে পর থেকেই দোলার আশংকা 'সময় হয়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' আশংকা সত্য হলো। হাজারীকে ফোন করে জানালাম সব। হাজারী ও স্ত্রী হাসনা হাজারী (জেলী) এলো। জেলী কর্মজীবী মহিলা এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। মিসেস জোবেদা খানম চেয়ারম্যান। তাঁকে বলে আমাকে তার সদস্য করে নিলো জেলী। নিউ বেইলি রোডের মহিলা সমিতির ও গাইড হাউসের মাঝখানে বাড়িটার দোতলা পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। দোতলা থেকে কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল হবে। এক আগাখানি মহিলা নিলেন ১নং রুম–একটি সিট ৫০ টাকা ভাড়া, ২নং রুমটি রাস্তার ধারে দুই সীটের রুম –৯০ টাকা দিয়ে নিলাম আমি। দোলার ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে হলো হাজারীদের ইন্দিরা রোডের বাড়িতে। ওখান থেকে 'হলিক্রস' স্কুলে দোলার ক্লাশ করা সহজ। জেলীদের বোনের মেয়েরা ইন্দিরা রোড থেকে স্কুলে যায়। মহিলা হোস্টেলে রান্না খাবার ব্যবস্থা নেই। দারোয়ান একজন আছে, সে গাঁয়ের কৃষক, শেষ মাথার কোনায় রান্না ঘরে থাকে। দোলা স্কুলথেকে এসে এবাড়িতে একা থাকবে কেমন করে? খাবেই বা কেমন করে? এখান থেকেই এ সময়ে হলিক্রস স্কুলে একা যাওয়া তো সম্ভব নয়। আমাদের স্থান পরিবর্তনের খবর ডাক্তার ওয়াহিদকে, সুরাইয়াকে ও আহমেদকে জানালাম। স্কুলে কিন্তু কাউকে বলিনে আমি কখন কোথায় থাকি। ওখানে কয়েকজন দুষ্ট লোকের নাকি ক্ষমতা বেড়ে গেছে।

রাতে শুয়ে দোলা আর আমি আমাদের যাযাবর জীবনের কথা আলোচনা করি। কতদিন, কতবার যে আমাদের এভাবে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে অন্যখানে ঘুরে বেড়াতে হবে, কে জানে। হঠাৎ দোলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা মা! ক্যাপটেন আহমেদের বাসা থেকে তুমি আমি যেদিন 'USIS'য়ের লাইব্রেরীতে গেলাম, সেদিন সিঁড়ির উপরে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। তুমি তাদের সঙ্গে এত কথা কি বললে? তারা কে, মা?"

আমি বললাম, তাদের একজন বজলু, ইংরেজীর ছাত্র। ঢাকায় ড্রামা সার্কেল–এর সেক্রেটারী ছিল। "কেন? বিলেতে তুই দেখিস নি ওকে? রাতের বেলায় ফ্যাক্টরীতে চাকরী করতো আর দিনের বেলায় ঘুমাতো?"

দোলা যেন অবাক হলো, "সেকি মা! ইংরেজীতে এম. এ পাশ করে ফ্যাক্টরীতে চাকরী করতো কেন?" আরে এ চাকরী পাওয়া সহজ আর মাইনাও বেশি। আরেকজন জাহাঙ্গীর, অবশ্য ইংরেজীর ছাত্র নয়।"

দোলা আরো প্রশ্ন করেই চললো, "মিসেস জাফরকে তুমি আগে চিনতে?" "হ্যাঁ, ও কলকাতার মেয়ে। ওর স্বামীর নাম সিকান্দার আবু জাফর।"

"ছেলে দুটো ওনার কে হয়?"

আমি বুঝতে পারছি দোলা জানতে চায়, সেদিন যে ওখানে বোমা ফেটেছিল, তার সঙ্গে ঐ ছেলে দুটোর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা। ওকে বললাম, "আমি যখন মিসেস জাফরের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন দেখলাম অন্য ছেলে দুটো এসে একটা ছোট চোথা দিলো। উনি পড়ে নিয়ে আরেকটা লেখা কাগজ ওদের দিলেন। কতক্ষণ পরে মিসেস জাফর বললেন, আমি একটু বাইরে খেতে যাবো।' আমরাও বেরিয়ে এলাম। পরে শুনেছি ঘন্টা খানিক বাদে নাকি ওখানে বোমা ফেটেছিল। এর পরে তো ওনার সঙ্গেই আমার আর দেখা হয়নি।"

আমার মনে হলো দোলা আজকাল মুক্তি যোদ্ধাদের গল্প শোনে স্কুলে গিয়ে। তাই এতদিন পরে এ ধরনের প্রশ্ন করছে।

এবার আমাদের বদলের পালা। বিপদে পড়ে অসুস্থ হয়ে, অসহায়ের মত আশ্রয় পেয়েছিলাম। হলিফ্যামিলি হাসপাতালে চার মাস ধরে এই হাসপাতালের পরিবেশটা আপন হয়ে গিয়েছিল। নার্সরা, সিষ্টাররা, ডাক্তাররা সবাই যেন এক পরিবারের লোক আমরা। ফিলোমেনা এসে বললো,, "দিদি প্রয়োজন হলে আসবেন। সাধ্য মত সাহায্য করবো। আমরা তো এখানেই থাকবো।" দোলারও মনটা একটু চঞ্চল। এখানে ওর খুব ভালো লেগেছিল।

দেখতে দেখতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এলো। আমার ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে ডাক পড়েছে – কিসের জন্যে? আমাদের বাসা তো খালি করে দিয়েছি একমাস আগেই। এখন কি বাকি? পাঁচ–পাঁচটা ফ্যান কি হলো? ৩টা বাথরুম, রান্না ঘরের কলের মুখগুলো কি হ'লো? অতগুলো দরজার পিতলের ছিটকানীগুলো কোথায় গেল? ফোনটাই বা কোথায় গেল? রাগে দুঃখে আমি কথা বলতে পারছিনে।

"আমাদের ফ্যানগুলো আপনাদের অফিসের লোকেরাই নিয়েছে। আমরা যখন বাড়ি ছেড়ে হাসপাতালে গেলাম, তখন কি আর আপনারা অফিস খুলে ছিলেন? আমি এ সবের ক্ষতিপূরণ দেবো না।"

১লা অক্টোবর সকাল আটটায় খাবার টেবিলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ন'টায় দোলাকে ইন্দিরা রোডে হাজারীর বাসায় দিয়ে, আমার মাল নিয়ে কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলে উঠলাম। তালা খুলে মাল রেখে, তালা বন্ধ করে স্কুলে চলে গেলাম। সুখ দুঃখের অনুভূতিটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেল।

অক্টোবরের পয়লা আমার মেয়ে যে জেলীদের বাসায় স্থানান্তরিত হয়েছে, আমি যে আস্তানা বদল করেছি গোপাল ছাড়া গেণ্ডারিয়ার কেউ তো আর তা জানে না। স্বর্ণও জানলো না। জানলো শুধু জেলীরা, যোবেদা খানম আর সিষ্টার টেরেসা। স্কুল চালালাম বেশ খুশি মনে, দুপুরের খাওয়া স্কুলের কোয়ার্টারে। স্বর্ণর নিরামিষ রান্না খেয়ে বিকেলে আমার নতুন

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে চলে এলাম। ঘরের তালা খুলে চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। নতুন বাড়ি চারতালার গাঁথনী শেষ, দোতালা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমার ঘরে দুখানা বেড, মধ্যিখানে একটি পড়ার টেবিল, আরেক দিকে আমার একটি ট্রাংক ও ঝুড়ি ব্যাগ। দক্ষিণের জানালা খুলে দিলাম, দক্ষিণে একটা দরজা, তাও খুলে দিলাম। শেষ শরতের বৈকালী হাওয়া বন্ধ ঘরটায় ঢুকে পরিবেশটা পালটে দিলো। উত্তরের প্রবেশ পথের বাঁদিকে একটি ছোট্ট কুঠরী, প্রয়োজনে রান্নার ব্যবস্থা করা যায়, তাক ভরে থরে থরে খাবার সাজানো যাবে। বেশ লাগছে নতুন গন্ধ, বেসিন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। মনে হলো ঘরটাকে সাজাই। কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। ঘর সংসারের সব কিছু খোয়াতে খোয়াতে এসেছি এখানে। কালই যেতে হবে ক্যাপটেন আহমেদের বাসায়। ওদের তেতলার ছাদের চিলে কোঠায় কিছু মালপত্র আছে, ওখান থেকে বালিশ, ওয়ার, চাদর, তোয়ালে আনতে হবে, অবশ্য যদি থেকে থাকে।

আমার পাশের রুমের আগাখানি মহিলা এলেন সন্ধ্যে বেলায়। আলাপ পরিচয় হলো। আমার ট্র্যানজিষ্টার দেখে বললেন, "আসুন আমরা কলকাতার খবর শুনি।" আমি অজানা অচেনাকে বিশ্বাস করিনে। তাই বললাম, "আমি ইণ্ডিয়া ধরিনে। আপনি এটা ঘরে নিয়ে যেতে পারেন।" উনি খুশি হয়ে চলে গেলেন। তখন আমি রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলাম। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তো চার মাস আমাকে খাওয়ার চিন্তা করতে হয়নি। তাছাড়া ৩০শে মার্চ থেকেই যাঁদের যাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি, তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল আমাকে খাওয়ানোর। নীচে নেমে গাইড হাউসের একটা ছোট্ট দোকানে গেলাম। সেখানে চার আনা দিয়ে একটা ছোট্ট পাউরুটি, আটআনা দিয়ে ছোট্ট এক প্যাকেট মাখন ও বোধহয় আট আনা–কি বার আনা দিয়ে একটা ফান্টা কিনে ঘরে এলাম। চিনি মেখে মাখন রুটি খেলাম। ফান্টা দিয়ে জল ও চায়ের কাজ সাঙ্গ হলো।

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। বাতি জ্বালিয়ে ডায়েরী খুলে অগামী দিনের করণীয় কাজের কথা লিখে রাখার জন্য চেষ্টা করলাম। কিছুই ভালো লাগছে না, কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে। গত চার মাসের হাসপাতালের বিভিন্ন স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। কখন যে, চোখ বুজে এলো। কিন্তু আমার ঘুম হাল্কা, হঠাৎ মনে হলো জানলা দিয়ে ঘরে আলো পড়ছে। হতে পারে কোন গাড়ি চলে গেল। আবার জানলায় আলো। এতো চলতি গাড়ির আলো নয়, স্থির আলো। টর্চের আলোর মতো মনে হচ্ছে। তখন বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে দেয়াল ঘেসে দাঁড়ালাম। জানালায় তখনও পরদা লাগানো হয়নি। জানালা খোলা রাখা উচিত ছিল না। এখন কি করি? চুপি দিলে যদি আবার টর্চ ফেলে? নীচের পথে শব্দ হলো। এবার উঁকি না দিয়ে পারলাম না। রাস্তায়ও আলো নেই। এর মধ্যেই অনেক তারার আবছা আলোয় দেখলাম চারজন মিলে ডাষ্টবিনের ময়লা ঘাঁটছে। মনে হলো, এরা লুঙ্গি পরেনি। হ্যাঁ, খাকি পোশাক পরা, দুজনের হাতে বন্দুকও আছে। কী খুঁজছে ওরা,

নিশ্চয়ই বোমা খুঁজে বেড়াচ্ছে অত খুঁটে খুঁটে কি দেখছে? যাক। ওরা কিছুক্ষণ পরে রাজারবাগের দিকে চলে গেল। বাপস্! আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমি জানলা বন্ধ করে শুয়ে থাকলাম। আর কখনও আমি পথের দিকে জানলা খুলে শুইনি। সে রাতে আর ভালো ঘুম হলো না। কোন রাতেই বা হয়েছে ছ'মাসের মধ্যে?

পরের দিন স্কুলে যাবার পথে গোপালকে আগামী দিনের বাজারের তালিকা দিয়ে গেলাম। মৌরী, পাঁচফোড়ণও বাদ গেল না। স্কুল থেকে ইন্দিরা রোডে জেলীকে ফোন করে জানলাম দোলা স্কুলে যাচ্ছে কিনা। সে ভালো আছে, তবে কথা তো কম বলে। গত রাতের কাহিনী জেলীকে বললে ও বলেছিল, "আপনার পূর্ব দিকে মহিলা সমিতি।" ওখানে দোতালায় তারা মিয়া শোয়, ঠিক আপনাদের দিকেই। ওর সঙ্গে আলাপ করে নেবেন। সে এ. জি. অফিসে চাকরী করে। রাতে মহিলা সমিতিতে শোয়। আপনার পেছন দিকের বারান্দা থেকে কথা বলতে পারবেন, রাতের বেলায়।" আজ ঠিক করলাম রাতে খাবার জন্যে স্বর্ণর হাতের একটা তরকারী নিয়ে যাবো। রোজ রাতে মাখন রুটি খাওয়া ঠিক নয়। গেণ্ডারিয়া স্কুলের শিক্ষক হামিদ আসেন স্কুলে ছুটির পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আর ওঁদের হেডমাষ্টার স্যারের খবর দিতে। সেন্ট গ্রেগরীর অংকের টিচার বি. জি. চৌধুরীর খবরও উনি দিয়ে যান। উনি আছেন বিক্রমপুরে। এখন নাকি অন্য গ্রামে। এই তো কাজ? গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া, কোথায় একটু শান্তি আছে।

৩রা অক্টোবর স্কুলে থেকে ফিরে দেখি হেনরী আমার হোষ্টেলের গেটের ভেতরে পায়চারী করছে। আমি তো অবাক। আমার খোঁজ পেলো কি করে। পেয়েছে নার্সিং স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস শ'য়ের কাছে। খুব সোজা কাজ এটা ওর কাছে। পনের বছর পরে এসে যখন ফাদার টীমের থেকে খবর নিয়ে আমাকে নার্সিং স্কুলে পেয়েছে, তখন এতো সোজা কাজ। দোলার খবর, হাজারীর ফোন নম্বর, আমার স্কুলের ফোন নম্বর নিয়ে হেনরী চলে গেল। ওর অফিসের ফোন ও বাসার ফোন নম্বর দিয়ে গেল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে হেনরীকে ও রকিব হোসেনকে ফোন করলাম। হেনরীকে জানালাম গাড়ি বিক্রির চেষ্টায় আছি। গাড়ি বিক্রির চেষ্টা করছি জুনের শেষ থেকেই, যখন গাড়িটা গ্যারাজ থেকে চুরি হতে যাচ্ছিল।

রকিব হোসেন USIS য়ের প্রধান লাইব্রেরীয়ান, পলাদের (শহীদ মুর্তজার স্ত্রী) আত্মীয়। তিনি তার দু'দরজার ভোকস্ওয়াগেন বিক্রি করে চার দরজার মরিস মইনর কিনতে চান। পলাদের বাসায় যাতায়াত করেছি, তাই এখবরটা পলা দিয়েছে। উনি দশ হাজার টাকা দাম দিতে চান, এর বেশি কেউ দিচ্ছে না। আসলে আমি তো জানাজানি করছিনে। গাড়িতো আমার নামেই। বিক্রি করতে কোন অসুবিধে নেই। আর গাড়িটা উনি কিনলে রুট ট্যাক্স দিতে ওনার কোন অসুবিধে হবে না। স্কুলের শিক্ষিকা ইফফাত আরা হোসেনকে গাড়ি বিক্রির কথা বললাম। ও বুদ্ধি দিলো গাড়ি আরো চার ছ' সপ্তাহ রেখে দিতে। ওর খবর দেড়

মাসের মধ্যেই একটা হিল্লা হয়ে যাবে। আমার অবস্থা কাহিল। বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, গ্যারাজে গাড়ি রয়ে গেছে। আরও ভয়ের কথা এই নিঝুম পুরীতে দিনের বেলায়ই সব নিয়ে নেয়। ডাক্তার ওয়াহিদ পরামর্শ দিলেন স্কুলের ভিতরে গাড়িটা রেখে দিতে। "এখন তো আপনিও স্কুলে আসছেন? তাছাড়া স্কুলে আরো লোকজন থাকে। আর এ পাড়ার ছেলেরা কেউ আপনার গাড়ি চুরি করবে না। কিন্তু গাড়িটা আমার কাছে এখন বোঝা। মনে মনে আমি কিন্তু গাড়িটার মায়া কাটিয়ে দিলাম। কথায় কথায় সেক্রেটারী ডাক্তার ওয়াহিদকে বললাম, "ডাক্তার সাহেব! সময়তো আর কাটছে না! আসুন এই উত্তর পশ্চিম কোনায় একটা বড় কোঠা-বাথরুমসহ শিক্ষিকাদের জন্য তৈরী করি। ইট তো কেনাই আছে।" ডাক্তার সাহেব বললেন, "বলেন কি? এ অবস্থায়! আপনি স্বামী হারিয়েছেন আমি জামাই হারিয়েছি। এখন যদি আমরা দেশের এ অবস্থায় পাঁচ তলার ভিত দিয়ে ৩০ × ২০ ফুটের কোঠা তৈরী করি, লোকে কি বলবে?" কাজেই আমার ইচ্ছা মতো কাজ করা হলো না।

বিকেলে হোষ্টেলে ফিরে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ খুঁজে পাইনে। চাও স্কুলেই খেয়ে আসি। এখানে চুলোর কারবার নেই। আবার দুটো সংসার করবো? এখানে অখণ্ড সময় হাতে। কিছুই করার ইচ্ছে নেই। গল্পের বইতেও মন দিতে পারিনে। আসার পথে দেখে এলাম নারিন্দার রাস্তার সরু বারান্দায় অনেকে তাস খেলে। ওরাও সময় কাটানোর জন্যেই তাস খেলে। ওদের ভয় নেই। খাকি পোশাক পরা লোকরা ওদের পাত্তা দেয় না। ভয়ও দেখায় না। পথে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেদের দেখা যায় না। ওদের জন্যে পাড়ায় পাড়ায় চেয়ারম্যানদের কাছে মিলিটারীরা খোঁজ খবর নেয়। গেণ্ডারিয়ার নামা পাড়ার গিয়াসউদ্দিন চেয়ারমান সে সব ছেলেদের খবর জানেন না। কিন্তু প্লেইন ড্রেসে ঘুরে বেড়ায় যারা, তারাও দুষ্ট ছেলেদের খবর পায় না। অবাক হই, এত ছেলে কি বাইরে চলে গেছে নাকি! এমন ভাবছি, ঠিক বিকেল ৫টায় এসে হাজির সরদার জয়েনউদ্দীন। এতদিন পরে জয়েনউদ্দীন সাহেব আমার এ ঠিকানা পেলেন কি করে? আমার মুখের চেহারা দেখে জয়েনউদ্দীন কম অবাক হলেন না। খবর আর পাবেন কোথায়? নিশ্চয়ই হাজারীর কাছে পেয়েছেন। তিনি বললেন, "সেই মার্চ মাসেই হাজারীর কাছে খবর পেয়ে কি যাতনায় ভুগছি, বলতে পারবো না, বৌদি। আপনারা কোথায় কখন ছিলেন হাজারী কখনও বলেনি আমাকে।" আমি বললাম, "ঠিকই করেছে, তাছাড়া অনেকে আমাদের এড়িয়ে চলে। পথে চোখে চোখ পড়লেও চিনে না। অনেকে বলেই দেয়, 'আমাদের বাড়ি আর আসবেন না।' আমি এখন স্বপরিচয়ে বাইরে চলাফেরা করছি। তাও বোধহয় ঠিক করছিনা।"

হাকিম সাহেবকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, "এবার কি পঞ্চ-পাণ্ডবদের মত অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে?" কে জানে!

পরের দিন স্কুলে যাবার পথে একটা বালিশ, চাদর, তোয়ালে, একটা কেটলি ও টর্চের ব্যাটারী নিয়ে নিলাম। সংসার বড় হতে থাকলো। এদিকে নিজের অস্তিত্ব থাকবে কিনা তার

ঠিক নেই। সকালে যেখান থেকে বের হই, সন্ধ্যায় সেখানে ফিরে আসতে পারবো কিনা নিশ্চয়তা নেই। দোলাকে জেলী হাজারীর দায়িত্বে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। দোলার প্রি–টেস্ট আরম্ভ হবে, দোলা পড়ায় মন বসাতে পারছে কিনা কি জানি। কিছু না জিজ্ঞেস করাই ভালো। ৬ তারিখে স্বর্ণকে দিয়ে পিঠে বানালাম, দোলার জন্যে চকোলেট কিনলাম। ওদের দিয়ে আসবো। স্কুলের অডিট শুরু হবে, ১০ তারিখ থেকে চলবে ১১ তারিখ পর্যন্ত। বোঝার উপরে শাকের আঁটি। ১১ তারিখে গাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। ৯ তারিখে শনিবার আমরা অডিটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটি লম্বা পাতলা মতো ছেলে এসে বললো, "আমি বি. জি. চৌধুরীর শ্যালক। উনি খুব অসুস্থ। আমার দিদি আপনার কাছে ১০০ টাকা চেয়েছেন।' আমি তো চৌধুরী স্যারের শ্যালককে কেন, স্ত্রীকেই চিনিনে। কেরানী সাহেবের দিকে চাইলাম। তিনি চোখের ইশারায় 'হ্যাঁ' বললেন। তাঁরা কি ব্যাংকের টাকা তুলে নেননি? হতে পারে ফুরিয়ে গেছে। আমার মতো বোকা তো বি. জি. চৌধুরী নন। "আচ্ছা, ওনার অতবড় সুন্দর বাড়িটা কি হলো?"

ছেলেটি বললো, "অন্যেরা দখল করে রেখেছে।"

অন্যের দুর্দিনে সাহায্য করতে হয় ভেবে তাকে একশত টাকা দিয়ে দিলাম।

রবিবার দশ তারিখে অডিট শুরু হলো, শেষ হলো না, সোমবারেও চলবে। এগার তারিখে সকাল ৯টায় অডিট বসিয়ে দিয়ে আমি একাই গেলাম পাটুয়াটুলিতে জনাব রকিব হোসেনের ব্যাংকে। ব্যাংকের দোতলায় তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বোধহয় তাঁর ছেলে দু'টি সঙ্গে ছিল। তারা বলাবলি করছিল, "আব্বা তো টাকা পয়সা সব দিয়ে দিলেন। গাড়িতো দেখিনে।" আমি ওনাকে গাড়ির লাইসেন্সটা দিয়ে দিলাম। পথে নেমে ওনার গাড়িতে চড়ে সদরঘাটের মোড়ের মাথায় পুরানো জি.পি,ও–র সঙ্গে ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীনলেজ ব্যাংকে গিয়ে টাকাগুলো আমার এ্যাকাউন্টে জমা দিলাম। তারপর সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ওনার গাড়িতে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪–এ গ্যারাজে চলে এলাম। গোপাল তো গ্যারাজের ও গাড়ির চাবি নিয়ে গেটের কাছেই ছিল। আমাকে দেখে গ্যারাজ খুলে গাড়িটা বের করে দিল। সেখানে গাড়ির যা কিছু ছিল তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হলো। তখন রকিব সাহেব বললেন, "আপনার এ মুহূর্তে কেমন লাগছে জানিনে। তবে আমার খুব খারাপ লাগছে।" আমি ভাবাবেগ শূন্য ছিলাম, বললাম, "আমার কোন অনুভূতিই নেই। গাড়িতো আমি বিক্রি করতামই। আপনি একজন ভালো মানুষ, আপনি নিচ্ছেন বলে আমার ভালো লাগছে।" রকিব সাহেবের গাড়ি তার দু'ছেলেকে নিয়ে আগে চললো, মরিশ মাইনর চালিয়ে গোপাল রকিব সাহেবকে নিয়ে পিছে পিছে চললো শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে, ঢাকা মেডিক্যালের দিকে গাড়ি দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি জানলাম না কোথায় গেল। গাড়ির লাইসেন্স, রুট ট্যাক্সের রসিদ, গাড়ির ইনস্যুরেন্স–এর কাগজ সব ওনাকে দিয়ে আমি খালাস। জ্যোতির্ময়ের কথায় আমি বিলেতে এ গাড়ি কিনেছিলাম। জ্যোতির্ময় পৈত্রিক বাড়ি বানারীপাড়া হাই

স্কুলকে দান করেছিল ১৯৫২-৫৩ সালে। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নাম করা স্কুল, কথা ছিল আমাদের বাড়িতে নবম ও দশম শ্রেণীর মেয়েদের ক্লাশ চলবে। একদিন জ্যোতির্ময় বলেছিল, "এখন আমাদের কোন বাড়ি নেই। তাই গাড়িই হবে আমাদের বাড়ি।" এ নিয়ে কতই না হাসাহাসি।

আমি রিক্সা নিয়ে আবার স্কুলে ফিরে গেলাম। অডিটরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অডিট শেষ হলো। বিকেলে গোপাল আমার সঙ্গে হোস্টেলে দেখা করলো। ওর কছে আরো কাহিনী শুনলাম। ওরা গুলিস্তানের পাশ দিয়ে গভর্নর হাউসের (বঙ্গভবন) কোনায় যেই-না গিয়েছে, অমনি তিন চারজন মিলিটারী ভকসওয়াগনটা থামিয়ে দিলো। মরিস মাইনরও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। এরা রকিব সাহেবের ড্রাইভারকে বললো ওদের সিদ্ধিরগঞ্জ যাওয়ার হাউসে পৌঁছে দিতে। তখন রকিব সাহেব আপত্তি করলেন। বললেন, "আমার এ গাড়িটা নষ্ট, গ্যারাজে রিপেয়ারের জন্য দিতে যাচ্ছি।" ওরা কি তা শোনে? বলে, "না দিলে জোর করেই নিয়ে যাবো।" নিরুপায় হয়ে রকিব সাহেব তাঁর ছেলেদের মরিস মাইনরে তুলে ওদেরকে নিজের গাড়ি ও ড্রাইভারকে দিয়ে দিলেন। জয়কালী বাড়ির পরে ফোলডার স্ট্রীটে তখন কয়েকটা গাড়ি মোরামতির দোকান ছিল। সেখানে গাড়ি দিয়ে তিনি গোপালকে ছেড়ে দিয়েছে, নিজে ছেলেদের নিয়ে রিক্সায় চলে গেছেন। এই হলো গোপালের কাহিনী।

রাতে শুয়ে গাড়িটা দিয়ে দেয়ার দৃশ্যটা চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো। আবার ভাবি ওসব ভেবে কি হবে? চিন্তাভাবনা করেই না গাড়ি বিক্রি করে দিলাম। গেণ্ডারিয়ার ডাক্তার সাহা যে তাঁর লাল গাড়ি, বাড়ি ফেলে ওপারে চলে গেছেন। ক'দিন পরেই তাঁর গাড়িটা মিলিটারীরা নিয়ে নিলো। ডাক্তার টি. হোসেন যে পাঁচ মাসের মেয়েটাকে রেখে যুদ্ধে চলে গেলেন? তাঁর সাদা গাড়িটা তাঁর শ্যালক চালাতেন। আলবদররা সিটি নার্সিং হোম দখলে নিয়ে নিলে তার শ্যালক গাড়িটা রাজপথে রেখে দিলেন। মিলিটারীরা নিয়ে নিলো। মানুষ বেঁচে থাকলে গাড়ি একদিন হবেই। আমরা গাড়ি দিয়ে কী করবো? আমাদের তো নিজের বাড়ি ঘরই নেই।

দোলার প্রি-টেস্ট বা টেস্ট – যাই বলা হোক না কেন, আরম্ভ হবে ১৬ তারিখে। সামিনার বই দিয়ে পড়া চালাচ্ছে। ওর পিংক স্কাফটা নিয়ে স্কুলে গেলাম, ওখান থেকে রকিবাকে ফোন করে সাকসেশন সার্টিফিকেটের অগ্রগতির খবরটা নিলাম। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে আমি ১৬ এবং ১৭ তারিখে হাজারীর বাসায় থাকলাম। তখনকার দিনে অনেকে টিউটর রাখলেও আমরা রাখিনি। তবে আমার স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক এসে দোলাকে অংক বোঝাতেন। মেয়ে সব অংক মুখস্থ করে নিতো। পূর্ণ বাবুকে পাবো কোথায়? তিনি তো এখন তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে কুমড়াভর্তা ভাত খেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বেতার শুনছেন। অংক পরীক্ষা সে ভালই দিলো। পরের দিম হাজারী বললো, "বৌদি। আপনিও এখানেই থাকেন। আপনি থাকলে দোলা কথা বলে। বরং আমরা একটা খাট কিনি আপনারা আমার পড়ার ঘরে শোবেন। চলে আসুন কাল থেকে।" আমি ভাবলাম একসঙ্গে থাকলে দোলার

কোন চিন্তা থাকবে না। আমি আমার সব চিন্তা করে যাচ্ছি ওর কথা তো ভাবছিনে। বললাম, "ঠিক আছে। থাকবো। তবে এমাসে না, ১লা নভেম্বর থেকে থাকবো। এমাসে আমার অনেক কাজ গুছাতে হবে। আর আপনার খাট কিনতে হবে না। আপনার ডিভান আর বড় সোফা সেটটা জোড়া দিয়েই আমাদের খাট হয়ে যাবে।" মনে হলো দোলা এ প্রস্তাবে খুশিই হয়েছে। ওরা তো দোলার জন্যে খুবই করছে। কিন্তু দোলা নিজেকে গলগ্রহ মনে করছে। ঠিক আমার মতো সহজ হতে পারছে না। জেলী তো দোলার ফেয়ারওয়েলের সাজগোজের ব্যবস্থা করছে। হোস্টেলে গিয়ে আমার হাল্কা ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একটি 'র' (Raw) সিল্কের গোলাপি পাড়ওয়ালা শাড়ি আনলাম। জেলী জিন্নাহ্ এ্যাভেনিউর 'আল-আমিন' থেকে গোলাপি রংয়ের গরদের ব্লাউজ বানিয়ে দিলো। জেলীর ফিরোজা পাথর সেট করা কানের ফুল ও আংটি দিয়ে ম্যাচ করে দোলাকে সাজিয়ে স্কুলের ফাংশনে নিয়ে গেলো। আমি তো স্কুলে।

পরের দিন বি. জি. চৌধুরীর শ্যালক এসে উপস্থিত। স্যারের অবস্থা কাহিল, চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। এ অবস্থায় না দিয়ে কি পারি? দিলাম ১২৫ টাকা। আমার মনে হলো সে আরো অন্যের থেকেও টাকা নেয়। কেরানী সাহেবকে বললাম, "একটু খোঁজ নেবেন, পাড়ায়। কারো কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে কিনা।" কিন্তু কেউ তো বলে না টাকা নিয়েছে কিনা। অনেকেই বলে তাকে চেনে না। যারা একই সময়ে একই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও তো এখন এক গ্রামে নেই। যার যার সুবিধা মতো আলাদা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আগেই আমি স্কুল থেকে হোস্টেল হয়ে ইন্দিরা রোডে হাজারীদের বাসায় এলাম দোলার স্কুলের বিবরণ শুনতে। জেলীর কানের ফুল ও হাতের আংটি তো তখনও দোলার গায়ে। বললাম জেলীকে দিয়ে দিতে। জেলী কিছুতেই নেবে না। বলে, "বৌদি আপনি এত হিংসুটে কেন? আমার গয়না দোলা কি পরে থাকতে পারে না?"

আমি বললাম, "দিনকাল ভাল না, অন্যের গয়না পরা ঠিক হবে না।"

জেলীর এক কথা, "গেলে আমার গা থেকেও যেতে পারে।"

কথা না বাড়িয়ে ওর কথাই মেনে নিলাম। পরের দিন সকাল বেলায় দেখি জেলী আমার সোনার 'বসন্ত বাহার' মকড় মুখ বালা দু'গাছি হাতে পরে আছে। আমি খুশি হলাম। বালা দু'গাছি ২৫শে মার্চ রাতে টেবিলের উপর ছিল, মিলিটারী অফিসার নেয়নি। সেই থেকে আমার ঝুড়ি ব্যাগে ছিল, কখন কোথায় যে জেলীর কাছে রেখেছিলাম, আজও মনে করতে পারছিনে।

আমার এখন তিনটি কাজ করতে হচ্ছে তাহলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে যাওয়া, রকিবার সঙ্গে যোগাযোগা রেখে সাকসেশন সার্টিফিকেটের কাজ এগিয়ে নেয়া, আর বিলেতের চাকরির জন্যে এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ অফিসে যাতায়াত করা। সে অফিস তো নয়, যেন বাজার, তবুও যেতেই হবে। বাইশ তারিখে শুক্রবার আমি কাঁটায়

কাঁটায় ন'টায় এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ অফিসে গিয়ে আগের চেনা লোক কাউকে পেলাম না। তাছাড়া মেলা-ই বিহারী চেহারার লোকের ভিড়। ফিরে এলাম ৩নং ধানমণ্ডিতে সুরাইয়ার বাসায়। সুরাইয়া বললো, "আমি একটা ফরম আনতে চেষ্টা করবো। আমার একটা চেনা ছেলে আছে। তাকে ধরবো।" পরের দিন সুরাইয়া নিজে গিয়ে একটা ফরম এনে আমাকে দিলো। কি করে কি করতে হবে, তা-ও বুঝালো। কাজগুলো খুব সহজ নয়। প্রথমত মোট চাকরির অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট লাগবে। '৬৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে '৬৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে বিলেতের স্কুলে পড়িয়েছি, তার প্রমাণপত্র লাগবে। তাছাড়া আমার দু'কপি ফটো এ্যাটেস্ট করতে হবে। এদেশের চাকরির ব্যাপারে সার্টিফিকেট তো সেক্রেটারী ডঃ ওয়াহিদ দিতে পারেন। না-ও দিতে পারেন। আমার মেয়ের জন্যে একটা প্রেসক্রিপশান যোগাড় করতেও কত ঝামেলা হয়েছিল। বিলেতের চাকরির তো সার্টিফিকেট আছেই। কিন্তু পাসপোর্ট তো নেই। ৩০শে মার্চ আমার স্বামী মৃত্যুর পরেই বন্ধু অরবিন্দ চৌধুরী যে আমার ও দোলার পাসপোর্ট আনতে গেলেন তিনি আজও গেলেন, কালও গেলেন আর ফিরে এলেন না। কোথায় আছেন তিনি তা তিনিই জানেন। ফটো দু'কপি এ্যাটেস্ট করাতে তো ডি. পি. আই. ইনসেপট্রেস অফিসেই যেতে হবে চেনা মানুষের কাছে। তা-ও এখন তাঁরা দেবেন কিনা কে জানে। ফেব্রুয়ারী বা জানুয়ারী '৭১-এ ডি. ডি. পি. আই সাহেব এ বছরের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে আমার নাম ইসলামাবাদে পাঠিয়েছিলেন বলে খুব ধাতানি খেয়েছেন সেকথা তো মে মাসেই বলেছেন।

সুরাইয়া ও আমি দু'জনে মিলে একটা বুদ্ধি খাটালাম। পাসপোর্ট জমা দেয়ার সময় ডায়েরীতে নম্বর ও তারিখ লেখা ছিল। কিন্তু নবীকরণের তারিখ তো দিতে পারবো না। জমা দিতে তো আর পাসপোর্ট লাগে না। কিন্তু সেই বাঙালী ছেলেটি বলেছে সুরাইয়াকে, "দেখুন আপা, দরখাস্ত জমা দেবার সময় কিন্তু ঐ মহিলাকে নিজে আসতে হবে। ওনাকে বিকেল তিনটার সময় আসতে বলবেন। তখন স্পাই থাকে না, আর ঐ ধরনের লোকজনও থাকে না। আমার সামনে সই করতে হবে।" পরের দিন ডাক্তার ওয়াহিদের বাসায় গেলাম সকাল ৭-৩০টায়। ওনাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবো চাকুরির সার্টিফিকেট, তারপর স্কুলে গিয়ে সীলটা দিয়ে নেবো। সেদিনই ইনস্যুরেন্সের টাকার খোঁজে যেতে হবে। স্কুলে যাবার পথে এবং ফেরার পথে বোর্ড অফিসে এস. এস. সি. পরীক্ষার মার্কশীট নিয়ে আসবো। দেশের যুদ্ধ ঝামেলার মধ্যেও লাটুর মতো ঘুরতে হচ্ছে আমাকে। ডায়েরীতে অনেক প্রোগ্রাম লেখা থাকলেও সব কাজ সমাধা হয় না, এখনও হচ্ছে না। কেউ মন দিয়ে অফিসে কাজ করছে না। এ আসে তো সে আসে না। তাই দুটো ইনস্যুরেন্সের চেক আজ পাওয়া গেল না। চেক দুটো আগামীকাল পাওয়া যাবে। মশিউর রহমান সাহেব যখন বলেছেন, তখন পাওয়া যাবেই।

শেষ পর্যন্ত ২৯শে অক্টোবর জীবনবীমার চেক পেলাম। খুশি মনে বোর্ডে গিয়ে বসে থেকে স্কুলের রেজাল্ট শীট নিয়ে আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে গিয়ে আমার নিজের Income-

Tax ও Finance Tax দিলাম। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার Tax-এর সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে তার Income Tax Account বন্ধ করে দিতে হবে। তার জন্যে একটা চিঠি ও Death Certificate দিতে হবে। তার কাজটা অসম্পূর্ণ রইল, আগামীকাল শেষ করতে হবে। ঢাকা মেডিক্যালের সেই মিথ্যা Death Certificate-এর ফটোকপি দিয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ব্যাংকের ২০৭ নম্বর এ্যাকাউন্টের চেক লিখে দিলাম। ভাগ্যিস আমাদের Joint account ছিল। ৩১শে অক্টোবর আমার স্বামীর হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দিলাম, এই পৃথিবীর লেন-দেন তাঁর মিটে গেল।

সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আমি যখনই ডিপিআই অফিস বা ইন্সপেক্‌ট্রেস অফিসে এসেছি, কোন কাজ হোক না হোক, তখনই আমি একবার P.W.D-র নার্সারীতে টুঁ মেরে গেছি। মোড়েই চামেরী হাউস, তার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সম্পর্ক। অনেকেই একে বলে চামেলী হাউস। আমাদের সময়ে সব মেয়েরাই এ নামটাই বলতো। যখন মেয়েদের আলাদা 'হল' ছিল না, হোস্টেলও ছিলনা, তখন প্রথমে 'হুদা' হাউসে, পরে 'চামেরী' হাউসে মেয়েরা থাকতো। আমিও দ্বিতীয় বর্ষে ছিলাম। তিন রাস্তার মোড়ে যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে সুর্য-ফোয়ারাটা, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিরাট বোগেনভেলিয়ার গাছ এক বুড়ো বট গাছকে আশ্রয় করে। আমরা যারা চল্লিশ সালের এদিক ওদিক এ গাছের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, তখনই দেখেছি গাছটির বার্ধক্যের রূপ। বটগাছের গুড়ির মতোই কয়েকটি মোটা বোগনভেলিয়ার ডাল অজগর সাপের মতো উঠে গেছে বটের উপর দিকে। তারপর বটের ডালপালাকে আশ্রয় করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে শূন্যে ছাতার মতো। শূন্যের সেই ডালগুলো যখন পত্রশূন্য হয়ে হাল্কা বেগুনি রঙের কাগজের মতো ফুলে ভরে যেতো। আহা ! নীল আকাশের বুকে কী সুন্দর দৃশ্য। তারপর যখন ফুলগুলো ঝরে পড়তো মাটির বুকে, সে আরেক দৃশ্য ! মনে হতো হাল্কা বেগুনি বৃষ্টি হচ্ছে। এ ছিল 'শ্যামলী রমনা'র একটি রূপ !

এখন এই একাত্তরে আমাদের শত্রুরা আমাদের আপন জনদের মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও খেয়ে ফেলছে দানবরা, এই বট বোগেনভেলিয়াকে টুকরো টুকরো করে কেটে গোড়া সমেত নির্মূল করেছে। হোটেল ইন্টারকনের কোনাতে রাস্তার মোড়ের সেই Serpent tree যা ঢাকার মধ্যে মাত্র তিনটি ছিল, তাকে ন্যাড়া করে রেখেছে। কেন ? ওদের ট্যাংক চলাচলের অসুবিধে হচ্ছে। পথের পাশের বট গাছের ডালা গুলোকে ট্রিম করেছে। ভাবটা এই, যেন শিগগিরই ঢাকায় ট্যাংক যুদ্ধ হবে। তাই শ্যামলী রমনার সবুজ বাহার নষ্ট করছে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেই নার্সারীতে করিম সাহেবের কাছে গেলাম। করিম সাহেব সেখানকার সর্বময় কর্তা। তাঁকে আমি ডাকি, 'করিমভাই', তিনি আমাকে ডাকেন, 'বইন'। ফুলের চারা নিয়ে আমাদের সম্পর্ক। বড় বড় বৃক্ষের এক ফাঁকে ওনার টিনের অফিস ঘর, পাকা বারান্দা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন করিম ভাই। অন্য একটি চেয়ারে আমি বসি,

গল্প করি। দেশে কারোরই মন ভাল না। কাজেই ঘর সংসার বা পলিটিক্স – এসব গল্প নয়। গল্পগুলো স্মৃতিচারণমূলক। ভাই করিম বলেন, "জানেন 'বইন' আমরা যেখানে, যে বাগানে বসে গল্প করছি এটা হলো মোহিনী দাসের বাগান বাড়ি।" আমি বলি, "হ্যাঁ, শুনেছি, আমরা তো ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের বাসায় এসে পেছনের দিক দিয়ে মোহিনী দাসের ঘাটলা বাঁধানো দীঘির সিঁড়িতে বসে জলে পা ডুবিয়ে কত গল্প করতাম। এই দীঘিতে বড় বড় ভিক্টোরিয়ান লিলি ফুটে থাকতো। এখন তো ফুলগুলো অত বড় হচ্ছে না, পানি ও বর্ষায় আগের মতো বাড়ছে না।"

করিম ভাইও গাছপালা, বাগান ভালোবাসতেন বলে এ চাকরি নিয়েছেন। তিনি যখন জগন্নাথ কলেজে আই. এস. সি পড়তেন, তখন প্রায়ই বলধার বাগানে গিয়ে বসে থাকতেন। "বলধার জমিদার আমাকে একটা ক্যাকটাস দিয়েছিলেন। সেটা আমার এখনও আছে।" আমি ভাবছি কেমন করে তিনি এ ক্যাকটাসটি রক্ষা করলেন? প্রয়াত জমিদারের কয়েক শত ক্যাকটাস ছিল। তাঁর এই ক্যাকটাস প্রীতির কথা তাঁর সময়ের অনেকেরই জানা। সেই বলধার বাগানেই ক্যাকটাসের স্বজাতিরা নিশ্বেস হয়ে যাচ্ছে। "তারপর বলুন কেমন করে কাঁটা গাছটিকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখলেন?"

"তাহলে শুনুন, বিয়াল্লিশের পরে তেতাল্লিশের দিকে আমি বি. এস. সি পাশ করে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে চাকুরী পেলাম। তখন কলকাতায় যাবার সময় আমি সেই গাছটিকে সঙ্গে নিলাম। তারপর পাকিস্তান হলে গাছটিকে নিয়ে আমি দেশে ফিরলাম।" বুঝেছি করিম ভাইয়ের নিসর্গ প্রীতি ও জমিদারের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁর ক্যাকটাসের মধ্যে।

নার্সারীতে গল্প করে, সরস হয়ে কিছু ফুল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অনেকেই আমার হাতে ফুল দেখে অবাক হলো। ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় এটা নয়। তবুও আমাদের মনটা ভরে গেল। করিম ভাই বলেছিলেন, "মন খারাপ হলেই এখানে চলে আসবেন। আমন্ত্রণ রইল।" সন্ধ্যারাতে দোতলার পেছনের বারান্দা থেকে মহিলা সমিতির দোতালার কোনের ঘরের তারা মিয়ার সঙ্গে কথা বললাম। উনি যেন রাতের বেলা আমারে এদিকে একটু নজর রাখেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে থাকবো না। আগাখানি মহিলাকেও একই কথা বললাম। আমি মাঝে মাঝে মেয়ের কাছে থাকবো। আমার ট্র্যানজিস্টার রইল তাঁর কাছে। রাতে থাকবো না শুনে তাঁর কত ভাবনা। কত চিন্তা। আমার আনন্দ হচ্ছে কাল থেকে দোলার সঙ্গে থাকবো, অন্ততঃ সকালে ও রাতে এক বাড়িতে থাকবো। আমার সাত মাসের যাযাবর জীবনের আরেক অধ্যায় কাল সকাল থেকে আরম্ভ হবে। কাল ১লা নভেম্বর স্কুলে যাবো না। স্কুলের জন্য বাইরের কাজ করবো, স্কুলে ফোন করবো, ব্যাংকে ফোন করবো, স্কুলের ব্যাপারে প্লানিং অফিসে ফোন করবো। কাল থেকে বড়লোক হবো, যাদের বাড়ি থাকবো তাদের ফোন আছে, গাড়ি আছে, বাগানঅলা বাড়ি আছে।

সেদিন ছিল ১লা নভেম্বর। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে কিছু জামাকাপড়, বইপত্র নিয়ে চলে এলাম ইন্দিরা রোডে। সকালের নাস্তার টেবিলে বসে গেলাম। হাজারী, জেলী, দোলা- তিনজনেই খুশি হলো। আমিও হাসি মুখে বললাম, "আজকের দিনটা আমি ছুটি ভোগ করবো। কেবল বাসায় বসে ফোনে কাজ চালাবো।" ওরা আরো খুশি। হাজারী বললো, "তাহলে একটা ভালো আইটেম রান্না করুন দুপুরের জন্যে।" আমি বললাম, "কেন? বড়ো লোকের বাড়ি এসেছি। আয়া আছে, বাবুর্চি আছে। আমি কেন রান্না করবো?' জেলী বললো, "আপনার হাতের অনেক রান্না তার মায়ের মতো। সে জন্যেই আপনাকে হাজারী সাহেব আবদার করছে।" "বেশ। আমি আজ কল্পতরু। যা চাইবে তাই খাওয়াবো।" হাজারী বললো, "বেশি কিছু না। আপনি বৌদি কেবল মাত্র দুটা আইটেম রাঁধবেন, একটা লাবড়া, আর কই বা পাবদা মাছের ধনে পাতার ঝোল কালীজিরা ফোড়ন দিয়ে।" দোলা ভেবেছিল কী না কী খেতে চাইবে। দোলা হেসেই বললো, "ওমা! এই?" দোলাকে হাসতে দেখে এরা খুবই আনন্দ পেল।

দুপুরের খাওয়া ও হাসি গল্পের ভেতর দিয়েই হলো। আমি দেখলাম দোলা অনেক কিছুই খায় এখানে। জেলীর আয়া অনেক রকম ভর্তা করতে পারে। আমার মেয়ে এখানে এসে ভর্তা খাওয়া শিখেছে না কেবল, বেশ ভালোবেসেই খায়। শুটকি মাছ কেউ খেলে সে ঐ টেবিলেই বসতো না! এখন সে বটমলি হোমে থেকে চ্যাপা শুটকির ভর্তা খাওয়াও শিখেছে। ওর খাওয়ার নমুনা দেখে আমি বেঁচে গেলাম। বিকেল হলে একজন দু'জন করে প্রতিবেশিনীরা আসতে শুরু করলো। সবই মহিলা ও মেয়ে। পরে জানলাম এরা সবাই আপনজন। জেলীর মা, বড়বোন, ছোট বোন, দু'ভাইয়ের বৌ। যে কোন এক বাড়িতে ঢুকলেই, ভেতর দিয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে অনায়াসে যাওয়া যায়। পরিবেশটা শান্ত নিরিবিলি, ফলগাছে, ফুলগাছে ভরা। মনে হয় এর ভেতরে কোন ভয় ডর নেই। রাতে এলো ছোট বোন ঝিনু ও তার স্বামী ফনু।

তাইতো! ঝিনুর স্বামীই তো ফনু, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাই, ডাক্তার, যাকে হাজারীর সঙ্গে রোজই হাসপাতালে দেখতাম। এত মানুষ যে আসছে, এদের কাছে আমার কোন ভয় নেই।

এ বাড়িতে এসে আমার মনে হলো, আমিও বড়লোক হয়ে গেছি। সকালে এসেই স্কুলে, ব্যাংকে ও প্ল্যানিং অফিসে ফোন করেছি। মনে হলো বাড়িতে ছুটি ভোগ করছি। বাগানে ফুল গাছের যত্ন করছি। জেলীকে একটা আগুনী রংয়ের গোলাপ ও একটা কালো গোলাপের কাটিং দিয়েছিলাম, এখন তাতে ডালপালা মেলছে। এখান থেকে হাজারীদের গাড়িতে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। কখনও হাজারীকে 'অবজারভারের' অফিসে মতিঝিলে নামিয়ে তার ড্রাইভার আমাকে স্কুলে পৌছে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের কাজগুলোও সেরে যাই। এখন রোজা চলছে,রোজা না রাখলেও ইফতার খাওয়ার লোকের অভাব হয় না। পালা

করে এবাড়ি-সেবাড়ি ইফতার খাওয়া আমার ও আমার মেয়ের চলছে। যে বাড়িতে ইফতার করা, সে বাড়িতেই রাতের খাওয়া খেতে হয়.। তখন ভালো ক্ষিদেও পায় না। জেলীদের বাসায়ও মাঝে মাঝে ইফতার পার্টি বসে আপন জনদের মধ্যে। জেলীও রোজা রাখে, শেষ রাতে জেলী সেহরী খায় শুধুমাত্র শুকনা রুটি (শুকনা মচ্‌মচে বাখরখানি) আর চা। জেলীর হাতে আমার মকড়মুখের 'বসন্ত বাহার' বালা জোড়া। ওর মা বলেন, 'ও বালা পরে নামাজ পড়তে নেই।' তাই নামাজের সময় জেলী বালা খুলে নেয়। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি গেণ্ডারিয়া থেকে বাখরখানি, আর গুলিস্তানের কাছ থেকে গরম জিলিপি কিনে আনতাম যেমনি সেপ্টেম্বর -অক্টোবরে সুরাইয়ার বাসায় আনতাম বাখরখানি বা টেডী বিস্কিট। আমাদের বিকেলের চায়ের আসর বসতো। টেডী বিস্কিট দেখলে এখনও আমার একাত্তরের সে দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

দুই বা তিন তারিখে রাতে কাজলাতে হামিদুল হক চৌধুরীর প্যাকেজ ইণ্ডাষ্ট্রীতে বোমা ফাটে, সারা রাত আগুন জ্বলে। পরের দিন ভোরে হাজারীর কাছে ফোন আসে। অফিসে যাবার পথে হাজারী সেখানে যাবে দেখতে, রিপোর্ট লিখতে হবে। আমিও স্কুলে যাবার পথে সঙ্গে গেলাম। যাত্রাবাড়ীর পরে যায়গা তো নির্জন। ডেমরার পথে মিলিটারী গাড়ি চলে বলে বেশি লোক চলাচল নেই, তাও আবার নভেম্বরের সকাল। আমাদের গাড়িটা কাজলার ফ্যাক্টরীর কাছেই থামলো। আমার তো ভয় ভয় করছিল। আশপাশে লোকজনও নেই। যদি কোন মিলিটারী গাড়ি এসে পড়ে? আমাদের গাড়ি দেখে পাশের গাঁয়ের কয়েকটা ছেলে-ছোকরা এসে দাঁড়ালো। গেটে তালা ঠিকই আছে। ভেতরে আগুন জ্বলছে। ছেলেগুলো বললো, "ভিতরে লোক আটকা পড়েছে। দেখেন না, পোড়া-পোড়া গন্ধ আসতাছে।" মনে হলো, হতে পারে। তবে এটা সরকারী ফ্যাক্টরী নয় বলে মিলিটারীদের কোন গরজ নেই। আমরা চলে এলাম। আমি জুরাইন হয়ে পোস্তগোলা দিয়ে গেণ্ডারিয়া গেলাম। ভয়ে ভয়ে পোস্তগোলায় শ্মশান ঘাটের দিকে একটু আড়চোখে চেয়ে নিলাম। ওখানে তো মিলিটারীরা ক্যাম্প করেছে। ৩০শে মার্চ ডাক্তার ওয়াহিদ যখন ঢাকা মেডিক্যালে দেখে এলেন ডাক্তাররা জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার ডেথ সার্টিফিকেটে সই দিচ্ছেন না, তখন আমাকে বলে এলেন, "আমি শ্মশান ঘাটে খোঁজ নেবো।" দুপুর গড়িয়ে গেলে ডাক্তার গাড়ি নিয়ে শ্মশান ঘাটে এলেই খুনীরা তাঁর দিকে বন্দুক তাক করেছিলেন। তখন ডাক্তার জান বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে বলেছিলেন, "আমি এ পথেই নদীর ওপারে ঢাকা জুট মিলে যাই। আমি ওদের ডাক্তার।" তখন ওরা ডাক্তার ওয়াহিদকে ছেড়ে দেয়। আমি দেখলাম বড় বড় ক্যাম্পই করেছে ওরা, আরকি, আমি কখনও এপথে আসি? স্কুলে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্কুলে সেদিন গেণ্ডারিয়া বয়েজ স্কুলের শিক্ষক হামিদ স্যার এসে জানিয়ে গেলেন "এর মধ্যে একদিন সুবিধে মতো আপনাকে আমরা হেড স্যারের কাছে নিয়ে যাবো। ওনাকে সোয়ারী ঘাটে রেখেছি।" সেদিনই বি. জি. চৌধুরীর শ্যালক এসে জানালো বিজয় বাবু মারা

গেছেন। তার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দরকার। আমি পড়লাম মহা সমস্যায়। কেরানী সাহেব বজলুর রহমান বললেন, "দিদি, দু'বার যখন দিয়েছেন টাকা, এখন মৃত্যুর খবর পেয়ে কি টাকা দেবেন না?" তাই তো! টাকা দিতে হলো। এর পর আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম মতিন সাহেবের থেকেও টাকা নিয়েছে। ডাক্তার আবু আক্তার, আমার ছাত্রীর অভিভাবক, তাঁর থেকেও ধার নিয়েছে। তার মানে আরো অনেকের থেকেও নিতে পারে। এবার মনে হলো আমাকে কি ও ঠকাচ্ছে? আমার এ অবস্থায় ও আমাকেও ঠকাচ্ছে. . . !

রাতের বেলায় সেই পোস্তগোলার শ্মশানের ছবিটা চোখে ভেসে উঠলো। ডাক্তার সাহেব ২৯শে এপ্রিল তাঁর জামাইয়ের লাশ খুঁজতে খুঁজতে পাগলা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সে কী করুণ, বীভৎস দৃশ্য। শ্মশানে কেন ওরা ক্যাম্প করলো। হিন্দুরা মরলে পরে কি পোড়াতে আসবে না? আর যারা পোড়াতে আসবে তাদের কি ওরা মেরে ফেলবে? ডাক্তার ওয়াহিদ আমার খুড়তুতো ভাইকে তাই বলে দিলেন, "তুমি শ্মশানমুখী হবে না। যাও। গ্রামে চলে যাও।" তাহলে অনাথ আশ্রমের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রানী মিত্রের স্বামীকে কোথায় দাহ করা হয়েছিল? কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? তাঁর স্বামী তো অসুখে ভুগে ২৫শে মার্চ মারা গিয়েছেন। তিনি নাকি ২৭/২৮ তারিখে আশ্রমের অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে এখন গ্রাম থেকে গ্রামে ভেসে বেড়াচ্ছেন। কতবড় দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

পরের দিন জেলী আমার সঙ্গ নিলো। সে আমার সঙ্গে নার্সারীতে যাবেই যাবে। প্রথমে আমরা গেলাম হোটেল ইন্টারকনে। সেখানে মিসেস ময়না হাসান নামে এক আগাখানি মহিলার 'কণক' নামে একটি দোকান আছে। জেলীর (হাসনা হাজারী) বোধহয় ওনার, সঙ্গে 'কণকে'র মালিকানা আছে। ওখানে একটা ফোন করতে গিয়ে জয়ার সঙ্গে দেখা। দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ছোট মেয়ের নাম জয়া। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাংগার সময়ে রণদা প্রসাদ সাহার আমন্ত্রণে আমি মির্জাপুরে যাই। তারপরে জয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। আজ জয়াকে এখানে দেখে সান্ত্বনার বাণী কিছু খুঁজে পেলাম না। জয়া নিজেই বললো সে তার বাপ-ভাইয়ের হদিস পাচ্ছে না। রেডক্রসের মারফত খোঁজ করছে তাঁরা করাচী বা ইসলামাবাদে আটক আছেন কিনা।

রেডক্রস তো হোলিফ্যামিলী হাসপাতালকে নিয়ে নিয়েছে ১লা অক্টোবর থেকেই। এরা এই হোটেলে একটা অফিস করেছে। এদিকে আবার নটরডাম কলেজে একটি অফিস আছে। হলিফ্যামিলি, রেডক্রস হাসপাতাল আর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল — এ তিনটি নিউট্রাল জোনের অধীন প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এ হোটেলে বিদেশী সাংবাদিকরাও আছে।

দিন দিন যেন পাড়াগুলো কেমন হয়ে যাচ্ছে। কে যে ভালো, কে যে মন্দ বুঝে ওঠা ভার। একই বাড়িতে বাপ মুসলিম লীগ বা জামাতে ইসলামী – তাদের ছেলেরা হয়তো আওয়ামী লীগ। তবে বাপেরা নিজের ছেলেদের সঙ্গে মতে মিল না হলেও ধরিয়ে দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের ছেলেদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিচ্ছে। তাই এ রকম পরিবেশে নিজের পাড়ায় বাস করা

নিরাপদ নয়। ছেলে ছোকরারা নিজের বাড়িতে তো রাতে থাকেই না, অন্যের বাড়িতেও একই বাড়িতে থাকে না। আস্তানা বদল করে বেড়ায়। গেণ্ডারিয়া পাড়ার চেনা ছেলেগুলোকেও আমার ভয় করে। বুঝে উঠতে পারিনে কে কোন দলে। ওরা কিন্তু নিজেরা ঠিকই জানে কে মুক্তিযোদ্ধা, কে দালাল, কে রাজাকার। এরমধ্যে শুনলাম মগবাজারে এক বাড়িতে রাতের বেলা তিন ভাইকে ব্রাশ ফায়ার করে ঘুমের মধ্যে শেষ করে দিয়েছে। যদি বলি এখুব খারাপ কাজ, কেউ কেউ বলে, "না, এটা খারাপ কাজ নয়। আজকাল বিচ্ছুদেরকে যারা ধরিয়ে দিচ্ছে, তারা বেইমান। তাদের খতম করাই ভালো।" কী সর্বনাশ! আমাদের ছেলেগুলোকে মিলিটারীরা ভাগিয়ে নিচ্ছে। আগে যারা ছিল দেশদ্রোহী, তারা রাজাকার হয়ে মোছুয়াদেরকে সাহায্য করছে।

তাইতো নভেম্বর মাসটাতে দেখতে পাচ্ছি দু'একটা চেলা–চামুণ্ডা বন্দুকধারীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ওরাই হয়তো তাদের নাম দিয়েছে, কিংবা অন্যেরা নাম দিয়েছে ওরা সেই হতভাগ্যদের চিনিয়ে দিচ্ছে। সেদিন ছিল ১২ই নভেম্বর। আমি স্কুলের টাকা নিয়ে সদরঘাট ব্যাংকে জমা দিয়ে স্কুলে ফিরছিলাম – সময় বেলা দেড়টা কি দু'টা হবে। সুত্রাপুর থানা পেরিয়ে লোহার পুলের উপরে উঠেছি, আমার রিক্সাচালক থেমে গেলো। সামনে চেয়ে দেখি পুলের ঢালের নীচে এক – দুই – তিন জন খাকী পোশাক পরা লাঠি দিয়ে নিষেধ করছে রিক্সাওয়ালাকে। বাঁদিকে নীচে একটা ছোট বদ্বীপের মত জমিতে গরীব লোকের বসতি। বর্ষায় দোলাইখাল ভরে গেলে বসতির দুয়ারে পানি ওঠে এবং গেণ্ডারিয়া থেকে পল্লীটা আলাদা হয়ে বদ্বীপের সৃষ্টি করে। এখন শুক্‌নার দিন। পুলের ঢালে নেমে পাড়ায় ঢোকার রাস্তাটা জেগে আছে। সেখানে প্রায় সত্তর আশি জন জোয়ান, বৃদ্ধ দু'হাত পিঠে দিয়ে উবু হয়ে পড়ে আছে। এসীমায় ও সীমায় বন্দুক হাতে খাকী পোশাক ওয়ালারা পাহারায় রত। আরো অনেকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি করছে বোধহয়। মেয়ে মানুষের সাড়া পাচ্ছিনে, বাচ্চাদের কান্নাও শুনছিনে। চারদিক নিশ্চুপ। আমি রিক্সা ঢালের দিকে নামাতে বললাম। গেণ্ডারিয়ার মাথায় 'রহমত' ফার্মেসীর কোনে আমার রিক্সা থামিয়ে দিল। আমি বললাম, "ব্যাংকে গিয়েছিলাম, স্কুলের কাজে। এখন স্কুলে যেতে হবে।" ওদের একজন কিছুদূর গিয়ে তেরাস্তার মোড়ে একজন সাদা হাফ্‌প্যান্ট–সাদা হাফ শার্ট পরা রুলার হাতে লোকের কাছে কি যেন বললো। সেই লোকটি ইশারা করে আরেক জনকে ডাকলো। সে মোড়ে এসে আমাকে চিনে বাঁ হাতে ইশারা করে আমার রিক্সাকে যেতে বললো। আমিও তাঁকে চিনলাম, তিনি 'রাজা' মিয়া। তিনি এখন ওদের সাগরেদ। মনে হলো কেশব ব্যানার্জী রোডে জেলে পাড়ায়ও তল্লাশি হচ্ছে। যাক্, আমি ওদের একখানা ধন্যবাদ দিয়ে স্কুলের দিকে মোড় ফিরলাম।

স্কুলে দাইরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওরা বললো, "জাউলা পাড়ায় সার্চ্চ না অইলে, যাইতে পারবেন না আপা।" ওদের বললাম, "কাল ডি. পি. আই. অফিসে মিটিং

আছে। সব স্কুলের হেড মাষ্টারদের যেতে হবে। কাল আমি স্কুলে আসবো না। নাজমা আপাকে বলে দিও।" আসলে কাল বিকেলে সাড়ে তিনটায় Urban Community Development এর মিটিং আছে ধোপখোলার অফিসে। সেখানে আর আসবো না।

১৬ তারিখে এ. জি. অফিসে গিয়ে ৩টা বিল জমা দিলাম। একটা চেক পেলাম। তারপর ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে স্কুলে গেলাম। বিশেষ রুটিন করে স্কুল চালানো হচ্ছে বলে সব টিচারকে স্কুলে প্রতিদিন আসতে হয় না। এর মধ্যে ১৭ই নভেম্বর গেণ্ডারিয়া সার্চ হলো ভালো করে। অবশ্য রিপোর্ট ওদের লিখিত এবং অলিখিত। অলিখিত রিপোর্ট পেয়ে নামা পাড়ায় গিয়াসউদ্দিন চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তিনি বলেছেন, "এই ছেলেগুলি পাড়ায় নাই। ঐ ঐ ছেলেগুলি সব ভালো। তারা সাতে পাঁচে নাই।" লিখিত চিঠি পেয়ে কয়েকজনকে ধরে নিতে এসেছে। সঙ্গে এনেছে ফেউ অর্থাৎ পাড়ার মস্তান। ওরা তো কাউকে চেনে না – তাই চিনিয়ে দিতে পাড়ার লোক লাগে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমাদের শিক্ষিকা ইফফাত আরার স্বামীকে নাকি ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারীরা। কেন ধরে নিলো? কি তাঁর দোষ? দোষ বের করতে কতক্ষণ লাগে? শেখ সাহেব যখন জুট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন নাকি তিনি তাঁর সেক্রেটারী ছিলেন। এই তাঁর দোষ। দুয়ারে দাঁড় করিয়েছে ইফফাত আরার আব্বা, দু'ভাই এবং তার স্বামীকে ও বোনের স্বামীকে। এর মধ্যে কার নাম আবুল হোসেন? ওরা তো আর চেনে না। চেনে তো পাড়ার লোকে। কোন আবুল হোসেনকে ওরা চায়? ওরা বলে, "ওই যে শেখ সাহেবকো সেক্রেটারী থা।" ওরা নিজেরা তো বলে না কিছু। তখন একজন পাড়ার চেলাকে ওরা জিজ্ঞেস করে করে বার করলো আবুল হোসেন কার নাম। মবিন আঙুল দিয়ে দেখালো। তখন ওরা আবুল হোসেন সাহেবকে ধরে নিয়ে চলে গেলো। মবিনের ভয়ে এখন পাড়ার লোক জড়সড়ো, কে জানে মবিন স্বেচ্ছায় লাভের লোভে ওদের চেলাগিরি করছে কিনা, না ওকে জোর করে ধরে নিয়েছে, তাই প্রাণের দায়ে চামচা গিরি করে বেড়াচ্ছে। কারণ পাড়ার লোকেই নাম দিয়েছে, পাড়ার লোকেই চিনিয়ে দিচ্ছে। তাইতো পাড়ার লোকে কেউ এদের খোঁজ নিতেও এলো না।

তাই তো লক্ষ্মী ফার্মেসীর জগন্নাথ বাবুর খোঁজ কেউ জানে না। সূত্রাপুর থানার উল্টো দিকেই তাঁর ফার্মেসী, সেটা এখন তালাবদ্ধ। তার আদি মালিক ডাক্তার ব্যানার্জি পঞ্চাশের দাঙ্গায় তাঁর নেপালী কম্পাউণ্ডার জগন্নাথকে ফার্মেসী দিয়ে চলে গেছেন। সেই থেকে জগন্নাথ বাবুই মালিক। ওখানেই সন্ধ্যায় বসেন ডাঃ মিস আজিজুন্নেসা। তিনিই সকলের অগোচরে জগন্নাথকে কোন গ্রামে লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর খরচ চালাচ্ছেন। ডাঃ আজিজুন্নেসাও এখন এ ডিস্পেন্সারীতে বসেন না, রোগী দেখেন না। তিনি তাঁর শহীদ ভাইয়ের মেয়েদের নিয়ে কোথায় যেন থাকেন। সে ভাইয়ের মেয়েরাও আমার স্কুলের ছাত্রী। তাদের বাড়ীর তেতলার দেয়াল এখনও শেল –এর আঘাতে ফোকলা হয়ে আছে। থানার উল্টো দিকেই এসব কাণ্ড করেছে দানবরা। থানা তো এখন ওদের অধীনেই। এইতো ফরাশগঞ্জে ঢুকেই ঐ বাড়িটা,

পুতুলওয়ালা বাড়ি বলে লোকে, আমাদের ছাত্রী স্মৃতি লেখাদের বাড়ি। কোথায় আছে ওরা? শেল মেরে সামনের মহলের একতলা দোতলার জানালা দরজার কী দশা। আগুনে পুড়ে আছে জানালা দরজা। ছাদের কোনায় আর সামনের মূর্তিগুলো হেলে আছে। কই সব বাড়িতো পোড়ায়নি। মনে হচ্ছে এ বাড়িতে লোক বাস করে। বিহারীরাই দখল নিয়েছে নিশ্চয়। লালকুঠীর উল্টো দিকে অনাথ আশ্রমের সেই পুরানো বাড়িটার বড় বড় জানালা দরজাগুলোও নেই। ওখানে বোধহয় বিহারীরা থাকে, বিরাট দরজা জানালায় চটের পর্দা দেওয়া । মনে হয় সব কিছু পোড়ায়নি মিলিটারীরা, বিহারীরা যেগুলো দেখিয়ে দিয়েছে সেগুলো ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে।

এ ভাবেই চলেছে দেশের হালচাল। মে, জুন, জুলাইতে যে ধারায় চলেছিল মুক্তিযোদ্ধারা, এখন তাদের আক্রমণের গতি প্রকৃতি বদলে গেছে। পাকিস্তানীদের দোসর আলবদর, আলসামস্‌রা গাঁয়েগঞ্জে যখন দহরম-মহরম চালায়, তখন বিচ্ছুরা শহরে চলে আসে। আবার খাকীরা যখন শহরে মুক্তিদের ধাওয়া করে, তখন ওরা গাঁয়ের বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়, নইলে ওদের ক্যাম্পে যায়। গাঁয়ে গ্রামবাসীরা ভয়ভীতি এড়িয়ে ওদের গোপনে গোপনে সাহায্য করে। আমার এলাকার ছেলেরা আমাদের এত ভয় পেতো, এখন মাথা তুলে কথা বলে না। হঠাৎ মোড়ের মাথায় সামনা সামনি পড়লে ছোট্ট একটি আদাব দিয়ে সরে পড়ে। বেশি কথা বললে ওদের অন্য পক্ষ সন্দেহ করতে পারে। ইফফাত আরার স্বামীর খবর পেতে কী যে কষ্ট। ওর স্বামীর এখন জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে। ওদেরও নিজের লোক ভেতরে আছে। তাদের সাহায্য পেতে পারে। হয়তো মবিনকে তোয়াজ করতে হবে। অনেক খড় কুটো পোড়াতে হবে। ইফফাত আরার যা মনের অবস্থা। ও তো স্কুলে আসতে পারে না।

আমার ডায়েরীতে লেখা আছে ১৯শে নভেম্বর রেডক্রস, কাঁচের চুড়ি, মিষ্টি, ফটো, মেশিনের তেল, হাসপাতাল। রেডক্রসের সঙ্গে হাসপাতালের সম্পর্ক থাকতে পারে, কাচের চুড়ির কি সম্পর্ক আছে? জেলীর বাসার জন্য গন্ধেশ্বরীর মিষ্টি হতে পারে। আর ফটো মানে আমার ও আমার মেয়ের জন্যে দু'কপি করে পাসপোর্ট সাইজের যে ফটো দরকার, তাই হবে। হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বন্ধু নয়তো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ফিজিওলজির প্রফেসর শহিদুল্লাহ সাহেব যুদ্ধের শুরুতে তো তিনি সপরিবারে ছিলেন অন্যের আশ্রিত, তাঁর স্ত্রীর বাচ্চা হবে। এতদিনে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। ওনাকে সঙ্গে নিয়ে একটু মর্গে যাবার ইচ্ছা আছে। আমার স্বামীর লাশটার কি হলো? আঞ্জুমান তো মুসলমানের লাশ ছাড়া অন্য লাশ নেয়নি। চিকবালি যে বলেছে, "আমাদের বাবুর লাশটা মর্গের কাছে কবর দিতে বলেছি।" আমার একটু ইচ্ছা ওদের রেকর্ডটা দেখার। শহিদুল্লাহ সাহেব না হলে সেটা দেখা সম্ভব নয়। তাও পরিচয় না দিয়ে।

ওহো! আজই তো ১৯ তারিখ। আমাকে তো সুধীর বাবুকে দেখতে নিয়ে যাবে সওয়ারীঘাটে। বেলা ১২টার মধ্যে আমি স্কুলে চলে গেলাম। বেলা দেড়টায় স্কুল ছুটি হলো।

মেয়েরা সব চলে গেল। অন্য সময়ে ছুটি হলে একটা আনন্দের লহর তুলে মেয়েরা যেমন বেরিয়ে যেতো, এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। টিচাররা যে যার মনে বাড়ি গেলো। ইফফাত আরার খবর কেউ দিতে পারলো না। পৌনে দু'টার দিকে হামিদ স্যার এলে আমি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। রিক্সা গেটে দাঁড়ানো। রব স্যার ও বজলুর রহমান আগেই এক রিক্সায় এগিয়ে গেছেন। হামিদ সাহেব ও আমি এক রিক্সায় উঠলাম। পেছনে একটু দূরে একা একা কে যেন রিক্সায় বসে আছেন।

রিক্সায় হুড দিয়ে চলেছি। সদরঘাট ও পাটুয়াটুলীর মোড়ে এসে সব রিক্সা কাছাকাছি হলো। দিনকাল ভালো থাকলে ডেকে কথা বলতে পারতাম। এখন যেন কেউ কাউকে চিনিনে। প্রথম রিক্সা আগ বাড়িয়ে সওয়ারীঘাটের মোড়ে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার রিক্সা মোড়ের মাথায় এলে হামিদ স্যার নেমে বাঁয়ে চলে গেলেন। আমি একাই রিক্সায় চড়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় বেশি লোকজন নেই। শুক্রবার দোকান বন্ধ করে বিহারীরা বাঙালীরা নামাজ পড়তে গেছে। পেছনে রব সাহেব কত দূরে আছেন চেয়ে দেখতে ভয় পাচ্ছি। কোন ছোট বেলায় এখান দিয়ে মামা বাড়িতে যেতাম নৌকায় চড়ে। এখন চিনিনে। একটু দূরে দেখলাম একটা বাড়ির সিঁড়ির নীচে হামিদ ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বাঁদিকে রিক্সা থামালাম। উনি দোতালায় উঠে গেলেন। আমি রাস্তা ক্রস করে পশ্চিম দিকের বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম। একটু পরে রব সাহেবও ঘরে ঢুকলেন। হেডমাস্টার সাহেব আমাকে দেখে আর নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে স্বভাবসিদ্ধভাবে 'হে' 'হে' করে হেসে উঠলেন। তিনি বসে আছেন একটা নতুন চৌকির উপরে নতুন তোষকে। আর গায়ে একখানা ওয়ার ছাড়া টুকটুকে লাল লেপ। দেখে এত দুঃখেও হাসি পেল। তিনি আমাকে দই মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সহকর্মীরা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাঁর রুমটার মধ্যে কোথাও আস্তর নেই। শুধু ইট সুরকির গাঁথনী। ইটগুলো দাঁত বের করে আছে। ঐ ছোট চৌকিতে সবাই বসে মিষ্টি খেলাম। খেতেই হবে, তাঁর বাড়িতে কেউ পেট ভরে না খেলে তিনি রাগ করেন। আমার মেয়ে তো তাঁর বাড়িতে কোন বিয়ে – সাদিতে নেমতন্ন খেতেই ভয় পায়। থপ্ থপ্ করে দু'পদের চারটা বড় মিষ্টি চোখের পলকে পাতে পড়ে গেল।

ঘন্টাখানেক পর আমার সঙ্গীরা আমাকে ইশারা করলেন। হেডমাস্টার তাঁর গ্রামের সাত মাসের অভিজ্ঞতা বলতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আমাকে উঠতে হলো। বললাম আর একদিন দিন আসবো। আপনার জন্যে গরম জামাকাপড় আনবো। ওনাকে সাহস দেবো কি, আমি নিজেই তো এ পরিবেশে আধমরা। একাই রিক্সায় চড়লাম ইন্দিরা রোড যাবো বলে। হামিদ সাহেব বেছে একটা রিক্সা ঠিক করেছিলেন। ওরা তো এখানে প্রায়ই আসেন, তাই ওরা কেউ আমার সঙ্গে এক রিক্সায় উঠলেন না। আগেই একজন মোড়ের মাথায় ছিলেন, তিনিই আমাকে বিদায় দিলেন। বাসায় আমার মেয়ে, জেলী

ও হাজারীকে—কাউকে এ অভিযানের কথা বলিনি। তাহলে আমার এ অতি সাহসের জন্যে হাজারীর কাছে বকুনি খাবো। রাতে শুয়ে ভাবছি সুধীর রায়ের গ্রামের খাওয়ার ফিরিস্তি। জমিদারের ছেলে হয়ে গ্রামে ছোটবেলায় যে ভাল ভাল খাবার খেয়েছেন, তা এখন পাবেন কোথায়। তবে প্রথম দিকে লোকে সাহায্য করেছে, আন্তরিকতা ছিল। পরে 'গোলমাল' গ্রামেও ছড়িয়ে গেল তখন গৃহবাসীরাও গৃহ ছেড়ে বনেবাদাড়ে গেল, শহরের অতিথিরাও আশ্রয় বদল করলো। এক পরিবার ভেঙে তিন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল। তখন তো আটা ময়দা গাঁয়ে অত পাওয়া যেতো না। সকালে চিতই পিঠা দুধে ভিজিয়ে, কোনদিন আখের রসে খাওয়া হতো। কখনও বড় একটা করে আটার রুটি খেতে হতো। চাল পেলে সিদ্ধ ভাত খাওয়া হত। সিদ্ধ খেতে লংকা লাগে, তেল লাগে। গাঁয়ের দোকানে এতো তেলও পাওয়া ভার। রান্নার তেল না পেলে সরষে বেঁটে মাছের সালুন রান্না হতো। গাঁয়ে হাতে পায়ে তেল মাখা লোকে ভুলেই গিয়েছে।

'সংগ্রামের' প্রথম দিকে গ্রামবাসী শহরের অতিথিদের খাবার ব্যবস্থা করতো। স্বর্ণর ভাষায় এটা সংগ্রাম – সকল অতিথি মিলেমিশে গ্রামবাসীদের কাজে সাহায্য করতো। অনেকে বলে এটা মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মানুষ পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারাও এসব গ্রামে এসে খেয়ে যেতো, খবর নিয়ে যেতো। এই ঈদের দিনে গ্রামের লোকেরা মেহমানদের সাধ্যমত ভালো খাবার দিয়েছে। সব গ্রাম থেকে আশ্রিত অনেক পরিবার ওপারে চলে গেছে। এখানেও কষ্ট, ওখানেও কষ্ট, তবে ওখানে জীবনের নিশ্চিন্তি আছে, এখানে তো জীবনের পিছে পিছে মৃত্যুর বিভীষিকা তাড়া করে চলেছে। গরীব–ধনী, ভালো মানুষ কারোরই নিস্তার নেই নরপশুদের হাতে।

এবার শহরে ঈদের জামাতও জমেনি। লোক তো বেশির ভাগ গ্রামে, নয়তো ওপারে আছে। যারা শহরে আছেন তারাও জানা মতে সবাই যাননি। যদি পথের থেকে টপ করে ট্রাকে তুলে নেয়। অনেকে, যাঁদের গ্রামের অবস্থা ভালো, তাঁরা ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেছেন। ইন্দিরা রোডের পাড়ায় কেউ ঈদের দিন খুব ভাল কিছু খায়নি, রাতের বেলা কয়েক বাড়িতে সবাই মিলে খিচুড়ি খেয়েছে। জেলী দোলার জন্য জামা, আমার জন্যে একখানা জমকালো কমলা রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি এনেছে। দেখেই আমার হাসি পেলো। এত জমকালো শাড়ি আমি যখন কিছুতেই পরবো না, তখন একটি ভাল সাদা জমিনে নীল কাজ সিদ্ধিরগঞ্জের গোলাপছড় পাড় শাড়ি দিলো। সেটা পরতেই হবে। ওর ছেলে তো কোলের। তার জন্যে আবার ঈদের জামা কি? আমরা নাকি মেহমান তাই নতুন কাপড় দিতেই হবে এবং আমারও নিতেই হবে।

সম্ভবত ঐ ঈদের আগেও আমার বড় ভাই আমাদের গনজাগা মারফত আমার চিঠি পেয়ে আমাকে স্কুলের ঠিকানায় চিঠি দিলেন। চিঠি প্রথমে কুয়েতে তাঁর মেয়ে সর্বানীর কাছে যায়। সর্বানী (কাবেরী) আবার সেটা পাঠায় আমাকে। তাতে দাদা লিখেছেন, "অরবিন্দ বাবু তোমাদের বই দুটা আবদুল ওয়াহাব নামের একজন সরকারী কর্মকর্তার কাছে রেখে

এসেছেন। তিনি আজিম পুরে ৫৪ নম্বর ফ্ল্যাটের তেতলার দক্ষিণে থাকেন। একটা আলনার নীচে জুতার বাক্সে। তাঁর দুই ছেলে অগ্রনী ব্যাংকে চাকরী করেন। বইদুটি পেলে তোমার সুবিধে হবে।" আমি জানি দুটা বই মানে পাসপোর্ট, আনন্দে আমি অস্থির।

সেদিন হাজারীর বাসায় ডঃ প্রফেসর ইব্রাহীম হেনরী সেলজ আর প্রাক্তন এ. জি (মহিলা) সেলিমা আহমেদ খাবেন। সেলিমা আহমেদ মাদ্রাজী, বাঙালীকে বিয়ে করেছেন। তাঁকে পাকিস্তান সরকার পাঠিয়েছেন দেশের হালচাল দেখতে, নির্যাতিত মহিলাদের কথা কতদূর সত্য! ওরা চলে গেলে আমি হেনরীর সঙ্গে আজিমপুর গেলাম। রিক্সায় যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে গেল, রোজার মাস, আজান হয়ে গেল। বেল টিপলে অরবিন্দবাবুর বন্ধু ভদ্রলোক দরজা খোলেন। আমি নাম বললাম। তিনি আমাকে বসিয়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে আসলেন, আমার হাতে দিলেন। সে অনেক কথা হলো। তিনি বললেন, "অনেক রিস্ক নিয়ে রেখেছিলাম। মিলিটারী এলে অসুবিধাই হতো।"

২৪শে নভেম্বর বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে ফোন করে আমার স্বামী যে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তাদের ইংরেজী বাংলা অভিধানের কাজ করেছিল, তার বিল কত হবে জেনে নিলাম, সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্যে এটা জানা দরকার ছিল। তারপর মতিঝিল ন্যাশনাল ব্যাংকের হেড অফিসে N.I.T-র কাগজপত্র জমা দিলাম। তাতে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেটও জুড়ে দিলাম। টাকা এখন পাওয়া যাবে না। যাই হোক, কাজ এগিয়ে রাখলাম। স্কুলে গিয়ে হেন্‌রিকে ফোন করে আমার খবর দিলাম, ওর খবর নিলাম। ঢাকা মেডিক্যালে ডাঃ শহিদুল্লাহকে ফোন করে মর্গে যাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করি। শুনলাম, এখন সম্ভব হবে না, আর আমার এখন ওখানে না যাওয়াই ভাল।

আমার তো সময় কাটে না। তাই স্কুলে শীতের ফুলের বেড তৈরী করানো, ডালিয়ার কাটিং করানো নিয়ে মালীকে ব্যস্ত রেখেছি। মরশুমি ফুলের চারা যোগাড় করতে হবে আমাকেই। জেলীকে নিয়ে পি. ডব্লিউ. ডি ও রমনা পার্কের নার্সারীতে যেতে হবে। রমনা পার্কের মোজাফফর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে আমার স্বামী, "ফুলের চারা, ফুলের বীচির জন্যে ওনার কাছে যাবে।" একদিনে তো সব চারা বোনা যায় না, তাই কিছু কিছু করে চারা আনতে হবে। নার্সারীর মালীরা চারা ঠিক সময়ে তুলতে পারেনি। অনেক কলম ও চারা নষ্ট হয়ে গেছে। পরের দিন আগে গেলাম সুরাইয়ার বাসায়। বেশ কয়েকদিন তো যাইনি। হেডমাস্টারের খবরও দিতে হবে খুলনা রাজশাহীর খবর পাওয়া যায় ওর কাছে। আর মশিউর রহমান সাহেবের সঙ্গে যদি ওখানে দেখা হয়ে যায়, তো কথাই নেই। উনি যেন মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্টার। জেনে হোক, শুনে হোক, আরম্ভ যদি করেন তবে মনে হবে যেন টেপে হয়ে কথা বলছেন।

শনিবার ২৭শে নভেম্বর জেলীকে নিয়ে সকালে ফুলের চারা গাঁদারাজ ও পেতি নিলাম। ছোট জাপানীগুলো দিয়ে হবে বেডের বর্ডার, আফ্রিকান মেরীগোল্ড দিয়ে দুটো বেড।

ডালিয়ার তৈরী করা কাটিংগুলো ম্যাচ করে মালি আগেই লাগিয়েছে। আজ শুধু বর্ডার লাগাবে। এমনি করে সোম মঙ্গলবারে সব চারা লাগানো শেষ করতেই হবে। যে সময়টায় ফুল কম সে সময়ে বোগেনভেলিয়া চার পাঁচ রকমের ফুল ফোটে। চার পাঁচটা আম গাছে মুকুলও আসছে। এবার বাঁদর বেশি আসে না। টমির মত বাঁদররাও গোলাগুলিকে ভয় পায়। টমি যেমন বন্দুকের শব্দ পেলে খাটের তলায় শুয়ে থাকে, তেমনি ছোট বড় সব বাঁদর 'গুলীর' শব্দে দল বেঁধে চোঁ চোঁ দৌড় দেয় পড়ি কি মরি। এমন মানসিক অবস্থায়ও আমরা হাসি।

মঙ্গলবারে ৩০শের সকালেই বোর্ড অফিসে, তারপর বিদ্যালয় পরিচালিকার অফিসে বেতনের চেকে প্রতিস্বাক্ষর নিয়ে ব্যাংকে বেতনের টাকা ভাঙিয়ে, রসিদ টিকেট কিনে স্কুলে এলাম। পাড়ার কেউ কেউ বলে ভদ্র মহিলা এত একলা ঘোরেন কেন? স্কুলে কি আর শিক্ষিকা বা শিক্ষক নেই? তাঁরা তো বাইরের কাজ করতে পারেন। আসলে মেয়েরা কেউ স্কুল বাড়ি ছাড়া কোথাও যাওয়া আসা করেন না। পুরুষরা কেউ কেউ টিউশনি করেন। তাছাড়া আমি তো নভেম্বর মাসে সেই ইন্দিরা রোড থেকে ধামমণ্ডি, সেগুনবাগিচা, মতিঝিল ঘুরেই আসি, এতে স্কুলের রিক্সা ভাড়াটা বেঁচে যায়। আর এখানে সেখানে টুঁ মারলে গল্প গুজব ও শোনা যায়। মনটা তো ভেতরে চঞ্চল।

যাক বেতনের টাকা, রসিদ, টিকেট, স্কুলের চারা যত্ন করে প্যাকেট ভরে এবং অলিভ অয়েল কিনে স্কুলে গিয়ে টাকা বজলুর রহমানকে দিয়ে আমি মালীর সঙ্গে বাগানে কাজ করতে লেগে গেলাম। টিচাররা বেতন নিয়ে সবাই চলে গেলে স্কুলটা নীরব হয়ে গেল। মালীও খেতে চলে গেল। আমি স্বর্ণর রান্না খেয়েই চারা নিড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ সাইরেন বাজতে লাগলো। আমতলায় থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম বুড়ীগঙ্গার দিক থেকে একটা ফাইটার প্লেন উত্তর দিকে ধাঁ করে গেল। ভীষণ শব্দ হলো। প্লেনটাতে বোধহয় আগুন ধরলো। আমি তো আকাশের দিকে চেয়েই আছি। সাইরেন থেমে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরে দেখি উত্তর থেকে এয়ারপোর্ট বা ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে একটা সবুজ রংয়ের বলের মত কী যেন বাতাসে ভেসে দক্ষিণে যাচ্ছে—ক্রমেই নীচের দিকে নামছে ধীরে, ধীরে।

পয়লা ডিসেম্বর একটা বিশেষ দিন আমার জন্যে। বেলা দশটায় আমাকে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কোর্টে যেতে হবে হলফ্ করার জন্যে। কোথাও ভিড় না থাকলেও কোর্টে ভিড় ঠিকই আছে। ঠিক দশটায় মাথায় ঘোমটা টেনে পর্দানশীন বৌদের মত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে দক্ষিণের বারান্দার ভিড় ঠেলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছি, এর মধ্যেই কোন কোন চেনা মানুষ আমাকেও চিনে ফেলল। আমাকে যিনি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি একজনের কাছে গিয়েই বললেন, "এই যে ইনি। এঁনার হলফটা করিয়ে সই নিন।"

তাঁকে পাঁচটা টাকা দিতে বললেন। টাকা দিতে গেলে তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। বললেন, "না, না। সেকি আপনি আমাকে টাকা দেবেন? দাদার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি জোর করেই তাঁর প্রাপ্য টাকাটা দিলাম। পশ্চিমের বারান্দায় হলফ করছি,

তখন ডাক্তার ওয়াহিদ এসে বললেন, "সেকি! ওনার মুসলিমের আইনে কেন সার্টিফিকেট লিখেছেন? হিন্দু আইনে লিখবেন।" কোন কোন জায়গায় বদলাতে হবে তিনি বলে দিলেন। আমার কাজ শেষ হলে আমি সদরঘাটের ফুটপাথের থেকে দাইদের জন্যে শীতের চাদর কিনে, দোকান থেকে 'আবোল তাবোল', সুনির্মল বসুর ছড়ার বই কিনে স্কুলে গেলাম। হামিদ স্যার এসে জানালেন, আমাদের কাল সওয়ারীঘাটে যাওয়া হবে না। আমরা ৪ তারিখে যাবো।

৩ তারিখে সন্ধ্যা বেলায় হাজারীর প্রতিবেশী বন্ধু বাসায় এলেন। হাজারীর কয়েকটা বই ছিলো ওনার কাছে, দিয়ে গেলেন। আর ওনার একটা বই হাজারীকে উপহার দিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, "আপনার ইন্দিরা গান্ধী এটা কিন্তু ভাল কাজ করলেন না।" আমি বুঝতেই পারলাম না উনি আমার উপরে এত চটা কেন? ইন্দিরা গান্ধী আমার কে? পরে বুঝলাম উনি পাকিস্তানের শেষ ফ্লাইটে পশ্চিম প্রান্তে চলে যাচ্ছেন গুলশানের সাধের বাড়ি ফেলে। খুব শিগগিরই একটা কিছু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার ভয়-ভাবনা অনেক কমে আসছে। এপ্রিল মাসে যে চাঞ্চল্য, যে অস্থিরতা ছিল মনে এখন যেন সেটা কমে আসছে। ঢাকায় বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বাইরের যুদ্ধের বেগ বেড়ে যাচ্ছে। ঢেউটা কেন্দ্র বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে কিনারে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে জমে উঠেছে যুদ্ধ। দু'ই তারিখে হেনরীকে দু'বার ফোন করেও পাইনি। তিন তারিখে সকালেও না। তখন জেলীকে নিয়ে P.W.D নার্সারী করিম ভাইয়ের সবুজ বনানীর নীচে বসে আড্ডা দিতে দিতে ফাইটার প্লেনগুলোর দৌরাত্ম লক্ষ্য করছি। স্মৃতিচারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে রেডক্রসের অফিসে গেলাম হেনরীর খোঁজে। দুপুরের রান্না খাবারের পরে গল্প জমছে না। হাজারীরা তাদের বৌদিকে এখন অন্যভাবে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করে। আমাকে দিয়ে রান্না করানোর উদ্দেশ্য যে আমি বুঝে ফেলেছি, সেটা ওরা জানে। বিকেল চারটায় হোস্টেলে গিয়ে দু'চারটা জামা কাপড় নিয়ে এলাম। সন্ধ্যা রাতে ডায়েরীতে লিখলাম – ৪ তারিখে সকাল ন'টায় ডাক্তার ওয়াহিদের বাড়ি। ১০-৩০ মিনিটে কোর্টে, ১২টায় ব্যাংকে, ১টায় সুধীর বাবুর জন্যে গরম স্যুট নিয়ে যাওয়া সওয়ারীঘাটে।

রাতের খবরের পরে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা শুনে হাজারী ও জেলী বিছানায় গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন কলকাতায় এক বিরাট জনতার কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি করে দিল্লী গিয়ে মিটিং করে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সে যুদ্ধের জের ৩রা ডিসেম্বরে, রাত একটার পরে ঢাকায় এসে লাগলো। সবাই ঘুমিয়েছে আমারও চোখ লেগেছে, হঠাৎ শুনি এ্যান্টি-এয়ার ক্রাফটের শব্দ – শব্দ মানে ভীষণ শব্দ। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে। আমি সিঁড়ি কোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আগুনের ফুলকি আকাশে উঠছে। এত ফুলকি এত উজ্জ্বল – আকাশ আলোকিত! এত শব্দ এক সঙ্গে তুবড়ি বাজীর মত

আকাশ পানে ছুটছে, এতো কোন দিনও দেখিনি। দিনের বেলায় এ্যান্টি এয়ার ক্রাফটের শব্দ শুনেছি বলেও মনে হচ্ছে না। ভয়ে হাজারী ও জেলীকে ডাক দিলাম। ওদের কি আর ঘুম ভাঙে? দোলাকে ঠ্যালা দিলাম। ওরা সবাই জাগলো। হাজারী বললো, "যুদ্ধ লেগে গেছে। কিন্তু আমাদের করার কিছু নেই।" জেলী বাচ্চা কোলে নিয়ে বিছানায় বসে থাকলো।

যুদ্ধ তো তাহলে হবে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে। এখানে তো ফাইটার ছিল চারখানা। পাখা ভেঙে বিকল ছিল দু'খানা। এখন কটা জানি নে। বোম্বার প্লেন কটা আছে জানিনে। ভারত তো আক্রমণ করছে। আমরা ওদের বাধা দিচ্ছি। আমার স্বামী বলতো "আধুনিক যুদ্ধে যে আগে এয়ারপোর্ট দখল করতে পারে, তারপর রেডিও আর টেলিভিশন, তারই জয়।" তাই বোধহয় প্লেনগুলো একই পথে ধাওয়া করে এয়ারপোর্টে বারবার বোমা ফেলছে। আমি একই ঘুলঘুলি দিয়ে আগুনের গোলা দেখছি। মাঝে মাঝে বিরতি যাচ্ছে। আবার যখন প্লেনের শব্দ হচ্ছে শোঁ শোঁ করে, এ্যান্টি এয়ারক্রাফট চলছে ঘড় ঘড় ঘড়। এমনি করে ভোর হলো। কেউ বাইরে যেতে সাহস করছে না। দালান কাঁপছে ক্ষণে ক্ষণে। জেলী সিঁড়ি কোঠায় মেঝেতে একটা লেপের স্তূপে বসে বাচ্চা অন্তুকে লেপ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। আটটার দিকে বাবুর্চি এনে চা দিলো এককাপ। চা খেতে বেলা ন'টা বাজলো। ঘড়ড়-ঘড়ড় শব্দে নিশ্চিন্তে চা খাওয়া যাচ্ছে না। ডিস্, কাপ শক্ত করে ধরে কোন রকমে চা শেষ করলাম। ৯টার পরে ঘন্টা খানেক বিরতি গেল। তবুও রান্না খাওয়ার কথা কারো খেয়াল হলো না। কি করতে হবে, কি করণীয় পাড়া ছেড়ে চলে যাবে কিনা – দিশা পাচ্ছে না। এমন সময় আরেকটা প্লেন এলো, সেটা এয়ারপোর্টের কাছেই কোথাও পড়ে গেল, আগুনের ধোঁয়া আমরা বাসা থেকেই দেখছি।

দিনের বেলায় দেখতে পেলাম প্লেন সোজা এয়ারপোর্টের দিকেই যাচ্ছে। আগুনের গোলা দিনের আলোয় চোখে পড়ছে না। বেলা ১১টার দিকে গেটে গাড়ির হর্ণ শুনে দৌড়ে এলাম। দেখি হেনরী আরো একজন সাহেব, মুখ ভর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের মত দাড়ি। পরে জেনেছি তাঁর নাম বার্নাড। হেনরীকে দেখে মনে বল এলো। হেনরী বললো, "এক ঘন্টা ধরে চেষ্টা করছি তোমাদের গলিতে ঢুকতে, কিন্তু পারছিনে, দু'টো খাকী পোশাক পরা বন্দুকধারী পথ রোধ করে আছে। তখন বার্নাডকে নিয়ে ঢুকলাম। হেনরী পরিচয় দিলেন, "এ আমার বন্ধু UNICEF-য়ে আছে।' বন্ধুটি দু'আঙুল তুলে বললো, "শান্তি। শান্তি।" তখন বুঝলাম সেও কোয়েকার। হেনরী তো আমাদের ও হাজারীদের নিতে এসেছে। কিন্তু জেলী বললো, ময়না হাসান তাঁদের বাসায় যেতে বলেছেন ইস্কাটন গার্ডেনে লুলু বিলকিস্ বানুর বাড়িতে ভাড়া আছেন তিনি। জায়গাটা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের পাশে নিউট্রাল জোনের মধ্যে। দোলাকে ও আমাকে নিতে চাইলো। জেলীরা তাঁদের আশ্রিত হয়ে যাচ্ছে, আমরাও আশ্রিত। আমরা হেনরীর বাসায় যেতে রাজী হলাম। হেনরী জেলীর আত্মীয় স্বজন সবাইকে সাহায্য করতে চাইল। তারা যে যেখানে যেতে চাইল, হেনরী তাদের সেখানে পৌঁছে দিল। এদিকে জেলী তার গাঁট ও পোটলা পাটলি গুছিয়ে নিলো। এরপর দোলাকে ও আমাকে হেনরী তার

বাসায় রেখে, জেলীদের পৌছে দিতে গেল। আমরা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সামনে সবুজ লনের তিন দিকে ফুলের বেড়ে শীতের ফুল হাসছে। সামনের বারান্দার নেটে ঝুলছে দুতিন রঙয়ের বোগনভেলিয়া। পশ্চিমে এক সারি নারকেল গাছ। গেটের কাছে দেয়ালের ধারে একটা ক্যানভাসের গোল ক্যাম্পের মত। আমরা দুজনে গিয়ে ড্রইং রুমে বসলাম। ভাবছি কোথা থেকে কোথায় এলাম। ইন্দিরা রোড থেকে এই ধানমণ্ডি ২৮ নম্বরে (পুরান), তাও মীরপুর রোডের কাছেই খুব। লাভ কি হলো? দোলা বললো, "হেনরী বলেছে আক্রমণের লক্ষ্য হলো এয়ারপোর্ট আর ওদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে না।"

বেলা দুটোর দিকে হেনরীর গাড়ি ফিরে এলো আরো পাচজন সিষ্টারকে নিয়ে। সবাইকে কোল্ড ড্রিংকস দিলো মালী, বাবুর্চি ট্রেতে স্ন্যাকস্ নিয়ে এলো। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। যা পেলাম, মনে হলো অমৃত খেলাম। সিষ্টার টেরেসা, মেরী জোনস্ আর বটমলি হোমের তিনজন সিষ্টার সবাই দোলাকে হ্যালো করলেন "হ্যালো মণিকা, হাউ আর ইউ?" আমি বললাম, "মনিকা তো তোমাদের আশ্রয় থেকে এসে আরো চারটি আশ্রয় বদল করেছে। দেখা যাক্ কোথায় গিয়ে শেষ হয়।" সবাই হেসে উঠলো।

বিকেলের চা খেয়ে ওরা বিদায় নিলেন। ওরা কোথায় গেলেন জানিনে। তবে হোমের ছেলে মেয়েদের বোধহয় নটরডেম কলেজে রেখেছে। রাতে ফিরে এসে হেনরী আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলো। লম্বা বারান্দার মধ্যের ঘর, উত্তর দক্ষিণে জানালা খোলা। বললো, "রাতে দরজা বন্ধ করবে, জানালা বন্ধ করবে না। বোমার শব্দে কাঁচ ভাঙলে আঘাত পাবে।"

বাড়িটা 'এল' প্যাটার্নের। ড্রইং রুম খুব বড়। দক্ষিণ দিকে পুরোটা দেয়াল কাচের তারপর চিক্। ভেতরে গাঢ় রঙয়ের মোটা পর্দা দিয়েছে ব্ল্যাকআউটের জন্যে। রাতে ডিনারের আগে (আজ থেকে আমরা লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাষ্ট বলি সাহেবের অতিথি তো) দোলা হেনরীকে বলছে, "হেনরী, কাল থেকে বাংলা শেখাবো তোমাকে, আর জাতীয় সঙ্গীত ও শিখতে হবে।" হেনরী হাসলো। দোলা কিন্তু সিরিয়াসলি বললো কথাটা। আমরা উত্তেজনায়, আর হেনরী অনেক কাজ করে ক্লান্ত ছিলাম। তাই একটু আগেই শুতে গেলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছি কি হয়ে গেল। ডায়েরীতে লেখা চার তারিখের প্রোগ্রাম সব ওলট পালট। সওয়ারীঘাটে নিয়ে সুধীর বাবুকে আর গরম স্যুট দেওয়া হলো না। শীত এসে গেছে আবার হয়তো গ্রামে চলে যাবেন। রাতেও কয়েকবার বোমা পড়লো এয়ারপোর্টের দিকে, রানওয়ে খতম করে দেয়াই ওদের উদ্দেশ্য।

৫ তারিখের সকাল হলো। আমরা ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গল্প গুজব করছি। দোলা গাইলো

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি।"

এদু' লাইন গেয়ে হেনরীকে তালিম দিতে লাগলো। আজকের সকাল ঠিক ২৬শে মার্চের সকালের মতো নয়। এর মধ্যে যেন ভয় কম। বাড়ির ছাদে লোকে উঠছে, ভয় পাচ্ছে না। অফিস কাচারিতে লোকে যাচ্ছে মনে হলো না। তবে বলা হয়েছে সাইরেন বাজলে কেউ রাস্তায় থাকবে না। স্কুল-কলেজ হবে না। আমিও আজ রবিবার যাচ্ছিনে। হেনরী বাইরে যাবার সময়ে একটা 'হবি'র বই দিয়ে গেল। নিজে হাতে CARE -য়ের ব্যাজ্ বেঁধে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তখন ড্রইং রুমের চার দেয়ালে সাজানো কাঠের মূর্তিগুলো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বেশির ভাগই আফ্রিকার। হবেই তো। হেনরী তো নাইরোবী থেকেই এখানে এসেছে। দোলা আমার ডায়েরীতে দু'টা মেয়ের ছবি আঁকলো। তারপর ক্লান্ত হয়ে 'হবি'র বই নিয়ে বসলো।। আমি লনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে নারকেল গাছের ছায়ায় পায়চারি করছি এমন সময় পাশের বাড়ির মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। চাইবেন-ই তো। এই আমেরিকান সাহেবের বাড়িতে কোন মেয়ে মানুষ নেই, হঠাৎ দু'জন বাঙালী মেয়ে কোত্থেকে এলাম। উনি বাংলায় প্রশ্ন করলেন, আর আমিও গল্ গল্ করে পেটের কথা, সব ইতিহাস বলে দিলাম। পরে মালীর কাছে জানলাম উনি বিহারী, কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার। হেনরীর বাড়ির পূর্ব পাশে এক বাঙালী এক ব্যাংকের ম্যানেজার, তিনি আবার দালাল। মালীর কথায় আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

বেলা একটার দিকে হেনরী বার্নাডকে নিয়ে এলো। বাবুর্চি এনে 'স্প্রাইট' দিলো। বার্নাড দু'আঙুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় "Shanti, Shanti,' আমিও বলি, "আমরা পীস্" চাই। একসঙ্গে চারজনে লাঞ্চ খেলাম। হেনরী বললো, "বার্নাডের ঘরটা তোমাদের দেখিয়ে দিই চলো।" ঘরটা হলো অষ্টভুজের একটি ক্যানভাসের ঘর, মানে ক্যাম্প। ঘরে একটিই দরজা, যে পথে ঢুকবে সে পথেই বেরুতে হবে। ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের পরে 'ইউনিসেফ' এ ধরনের ক্যাম্প তৈরী করছে সমুদ্র পাড়ের বাসিন্দাদের জন্যে। ঘরের উপরে কাড় আছে। বিপদের আশংকা দেখলে মাল কাড়ে বেঁধে রেখে, খুঁটির দড়ি খুলে দিয়ে বাসিন্দারা উপরে চলে যায়। ঢেউ ফিরে গেলে আবার ফিরে আসে। বাগানের এককোনায় চরের অধিবাসীদের পাকা গাঁথুনির ঘরের নমুনা তৈরী হয়েছে। সিমেন্ট, বালু ও মাটি দিয়ে ১০ ইঞ্চি ইট তৈরী করে দেয়াল গাঁথা হয়েছে। এ ইট পোড়াতে হয় না। বার্নাডের কারসাজি দেখে আমরা কফি বা চা খেতে গেলাম।

পরের দিন সোমবার স্কুলে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়ির ডাইনে বাঁয়ে রাজাকার আর বিহারীর মধ্যে দোলাকে একা কেমন করে রেখে যাবো? হেনরী বললে, "চলো হাজারী, জেলীদের দেখে আসি।" আমি খুশি হয়ে উঠলাম। এর মধ্যে সাইরেনও বাজছে, বোমাও পড়ছে। তবুও ভয় হচ্ছে না। চলে গেলাম হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের পাশে ইস্কাটন গার্ডেনে যেখানে লুলু বিলকিস্ বানুর বাড়িতে জেলীরা ময়না হাসানের আশ্রিত। হেনরী আমাদের ওখানে রেখে টহল দিতে গেল। দুয়ারে ট্রেঞ্চ কাটা, আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চের মধ্যে আট

দশ বছরের ছেলেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। আমরা দেখছি। জেলী এক ঘরে কয়েকটি কাপড়ের গাঁট নিয়ে বসে। গাঁট তো যেন ধোপার বড় বড় গাঁট। জেলী ওখানে কাজে ব্যস্ত। হাসপাতালে ডিউটি দেয়। রেডক্রসের চেয়ারম্যানের স্ত্রীও জেলীর সাথে সমাজসেবা করছেন। ওখানে নার্সের সংখ্যা খুব কম। এদিকে প্রচুর আহত ব্যক্তি আসছে হাসপাতালে নিউট্রাল জোনে।

পরের দিন ৭ তারিখে ভাবলাম স্কুলে যাবো, ঢাকাবাসীর মনোবল ফিরে আসছে। লোকে রাস্তায় বেরুতে ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু দোলাকে একা রেখে যেতে সাহস হচ্ছে না। তাই স্কুলে ফোন করে দিলাম। ওখানে ভয় নেই। মিলিটারী গাড়ি যায় না। এদিকে কয়েকটা মুড়ির টিনের মত বাস মাটি ও সবুজ রঙ মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশী পরিবার এখনও যারা আছে, তারা হোটেল ইন্টারকনে আশ্রয় নিয়েছে। তার মানে যুদ্ধের খবর বাইরে ছড়িয়ে গেছে। হেনরী অফিস কি করে জানিনে তবে রেডক্রস আর নিউট্রাল জোনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘর থেকে বেতের টেবিল লনে এনে চেয়ারে বসে আমরা ছবির বই থেকে Bird watching পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে আমি আমাদের পুরানো বন্ধু ৮৫ বছরের বুড়ো 'হরেস আলেকজাণ্ডার'-এর গল্প করছিলাম। তিনি কোয়েকার, নিরামিষ ভোজী, পাখি দেখা তাঁর নেশা। কিন্তু শিকার তিনি করেন না। ৬০-এর দশকে প্রথম দিকে ঢাকায় ক্রেণ্ডস সেন্টারে এসেছিলেন। তখন সুন্দরবনে গিয়েছিলেন পাখি দেখার বিহারে। জঙ্গলে গিয়ে লঞ্চ ছেড়ে নৌকায় ভেসে বেড়াতেন নিঃশব্দে, যাতে পাখি উড়ে না যায়। বুড়োর সারা গায়ে ভারী চামড়ার ভাঁজ হাসলে পরে মুখের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে পবিত্র হাসিটি ছড়িয়ে পড়তো। আর তার নীল চোখের জ্যোতি আকাশের নীলে মিশে যেতো। দোলা এত কাব্য কথা শুনে বইয়ের পাতায় মন দিলো।

হেনরী এলে মালী আমাদের ড্রিংকস্ দিলো, হেন্‌রী ঘর থেকে ওর ছোট দুরবীনটা নিয়ে এলো। আমরা আকাশের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা রকমের উড়ন্ত পাখির গতি দেখছি। সকাল বেলায় মাত্র দু'বার বোধহয় বোমারু প্লেন এসেছিল। অনেকক্ষণ কোন প্লেন আসছে না। এর মধ্যেই দোলা বললো, "মা, দেখ। অনেক উঁচুতে তিনটা পাখি একই তালে উড়ে বেড়াচ্ছে।" আমি ওর হাত থেকে দুরবীণটা ছিনিয়ে নিয়ে একটু দেখে নিলাম। হেনরীকেও দিলাম। হেনরী বললো, "এ তিনটা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ২৯ নম্বরে ছাদে বার্নাডও আকাশের দিকে চেয়ে প্লেন দেখছে। হেনরী তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা দু'জনে Bird watching করতেই থাকলাম। ক্রমেই প্লেনগুলো একটু করে বড় দেখাচ্ছে, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চেয়ে দেখি বার্নাডও ছাদে নেই। ওরা নিশ্চয়ই রেডক্রসের অফিসে গেছে। ঠিকই আধঘন্টার মধ্যে ওরা ফিরে এলো। তিনটা প্লেন ঘন্টা ধরে আকাশ সীমায় উড়ছে নামার অনুমতি পাচ্ছিল না। কোন রকমে লাঞ্চ নিঃশেষ করে হেনরী আবার চলে গেল। আমরা সেই যন্ত্রের পাখি তিনটিকে পরখ করে দেখছি। ঘন সবুজ রঙয়ের পেট মোটা মিলিটারীপ্লেন,

পেটের নীচে বড় চক্কর হলুদ ও কালো রঙয়ের। ঢাকা শহরের চারদিক দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে প্লেন তিনটি নীচে নামছে, এখন প্লেনের গতির শব্দ একটু করে বাড়ছে। এভাবে প্রায় আধঘন্টা চললো। তারপর ঠিক মীরপুর রোডে উপর দিয়ে পর পর ওরা এয়ারপোর্টের দিকে নামলো। তার পনের বিশ মিনিট পরে প্লেন তিনটি পূর্ব দক্ষিণে গিয়ে ঘুরে গেল। এর সাত–দশ মিনিটের মধ্যে আবার সাইরেন, এ্যান্টি – এয়ারক্রাফ্ট গান। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা বম্বার প্লেন রানওয়ে আবার নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল। আবার সব নীরব।

হেনরী ফিরে এলো কুকুর 'ইউকি' কে নিয়ে। জন এখন কলম্বো না কোথায় যেন থাকবে, সুবিধে মত ফিরে এসে ওকে নেবে। 'ইউকি' এখন আমাদের মত হেনরীর আশ্রিত।

আট তারিখে বুধবার দোলাকে সুরাইয়ার ওখানে রেখে আমি একবার স্কুলটা ঘুরে এলাম। মালী যেন ফুলগাছের যত্ন নিয়মিত করে, দাইরা তাকে যেন সাহায্য করে। এ পাড়ায় কোন ভয় নেই। মাসীমার সঙ্গে দেখা করে স্বর্ণকে প্রয়োজনী উপদেশ দিয়ে এলাম। গোপাল আসতে না পারলে যেন দাইদের দিয়ে বাজার করায়। সুরাইয়ার বাসা থেকে দোলাকে নিয়ে লাঞ্চের আগে হেনরীর বাসায় ফিরে এলাম।

এখন আমাদের চেয়ে বেশি খবর জানে হেনরী, বার্নাড, জন, ডেভিডরা। কারণ ওরা রেডক্রসে যায় দিনে দু'তিনবার। মনে হয় যুদ্ধ বেশ জমে উঠেছে। মশিউর রহমান সাহেব তাঁর গুলশানের বাড়ি থেকে গভীর রাতে কামানের গুমগুম শব্দ শুনতে পান, আর তাঁর বুক নাকি দুলে ওঠে। হেনরী রাতের খাবার টেবিলে বললো, "বাসন্তী, তুমি কি ডাঃ মালেকের মেয়েকে গভর্নর হাউস থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারবে?" আমার বুকটা কেঁপে উঠলো, কিন্তু জোর দিয়েই বললাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু আমি তো তাকে চিনিনে।" হেনরী বললো, "তোমার কোন চিন্তা নেই। সে মেয়ের তোমার মত বড় চুল, আর চুল তার কালো। তুমি CARE বা Red Cross–এর গাড়িতে যাবে, আর সে মেয়ে শাড়ি পরে তোমার সঙ্গে চলে আসবে। তোমাদের পাশের রুমে একটি কট্ আছে। তার ঘর সাজিয়ে দেবো। ওখানে একটা ইস্তিরি করার টেবিল আছে, ওটা সরিয়ে দেবো।"

এমন দিনেও আমি ভাবছি, "হায়রে! আমাদের গভর্নরের মেয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে?" সে অসহায়। মানবিক কারণেই আমি তাকে উদ্ধার করতে যাবো। পরের দিন বার্বুর্চি দেশের বাড়িতে গেল দু'তিন দিনের জন্যে। হেনরী বললো, "তুমি বাজার করতে পারবে?" যদিও নিউ মার্কেটের কাঁচাবাজার আমি চিনিনে, তবুও বললাম, "হ্যাঁ, খুব পারবো।" আমাকে নামিয়ে দিয়ে ও রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখলো। আমি ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে করে ঠিক গেলাম। অনেক হিসাব করে, বাইন মাছ, মুরগী, খাসির গোশত আর তরিতরকারি কিনলাম যা দিয়ে লাবড়া রান্না করা যাবে। লাবড়া সবাই পছন্দ করে। দু'শ টাকার মধ্যে এতকিছু কিনেছি দেখে হেনরী খুব খুশি। কোন দিন বাজার করিনি ; তার উপরে পরের টাকায়। তাই অনেক হিসেব করেছি। গেণ্ডারিয়ায় যেতে পারলে তো দু'টা আইটেম রেঁধে আনা যেতো। যাক্। যা রাঁধলাম দু'তিন দিন খাওয়া যাবে ভালো করে।

বিকেল বেলায় নিউট্রাল জোনের পাড়ায় বেড়াতে বেরুলাম, ইউকিও সঙ্গে। রাতে খাওয়ার সময় গভর্নরের মেয়ের কথা উঠলো। ঠিক হয়েছে সে এখানে আসবে না। এ জায়গা তার জন্য যথেষ্ট নিরাপদ নয়। সে রাতে আমরা ঘুমিয়েছি। বোমারু প্লেনের শব্দ হতেই তো সাইরেন বাজে, ব্ল্যাক আউট তো আছেই। আমরা মোম জ্বালিয়ে খাই, তাও রাতের প্রহরীরা ফাঁকা আওয়াজ করে, নয়তো গেটে বাড়ি দেয়। হেনরীকে আর জাতীয় সঙ্গীত শেখানো হচ্ছে না।

পরের দিন দিনের বেলায় দু'বার যে বোমা পড়লো সেগুলো মনে হয় পেট্রোল পাম্প বা পেট্রোলের ট্যাংকে পড়লো। আগুন ধরলো যে কয়েক ঘন্টা ধরে কালো ধোঁয়া বেরুতে থাকলো। আমাদের এখান থেকে দিনের বেলায় বোমা পড়া দেখতে ভারী মজা। আমাদের কারো বাড়িতে, কারো গায়ে পড়ে না বলে আরো মজা। প্লেন ধাঁ করে উপর থেকে এয়ারপোর্টের দিকে নেমেই 'ভি' সেপ-এর মত শোঁ করে উপরে চলে যায়। রুপালী প্লেন সূর্যের আলোকে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর আমরা দেখি প্লেনের নীচ দিয়ে একটা রুপালী বেলুনের মত নেমে আসতে আসতে বড় হয়ে যাচ্ছে, বোমা ফাটাটা আমরা দেখতে পাইনে। সে রাতে মধ্যরাতের পরে একটা প্লেন বেশ নীচু দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে,সাইরেন বাজছে না। এ্যান্টি এয়ার গান চলছে না। হবে হয়তো পাকিস্তানের ছ্যাকড়া কোন প্লেন। ভয় হলো এটা ছ্যাকড়া লরীর মত যেখানে সেখানে টুঁশ করে পড়তে পারে। ঠিক তিন-তিনটা বোমার শব্দ হল, তারপর কোন সাড়াশব্দ নেই। আশেপাশে কোন বাড়িতেই মানুষের রা পেলাম না। অনেকেই হয়ত আমার মত জেগে বিছানায় পড়ে আছে। পরের দিন সকালে বটমলি হোমের সিষ্টাররা এলে জানতে পারলাম এ ঘটনা তেজগাঁয়ে ঘটেছে। মহম্মদপুরে একজন ফাদার থাকেন। তিনি ছাদে উঠে দেখেছেন ঔষধ দেয়ার হলুদ রঙয়ের প্লেন ঐ দিকে ঘুরছিল, বোমা ঐ দিকেই পড়েছে। এদিকে কাগজে উঠেছে ভারতের প্লেন থেকে বোমা ফেলে তেজগাঁর 'এতিমখানার' বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, অনাথ ছেলেমেয়েগুলো শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীর সব দেশে এ খবর ছড়িয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কি নিষ্ঠুর নির্মম ব্যাপার! ভাগিস সিষ্টাররা তাঁদের অনাথদের আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। দোলাও তো ওখানে ছিল একমাসেরও বেশি। সিষ্টাররা এসে এসব খবর দিলেন।

এগার বার তারিখে এমন কি কারফিউর সময়ে আমরা কারফিউ অমান্য করে CARE-এর গাড়িতে ঘুরেছি। হেনরী হাতে CARE লেখা ব্যাজ পরে আমাদের নিয়ে Neutral Zone ঘুরে বেড়াতো। ও যখন বেরুতো আমার মা মেয়েকে বাসায় রেখে যেতো না। হোটেল ইন্টারকনের নীচে গাড়িতে 'ইউকি'কে নিয়ে আমরা বসে থাকতাম, হেনরী অফিসে গিয়ে নতুন খবর নিয়ে, বন্ধুদের দেখে আসতো। এটাই হলো শান্তির রাজ্য, ছাদের উপরে 'শান্তি পতাকা' উড়ছে। এই 'শান্তি এলাকা' আরো দুটো আছে – হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, নটরডেম কলেজ। তার পরে আর শান্তি কোথায়? শান্তি এলাকা সৈন্যদের জন্যে 'নিষিদ্ধ

এলাকা।' তারা গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলে আসছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিল। সে খবরও ছড়িয়ে গেল বাইরে। বাংলাদেশের ভেতরে ওদের গতিবিধি, কার্যকলাপ কিছুই গোপন থাকছে না। তাই ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় খুবই রকেট বৃষ্টি হয়েছে। রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং, কলা-বিভাগে সেদিন ঐ অসহায় পাকিস্তানী সৈন্যদের আশ্রয় নেবার কথা ছিল, সেখানে তাই স্ট্র্যাপিং হয়েছে। ওরা কোনঠাসা হয়ে যাচ্চে। ওরা যখন বোমা পড়ার সময় এগার তারিখে কাঁটাবনের ওখানে কাদামাটি দিয়ে লেপা গাড়ি দুটো থেকে নেমে মাথা নীচু করে এলিফ্যান্ট রোড পেরিয়ে বৈদ্যুতিক সরবরাহ কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছিলো, তখন আমরা একটা গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে দেখছিলাম। ওদের এই অসহায় অবস্থাটা দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল। ওদের টুপিতে, পোশাকে ক্যামোফ্লাজ (ডালাপালার ছদ্মবেশ) করা দেখে আমার Macbeth নাটকের শেরউড্ বনের এগিয়ে আসার দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলো। আমাদের দুঃখের সময় ২৫শে মার্চ রাতে ওদের পৈশাচিক উল্লাস, আর এখন ওদের দুর্দশা দেখে আমার সহানুভূতির কথা মনে করে আজও হাসি পায়।

রাতের বেলা সুরাইয়াকে ফোন করতে চেষ্টা করলাম। কেউ ধরে না। এ. আই. জি সাহেবের ফোন তো নষ্ট হবার কথা না এ সংকটের সময়ে । তবে কি ওরা কেউ নেই? ওরা বাসা ছেড়ে চলে গেছে? গুলশানের মশিউর রহমান সাহেব তো সপরিবারে ওদের বাসায় কয়েক দিন থেকে ছিলেন। আমার সঙ্গে যখন এ বাসায় শেষ দেখা হয়েছিল, তখনই বলতেন রাতের বেলা গুলশানে ভয় করে। তখন তো এত বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ি গুলশানে ছিল না। মধ্যরাতে নাকি ওনার মনে হতো গুমগুম কামানের শব্দ সুদুর গ্রাম থেকে এগিয়ে আসছে। সকালেই তো ডাক্তার ওয়াহিদকে পুরানো ২০ নম্বরে ফোন করে পেলাম না। তিনিও কি গেণ্ডারিয়ায় চলে গেছেন? (পরে শুনেছি ওনার লাইন কেটে দিলে উনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আমাকে আর যোগাযোগ করতে পারেন নি)। শুনেছি ১১ তারিখেই নাকি সব বড় বড় অবাঙালী অফিসাররা রেডক্রসের শান্তি পতাকার নীচে হোটেল ইনটারকনে আশ্রয় নিয়েছেন। এ. আই. জি হাকিম সাহেবকেও নাকি তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিলেন - তিনি রাজী হননি তাঁর আপনজনদের ছেড়ে নিরাপত্তার আশ্রয় নিতে। ওনারা রাতেই গেণ্ডারিয়ায় মা-বাবা-ভাইবোনদের কাছে চলে গেছেন। এ কারণেই আমার পাশের বাড়ির বিহারী ব্যাংক ম্যানেজার কে দেখতে পাচ্ছিনে।

সেদিন বিকেল বোধহয় তিনটে থেকে হঠাৎ কারফিউ জারি হলো। হেনরী আমেরিকান সাহেব হলেও সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকে না যেহেতু আমাদের বাসায় ফেলে রেখে যেতে পারে না। হঠাৎ কারফিউর খবরে শহরবাসী আতংকিত হয়ে অনেকেই পরের দিন রবিবার বলে গ্রামের দিকে চলে গেল। আমাদের ঢাকা মেডিক্যালের ডাক্তার বন্ধু ডঃ শহিদুল্লাহও সপরিবারে বুড়ীগঙ্গার ওপারে কোন গ্রামে চলে গেলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের

অধ্যাপক (পরে শহীদ) সন্তোষ ভট্টাচার্যকে গ্রামে নিয়ে যেতে এসে দারোয়ান ধীরেনদা, সীতানাথ ফিরে গেল। মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, "এপ্রিল মাস থেকে গ্রামে গ্রামে তিন মাস ঘুরে এত কষ্ট করেছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েই এলো, এই তো আর ক'টা দিন।" দেশ স্বাধীন তো আগেই হয়েছিল। 'বিজয় দিবস' আর সন্তোষ বাবু দেখতে পেলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর ঘাতকরা তাঁকে চোখ বেঁধে একটুক্ষণের জন্যে নিয়ে গেল – তিনি আর ফিরে এলেন না। হায়রে বেচারী স্ত্রী।

এই কার্ফিউ ঘোষণার ফলে দেখতে দেখতে পড়ি কি মরি দলে দলে লোক সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে পালাতে লাগলো, যেমন ভাবে পালিয়েছিল একাত্তরের সেই ২৭শে মার্চ সকালে কার্ফিউ উঠে যাবার পরপর। কেউ বা শহরের একপাড়া থেকে অন্য পাড়ায়, কেউ বা দেশের বাড়িতে। যাদের গ্রামে বাড়ি নেই তারা আত্মীয়ের বাড়ি, যাদের আত্মীয়ও নেই তারা পূর্বের আশ্রয়ে। ঢাকা আবার খালি হয়ে গেল। ২৭শে মার্চের পর খালি হয়ে তিলে তিলে দুঃখ পাওয়া মানুষগুলো আবার ফিরে এসে শূন্য ঢাকা কিছুটা পূর্ণ করেছিল। সে ঢাকা আবার জনশূন্য হলো। শুধু কি তাই? অনেকেরই টেলিফোন লাইন কেটে গেল। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়? সেই যে ২৫শে মার্চের কালো রাতের নৃশংসতার আগে টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছিলো। এখনও ঠিক তাই হলো। কথায় বলে 'চুন খেয়ে মুখ তাত্‌লে, দই দেখেও ভয় পায়।' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাদের ফোন ছিল তাদের মাত্র ন'মাস আগের অভিজ্ঞতায়ও অনেকের চৈতন্য ফিরে এলো না (অবশ্য অনেকেরই ফোন ছিল না)।

১২ই ডিসেম্বর বোধহয় 'বঙ্গভবনে' সরকারী বিশিষ্ট কর্মচারীদের, সরকারী কলেজের শিক্ষাবিদদের মিটিং নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সারাদিন কার্ফিউ থাকায় কেউ যেতে পারেননি বা সচেতন ব্যক্তিরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'যাবেন না'। তাঁরা কিছু অবাঞ্ছনীয় আশংকা করে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। ডিসেম্বরের ১২ই তারিখের আমার ডায়েরীর পাতা ছেঁড়া। ১৮ বছর পরে আজ মনে করতে পারছিনে কী লিখেছিলাম। তবে চোখ বুজে যা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো, "সেদিন সারা দিনরাত কার্ফিউ ছিল। 'গভর্নর ভবনে' শেল পড়েছে অনেক, তার জের লেগেছে ওয়ারী, টিকাটুলীতে যেখানে সেখানে। গেণ্ডারিয়াও বাদ যায়নি। আমাদের গেণ্ডারিয়ার মাতবর আসানউল্লাহ সরদার লোহারপুলের কাছে তাঁর বারান্দায় বসেছিলেন, শেল লেগে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। তবু হেন্‌রী আমাদের নিয়ে কার্ফিউ না মেনে 'শান্তি' এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। আমরা মা, "মেয়ে 'ইউকি'কে নিয়ে ইন্টারকনের ভেতরে গাড়িতে বসে সাহেব সুবাদের আসা যাওয়া দেখি।

এতদিন তো আমরা সত্য মিথ্যা অনেক খবর বা গুজব পেতাম। এখন লোকের বাড়ি বেড়াতে না গেলে ছিটেফোঁটা খবরও পাইনে। হেনরীর ঘরে ফোন ধরিনে, আমার ট্র্যান্সিস্টার কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সেই আগাখানী মহিলা কুলসুমের কাছে। তাই স্বাধীন বাংলার খবর বা চরমপত্রও শুনতে পাইনে, আকাশবাণীও ধরতে পারিনে। যদি পেতাম তাহলে

ভেতরের ও বাইরের খবর কিছু জানতে পারতাম। ফোনে এসব কথা জানার উপায় নেই, নইলে সুরাইয়া বা হাজারীকে ফোন করে জেনে নিতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের পাত্তা পাওয়া ভার, আমরা যেখানে থাকি বা যে পাড়ায় ঘুরে বেড়াই, সেখানে ওরা আসেই না। ওরাও পাড়া বদলায়। কিন্তু খবর পায় ঐ জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা, রেডক্রসের প্রতিনিধিরা, পীস জোনের অবশিষ্ট কয়েকজন অধিবাসী ও বিদেশী সাংবাদিকরা। ১২ই ডিসেম্বর থেকে ওরা জানতে পারে বিশ্বের অন্যান্য দেশ আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না বাংলাদেশকে নিয়ে কী যে হুলস্থুল করছে। এদিকে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর এগিয়ে। আসছে কাদের সাহায্য করতে বা কাদের ভয় দেখাচ্ছে? নিয়াজী এত হুমকি হামকি করছে কেন? কোন্ আশ্বাসে সে বলছে, "যদি ঢাকার পতন হয়, তবে আমার লাশের উপর দিয়েই হবে।" এদিকে বাঙালীরা অনেকেই বলছে মিত্র সৈন্যরা আর মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক দিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। যারা মাটিতে শোয়, তারা মধ্যরাতে তাদের কামানের গুম্‌গুম্ শব্দ শুনতে পায়। হানুফা দাইয়ের বোবা কালা ছেলের বৌ সে শব্দ শোনে। এ হলো পৃথিবীর 'বোবা শব্দ।' বোবারা কান পেতে শুনতে পায়। তাই বুঝি মশিউর রহমান গুলশান ছেড়ে শহরের ভেতরে এসেছেন। উনি তো বোবা নন। তবে? উনি সেই নিশীথ শব্দ উপলব্ধি করেন নিজের বুকে।

নিয়াজী আশার পাখায় ভর করে একদিকে আস্ফালন করছে, অন্যদিকে আশংকায় কাতর হয়ে প্রতিরক্ষা জোরদার করছে। লোকে বলে লক্ষণ ভালো নয়। ২৪ ঘন্টার কার্ফিউ মানে আবার ১৭ই নভেম্বরের মত ঘরে ঘরে তল্লাশি করে ধরে নিয়ে যাবে যুবকদের। এদের মধ্যে কেউ যাবে কোতল হয়ে, ভাগ্য ভালো হলে কেউ যাবে জেলে। ইফফাত আরার স্বামী এখনও ঢাকা জেলে বেশ আছেন। এই বারো তারিখে দিনেরাতে কোথা থেকে যে কতজনকে নেবে আজ কে জানে! মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযুদ্ধে সহানুভূতিশীল যাঁরা, বুদ্ধিজীবী, যাঁরা তাদের চোখে বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদেরকে ওরা চিনবে কেমন করে?

মনটা খারাপ যাচ্ছে। খাওয়ার পরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া জমে না। রাতে চোখের পাতা এক হয় না। মধ্যরাত থেকে শিয়ালের ডাকে মনটা আরও উতলা হয়ে যায়। মেয়ের সঙ্গে কথা বলি। মেয়ের ঐ এক কথা, "মুক্তিরা এক দল আরেক দলকে ইঙ্গিত দেয়।" ১৩ তারিখে সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করা হয়েছে। বাপরে। আর যাবে কোথায়? রাস্তায় চলছে – মানে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কারা? ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব এমনকি রিকশাওয়ালাও। কে এখানে নিয়াজীর যুদ্ধ দেখতে ঢাকায় পড়ে থাকবে? যারা যাচ্ছে না, তারাও যাচ্ছে নিউমার্কেটে কাঁচা বাজার, পাকাবাজার সব কিনে নিয়ে আসবে। এত রিকশা একসঙ্গে কোথায় পাবে। তাই অনেককে পায়দলে যেতে হচ্ছে। যারা একবার প্রাণের ভয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল. তারাই আবার শহরে ফিরে এসেছিল পেটের দায়ে, কেউ বা দুঃখকষ্ট সইতে না পেরে। সেই তারাই এখন ছুটছে স্রোতের মত সবাই যাচ্ছে দক্ষিণে, মানে বুড়ীগঙ্গার দিকে। সেদিন বেলা ২টার পরেই পথ জনশূন্য, শহর দিনের বেলাতেই

নিঝুম নিথর। আমরা দু'জনে সারা বিকেল ড্রইংরুমে বসে ম্যাগাজিন পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করছি। হেনরী এক ফাঁকে শান্তি এলাকা ঘুরে এলো। নইলে যেন ওর পেটের ভাত হজম হয় না। হেনরী কে নিয়ে চা খেলাম। ও রাতের ব্ল্যাক আউটের জন্য সুব্যবস্থা করলো। দক্ষিণের রাস্তার দিকে সারা দেয়ালে কাঁচ। তাতে ভারী পরদা। পর্দার ভেতর দিকে বড় দু'টা মাদুর কিংবা হোগলা দিয়ে ঢাকা হলো, যেন মোমের আলোও বাইরে না যায়। রাতে খাবার টেবিলে দুটো মোম জ্বালিয়েছি কি বাইরের গেটে একটা লাঠির বাড়ি পড়লো। একটা মোম নিভিয়ে দিলাম। আজ সন্ধ্যায় প্লেনের ভয়তো আমাদের আর নেই। এদিকে ওদিকে ফুটফাট গুলীর শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। এখানে ওখানে গ্রেনেডেরও শব্দ হচ্ছে। মুক্তিরা তাহলে কাছে আছে এই শহরে। অন্ধকারে ছিটকে যুদ্ধ চলছে তাহলে। মেশিনগানের শব্দও ভেসে আসছে দূর থেকে। আমরা যেমন বিছানায় জেগে আছি, ওরাও ঘুমিয়ে নেই। মাঝরাত থেকে আবার সেই শেয়ালের ডাক। ওরাও কি লড়াই করছে? কার সঙ্গে? চোখের পাতা এক হয় না, ঘুম আসবে কি করে? দোলাকে কোন প্রশ্ন করেও লাভ নেই। সে একই উত্তর দেবে। কখনও ভাবছি স্কুলে তো আজ যাবার কথা ছিল, যাওয়া হলো না। স্বর্ণরা সব ভালই আছে। ওদিকের অলিগলিতে মিলিটারীরা গাড়ি নিয়ে যেতে ভয় পায়। তবে দোসর পেলে, তাদের নিয়ে ঢোকে, মানে ঢুকেছিল নভেম্বর মাসে। পাড়ার ছেলেগুলো খুব চালাক। ওরা নিজেদের পাড়ায় মিলিটারীদের আক্রমণ করতে দেবে না কখনও।

এই তো গেণ্ডারিয়ার কথা মনে হতেই চোখ চড়কে উঠল। ঘুমের বাপ পালিয়ে গেল। একদিনের কথা মনে হলো। সেই যে ১৭ই নভেম্বর যেদিন গেণ্ডারিয়া ঘেরাও করে মিলিটারীরা আমাদের দালালদের সাহায্যে কয়েকজনকে ধরে নিলো। সেদিন আমার খুড়তুতো ভাই কেশব – মুক্তিযোদ্ধা – মাথার চুল সাদা চুনের পাতিল, দাড়ি কুচকুচে কালো। মনে হতো কৃত্রিম মানুষ। গ্রাম থেকে এসে বিপদে পড়েছে। চট্ করে বড় মসজিদে ঢুকে গেল। বিকেল ৫টা পর্যন্ত না খেয়ে পড়ে রইল। সেদিন বান্দারা খোদার ঘরে রাহাজানি করেনি। দারোয়ান বীরবল সকালে পথে বেরিয়ে সোনা মিয়ার মিষ্টির দোকানের কাছে গিয়েছে কি একটা জীপ এসে তাকে থামালো। অফিসার নেমেই বলে "তোম জানতা হি কার্ফিউ। কাঁহা যাতা হ্যায়?" বীরবল ঢাকার আদি বাসিন্দা। আমার মত দেহাতি উর্দুতে কথা বলে। বললো, "বাড়ি যাই।" দিলো এক ধাক্কা, বীরবল বাড়ি না গিয়ে আবার স্কুলের গেটে ঢুকে গেল। গিয়েই গোপালকে বললো, "শিগগির পলাইয়া যা।" কোথা যাবে গোপাল! ওর ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। গোপাল তেতলার সিঁড়ির উপরে বসে থাকলো। আর সেদিন দুপুরেও কারো খাওয়া হলো না।

প্রায় বিনিদ্র রজনীর পরে ১৪ই ডিসেম্বরের সকাল হলো। চোখের জ্বালা নিয়ে বাথরুমে গেলাম। চান সেরে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসলাম। খেতে খেতে হেনরী বললো, "আমরা আজ Neutral Zone – এ গিয়ে থাকবো। বাড়তি জামাকাপড় কিছু নিয়ে চলো।" বুকটা কেঁপে উঠলো। তবে কি ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে গেছে? আমেরিকানদের নিয়ে যাবার

জন্যে নয় তাহলে? আমাদের মারার জন্যে? ঢাকায় যুদ্ধ হলে ঐ তিনটে শান্তি শিবির কী করে অক্ষত থাকবে? তাছাড়া ইন্টারকনে -এ তো যাকে তাকে ঢুকতে দেবে না? রেডক্রসের হাসপাতালে আর নটরডেম কলেজে কতজনের আশ্রয় মিলবে? যাক্ এসব ভাবার সময় নেই। ঘটনা স্রোতের সঙ্গেই ভেসে যেতে হবে। যাবার সময় হেনরী আমাদেরও একটা করে লাল কম্বল দিল। লাল কম্বল দেখেই আমার ২৭শে মার্চে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেবের লাল কম্বল হাতে ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলো।

যাক্, 'ইউকি'কে নিয়ে আমরা গাড়িতে বসলাম। কার্ফিউ ব্রেক করে চললাম নির্জন পথ দিয়ে হোটেল ইন্টারকনে। পথে এ্যালিফ্যান্ট রোড আর কাঁটাবনের মোড়ে ঐ মাটিমাখা বাসগুলো নীলক্ষেতের দিকে যাচ্ছে আর আসছে। কথা ছিল ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আশ্রয় নেবে। ওরা যুদ্ধ করবে, না আশ্রয় নেবে? ভেবে পাইনে কোথায় কী ঘটছে।

যথারীতি হোটেলের নীচে গাড়ি থামিয়ে হেনরী উপরে গিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো। গাড়িতে বসে বললো, "আমার জন্যে এখানে একটা সীট আছে। সেটা অন্যকে দিয়ে গেলাম। আমি নটরডেমে তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।" আমি বললাম, "আমাদের জন্যে তোমাকে কষ্ট করতে হলো।" ও বললে, "এখন নিরাপত্তাই বড় কথা। আরাম কিছু না।"

আমরা নটরডেম কলেজে ঢুকে সামনের ডাইনের বড় বিল্ডিংটার বারান্দায় নামলাম। হেনরী যেন কোথায় গেল। কিছুক্ষন পর একজন বাঙালী ও একজন ব্রাদারকে নিয়ে এলো। একটা ঘরের তালা খুলে দিলেন ওঁরা। বেশ বড় ঘর। অনেক মাল আছে একদিকে। আরেক দিকে দরজা খুললে দেখলাম একটা বড় ষ্টোর রুম। সেখানে কত বড় বড় বাক্স, তাতে কত রকমের ছোট ছোট বাক্স ও প্যাকেট রয়েছে। ব্রাদার আমাকে বললেন, "এগুলোর দায়িত্ব তোমার। শহরে বোমায় আহত হয়ে যারা এখানে আসবে, সে সব শিশু-কিশোরদের তুমি এসব দিয়ে খেলাবে।" আমার হাতে ছোট বড় চারখানা কাঁচি দিয়ে বললেন, "এসব কাগজ কেটে ছবিগুলো তৈরী কর। এ ঘরে তোমরা থাকবে।"

ওনারা চলে গেলে আমি হাসলাম এই ভেবে যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমাদের পুলিশ বন্ধু হাকিম সাহেব, 'সাধনা ঔষধালয়ের রিফিউজি ক্যাম্পে' আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখনও এডিসি সাহেব আমাকে কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছিলেন। সেখানের সেই পাঁচ হাজার ছেলে বুড়ো, শিশুর খাবার ব্যবস্থা করার চেয়ে এখানে একাজ সহজ, কিছুটা টিচারের কাজের মত। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। রাতে মেঝেতেই ঘুমাতে হবে। বড় বড় কাগজের শীট আছে। তারই গোটা কয়েক পেতে শোয়া যাবে। কাগজ গরম। বিলেতে আমার সাউথ আফ্রিকান বান্ধবী ভাগ্যহরহষ্ট জুতোর শুকতলিতে দুভাঁজ কাগজ কেটে বসিয়ে নিতো। কম্বল তো আছেই। অত ভেবে কী হবে। বর্তমানে আমার সামনে যে কাজ আছে, সে কাজ করে যাই। খাওয়ার চিন্তা তো নেই। ব্রাদাররা খেলে আমরাও পাবো।

বসে গেলাম নতুন দায়িত্ব নিয়ে। প্রথমে খেলনাগুলো বেছে নিয়ে একটা বাক্সে ভরলাম। কী সুন্দর সুন্দর খেলনা। তারপর ছবিগুলো একটা করে কেটে কেটে আরেক বাক্সে ভরছি। কাঁচির কাজ করে আমার মেয়ের আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। তখন তাকে পেন্সিল কাটতে দিলাম। একাজ সে ছোটবেলা থেকেই ভালো পারে। তাও ঘন্টা দেড়েক কাজ করে সে ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় চলে গেল। আমি আমার কাজ করছি আর ভাবছি আমাদের দেশের বোমায় আহত শিশু–কিশোর–কিশোরীদের অবস্থা যে কেমন হবে! বেশি আহত হলে তো হলি ফ্যামলীতে যাবে। জেলীও বোধহয় এখন ডিউটি করছে ওখানে।

অতটুকুন বাচ্চা রেখে ও হাসপাতালে ডিউটি করছে? ওর স্বামী তো বোধহয় (আবদুল গণি হাজারী) অবজারভার অফিসে যেতে পারেনি। কে জানে পত্রিকা অফিসের লোকরা, হাসপাতালের ডাক্তাররা, বেরুতে পারছে কিনা! আসার পথে মাটিমাখা গাড়ি ছাড়াতো আমি আর কোন গাড়ি রাস্তায় দেখিনি . . .।

কতক্ষণ ধরে যে ছবির কাগজ কেটে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ শুনি ভীষণ শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিল্ডিং কাঁপছে। একি! ভূমিকম্প তো না! বারান্দায় বেরিয়ে দেখি দোলা বারান্দার থাম ধরে বসে আছে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোকও থাম ধরে দাঁড়িয়ে। আমিও আরেকটি থাম ধরে স্থির হতে চেষ্টা করছি, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ঝড়ের মত প্লেনগুলো একই দিক থেকে এসে মতিঝিলে ছোঁ মেরে যাচ্ছে। ভদ্রলোক বললেন, "গভর্নর হাউসে" বোমা পড়ছে। ও! হ্যাঁ! তাই তো! এখন তো গভর্নরের নির্ধারিত মিটিং হবার কথা। আকাশের দিকে চাইতে পারছিনে, মনে হচ্ছে কাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে ঐখানটায়। অধ্যাপকদের কোয়ার্টারের ৬ তলার ছাদে অনেক বিদেশী সাহেব দূরবীন দিয়ে দেখছে, ছবিও তুলছে, হাতে তাদের অনেকেরই ড্রিংকস–এর গ্লাস। ঐ ভদ্রলোক বললেন, 'ওরা সব বিদেশী জার্নালিষ্ট।" বিদেশী সাংবাদিক? ওদের সাহস তো কম নয়! এই ক'দিন আগেই না শুনলাম সব বিদেশী সাংবাদিককে তাড়িয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, হেনরী বলেছে। কেউ কেউ আছে। এরাই এখানে আস্তানা নিয়েছে। আধ ঘন্টারও বেশি রকেট বোমা বৃষ্টি। কিন্তু মনে হচ্ছিল বুঝি পাঁচ–ছয়' ঘন্টা ধরেই একতরফা বিনা বাধায় বোমা ফেলে ঘুরে যাচ্ছে, আবার আসছে, আবার যাচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল আকাশথেকে কাগজ উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন সাংবাদিক ছাদ থেকে নেমে দুটো গাড়ি নিয়ে উড়ন্ত কাগজের পিছনে ধাওয়া করলো। আমরাও আকাশের দিকে চেয়ে আছি। ভাসমান কাগজগুলোকে মনে হলো প্রচারপত্র, খুব ধীরে ধীরে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হলো বুঝি আমাদের মাঠে বা মতিঝিলে, টিকাটুলীতে পড়ছে। কিন্তু ঐ সাহেবরা ডেমরা, জুরাইনের মাঠে গিয়ে প্রচারপত্র কুঁড়িয়ে আনলো। ইংরেজী ওরা একটা পেয়েছে, বাকি ৩/৪ টা উর্দুতে। আমার কাছে আনলে বললাম, "উর্দুতো আমি পড়তে পারিনে।" ওরাই বললো ইংরেজীটাতে 'Surrender' করতে

বলেছে। তারা বললো এরিয়েলেও ভেসে আসছে একথা। তার মানে পাকিস্তানী সৈন্যদের বলছে 'আত্মসমর্পণ করতে।'

রকেট-বোমা ক্ষান্ত হলে সাহেবরা খেতে বসলো। তখন বেলা দুটো হবে। আমাদেরও পেট চোঁ চোঁ করছে। দ্বিতীয় ব্যাচে আমাদের ডেকে নিলো। কয়েকজন মিশনারী ও আমরা খাবার টেবিলে গল্প করে খেলাম। খাবার মধ্যে ডাল, ভাত আর সব্জির ঘ্যাট। মাংস বোধহয় ছিল, তখন ফুরিয়ে গেছে। একজন সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করলাম, "ছাদের উপর থেকে যে দেখলে, তোমাদের ভয় হলো না?" ওরা বললো, "গভর্নর হাউসে রকেট বোমা পড়ছে একই জায়গায়, যে রুমে মিটিং হবার কথা ছিল।. একটাও মিস হচ্ছে না। ভয় কিসের?" আরেকজন বললো, "They are so acurate" ওরা জানালো, 'মিটিংয়ের খবর যেই মাত্র দিল্লীতে চলে গেছে তখনই অর্ডার হয়েছে মেঘালয়ের শিলং বিমান ঘাটি থেকে মিগ-২১ নিয়ে গভর্নর ভবনের উপরে আক্রমণ চালাতে।" ওরা আমাদের চাইতে অনেক বেশি জানে, তাই নির্ভয়, আর আমি না জেনে ভয়ে আতংকে সারা। যখন দেখেছি তখন মনে হয়েছে অনেক মিগ -২১, পাখির ঝাঁকের মত। পরে শুনেছি। মাত্র ৬টি।

খাবারের পরে আমার মেয়ে বায়না ধরলো, সে আর আজ রাতে এখানে থাক্‌বে না। কিন্তু আমি একথা হেনরীকে বলি কেমন করে? আমাদের জন্যে সে রেড্‌ক্রসের 'শান্তি নিবাস' ইন্টারকনের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, এখন তাকে নিয়ে আমরা ২৮ নম্বর ধানমণ্ডিতে যাই কেমন করে? সাংবাদিকরা বললো, "আজ আর রকেট -বোমা পড়বে না। "তবুও দোলার বিশ্বাস হলো না। শেষ পর্যন্ত আমরা বিকেল ৫টায় হেনরীর বাসায় ফিরে গেলাম। ফেরার পথে হেনরী রেড্‌ক্রসের অফিসে দেখা করলো। বাসায় ফিরে দোলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। আজ বিকেল ৫টা থেকে আগামীকাল ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত ভারতীয় প্লেন থেকে বোমা ফেলবে না। পাকিস্তানীদের নাকি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে নেবার সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকায় ১৪ই ডিসেম্বরের 'ঘটনাবহুল' দিনের একটি অধ্যায় শেষ হলো। আমরা কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে আর একটু কিছু দিয়ে হাল্‌কা 'সাপার' দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। সারাদিনের টেনশনে ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে বিছানায় পড়ে রইলাম। শেয়ালগুলো প্রতিরাতের মতো নিজেরা কামড়া-কামড়ি করতে থাকলো। একবার ভাবি গর্ভনর ও তাঁর মেয়ের কি হলো। মন্ত্রীরা সব কোথায় গেল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমাদের বন্ধুরাই বা কেমন আছেন।

১৫ই ডিসেম্বর ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে হেনরী বললো, "আজ সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করেছে।" কাদের জন্য? এখন হয়তো আরো কিছু শহরবাসী গ্রামে যাবে। কিন্তু বোমা না পড়লেও রকেটিং ও স্ট্র্যাপিং চলেছিল - বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। হেনরী মালীকে বাজারে পাঠালো। অনেকেই কার্ফিউ শিথিল হলে বাজারে দৌড়ায়। কিন্তু বাজারে মাল আসবে কেমন করে? চাল ডাল ছাড়া বেশি কিছু পাওয়া

যায় না। বাড়িতে বসে সবাই এখন দেশ-বিদেশের রেডিও শোনে। প্রধান খবর "আজ বিকেল ৫টা থেকে আগামীকাল (১৬ই ডিসেম্বর) সকাল ৯টা পর্যন্ত আকাশযুদ্ধ বন্ধ থাকবে।" যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে আবার আকাশযুদ্ধ শুরু হবে। আমাদের গর্ভনর তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে হোটেল ইন্টারকনে রেডক্রসে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। কেমন করে কোন অধিকারে এলেন? কেমন করে? আগে পদত্যাগ পত্র রেডক্রসের হাতে দিলে, তবে রেডক্রস তাঁদের গ্রহণ করলো। ওখানে বসেই 'পদত্যাগপত্রের ঘোষণা' ইয়াহিয়াকে জানালেন – অর্থাৎ বার্তা প্রেরণ করলেন। নিয়াজীর কথা তো আমি জানিনে। সেই ব্যক্তি 'শর্তহীন আত্মসমর্পণ না করলে আবার ঢাকায় যুদ্ধ হবে। তবে আশার কথা মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনী নিয়ে ঢাকা ঘিরে ফেলবেই ফেলবে। নিয়াজীর মনের জোর কমে গেছে। তাই হুমকি দিচ্ছে না – তার চেলারা প্রাণের দায়ে পদত্যাগ করেছে।

এ রাতটা আশা আশংকায় কাটলো, সেই শেয়ালের লড়াই রাত ভরে চল্‌লো।

একাত্তর সালের ১৬ই ডিসেম্বরের সকাল হলো। ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার উষালগ্নে যে লাল সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের চূড়ায়, বেদীতে, জগন্নাথ হলের রক্তে রাঙা সবুজ ঘাসে আর স্তূপীকৃত লাশের গায়ে, তেমনি হালকা কুয়াশা ভেদ করে লালচে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো পুরানো ২৮ নম্বর ধানমণ্ডির হেনরীর বাগানে, যেখানে আমি পায়চারী করছিলাম। এটাই হলো আমার নয় মাসের শেষ আশ্রয়স্থল।

তিন-চার রাতের অনিদ্রায় ক্লান্ত চোখে পায়চারী করছিলাম আর ভাবছিলাম কেন অত শিয়াল ডাকে ক'দিন থেকে রাত ভরে? মন খারাপ হয়ে যায়। আবার কামানের ভারী শব্দে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন আশা হয়ে এগিয়ে আসে যুদ্ধ। ওরা নাকি আসছে, বন্ধু বলেন গুলশান থেকে। এখন তো তাদেরও ফোন সাড়া দেয় না। মন খারাপ হয়ে যায়। রাতের বেলায় প্রশ্ন করি কেন এত শিয়াল ডাকে? আমার মেয়ে বলে – 'ও" কিছু নয় মুক্তিযোদ্ধারা কাছেই আছে। একদল শিয়ালের ডাক ডাকে, আরেক দল তখন কুকুরের ডাকে উত্তর দেয়। হবে হয়তো। কে জানে।"

চা খেতে খেতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত – আমার সোনার বাংলা – দু'লাইন তালিম দেয়া হচ্ছিল হেনরীকে। চার দিনে ধরেই শেখানো হচ্ছে। সকালের খাওয়া সেরে হেনরীর সঙ্গে CARE –এর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে আমার মেয়ে তো আছেই আর আছে ইউকি। হেনরীর কেউ নেই – আমরা সবাই ওর আশ্রিত। ১২ই ডিসেম্বর থেকে আমরা সবাই 'কার্ফিউ' না মেনে আইন বাঁচিয়ে হেনরী সেলজের সঙ্গে CARE–এর গাড়িতে আকাশ বোমা উপেক্ষা করেই যাতায়াত করেছি।

হেনরী আমাদের নিউ বেইলী রোডের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে নামিয়ে দিয়ে তিনটি নিউট্রাল জোন, নটরডাম কলেজ, হোলিফ্যামিলী হাসপাতাল ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, –এ সার্বিক অবস্থা জানতে চলে গেল। এ কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ১লা অক্টোবর থেকে

আমার একটি দু'বিছানার ঘর ভাড়া করা ছিল। আমি এক মাস এখানে থেকেছিও। আমার ঘরের তালা খুলে ঢুকে গেলাম। আমার আর এক পাশের ঘরে শিমূল , সুরকার আলতাফ মাহ্‌মুদের শ্যালিকা, তার টু-ইন ওয়ান চালিয়ে টেপ করছে, তখনও মিত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের আহ্বান এরিয়েলে ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ ধরে ওর ঘরে বসে আমরাও শুনলাম। গেলাম তার পরের ঘরে - নার্গিস, সিকান্দায় আবু জাফরের স্ত্রী, দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত। তিনি এখানে হোষ্টেলের দায়িত্বে আছেন। তিনি ইউসিস লাইব্রেরী তে কাজ করতেন। হোষ্টেলবাসিনীদের মধ্যে এলো নুরুন্নাহার, খুব লম্বা – পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ওয়াইজ ঘাটের বুলবুল একাডেমিতে নাচ শিখতো। তখনকার দিনে নাচের ক্লাসে ছেলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাই অনুষ্ঠান করতে ছেলের কম পড়লে ওকেই আমরা ছেলে সাজাতাম।

আমরা কয়েকজন মিলে অস্থির চিত্তে কথাবার্তা বলছি, শিমূল একা ঘরে রেডিও চালিয়ে শুনছে। আমি তাদের ১৪ই ডিসেম্বরে যখন গভর্ণর হাউসে রকেট বোমা পড়ছিল তার কাহিনী একটু বললাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ হেনরী চলন্ত গাড়ি থেকে 'জয়বাংলা' বলে চলে গেল। আমরা সবাই দৌড়ে তিনতলার ছাদে গিয়ে দেখালাম রেডিও অফিসের ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সবাই জয়বাংলো বলে উঠলাম। কারো আনন্দে চোখে জল, কারো মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। তখন আমরা নেমে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পথচারীদের অভিবাদন জানাচ্ছি। 'জয়বাংলা'। চেনামুখ একজন বান্ধবী মিসেস নেহেরুন্নেসা ইসলাম যাচ্ছিলো বেইলি রোড দিয়ে তাকেও জানালাম সম্ভাষণ। সেও হাতে তুললো উপর দিকে। এদিকে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে রাজার বাজার পুলিশ ফাঁড়িতে বন্দুক জমা দিতে যাচ্ছে খাকী পোশাক পরা লোকগুলি সার বেঁধে। এমনি সময়ে আহম্মদ হোসেন (জাষ্টিস মহম্মদ হোসেনের ভাই) এলো দুঃসংবাদের বোঝা নিয়ে। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দারকে নিয়ে গেছে। তাঁদের বাসা (বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে) থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা থেকে নিয়েছে ডঃ মুর্তজা, সন্তোষ ভট্টাচার্য, একবাড়িতে বসবাসকারী দুই বন্ধু আনোয়ার পাশা ও রাশিদুল হাসানকে মাটি মাখা বাসে চোখ বেঁধে। আমরা সবাই আতংকে শিউরে উঠলাম। এরা কারা। আলবদর কি? আমি তো দেখেছি এ রকম মাটি মাখা বাস কয়েকটা – এ কদিন ধরে। কোন কোনটা আবার ডালপালা দিয়ে সাজানো। ১২ই ডিসেম্বর চারদিনের কারফিউর প্রথম দিন আমরা যখন CARE –এর গাড়িতে এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে হোটেল ইন্টারকনের দিকে যাবার সময় দেখেছি দু'গাড়ি ভর্তি খাকী পোশাক পরা সৈন্য সাইরেনের শব্দ পেয়েই বাস থেকে নেমে হাতিরপুলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢুকে পড়লো। আমার মনে আসলো আমাদের সে পরিচিত প্রিয় মুখগুলো কি আর দেখতে পাবো না? আহম্মদ হোসেন মাথা নীচু করে বললো, "ওরা কি শেষ মরণ কামড় দেবে না?" কী যে হবে, আরো কত দুঃসংবাদ যে শুনবো কে জানে।

বেলা ১২টা নাগাদ হেনরী এসে আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে গেল। আমি, আমার মেয়ে দোলা ও হেনরী লনে বসে একে অন্যের কাহিনী শুনছি। বাবুর্চি কোল্ড্ ড্রিংক নিয়ে এলো তিন গ্লাস। দুপুরের খাওয়া খেতে যাবো এমন সময় মালী এসে বললো, 'মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফার্মগেট দিয়ে হোটেল ইন্টারকনে যাচ্ছে। আমরা খাওয়া ফেলে গাড়ি নিয়ে ফার্ম গেটের দিকে ছুটলাম। সঙ্গে 'ইউকি'। র্ফামগেটে গিয়ে দেখি ওরা চলে গেছে। আমরা গাড়ির ছুটালাম সেদিকে। আমাদের গাড়িটা রেডিও অফিসের কাছে একটা ট্যাংকের পেছনে রেখে আমরা হোটেলের গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইউকি গাড়িতে থাকলো। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। গেটের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। গেট বরাবর একটি ট্যাংকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ 'কারিকা' ও 'সাকুরা' রেস্তোরাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। সামনে আছে দুটি মুক্তিবাহিনীর জীপ এবং পেছনেও। ট্যাংকে তরুণ ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত হাসি মুখে দাঁড়ানো। ফুলে ও মালায় ট্যাংক ভরে যাচ্ছে। তরুণ ও কিশোররা কেউ ক্যাপ্টেনের হাতে ছুঁড়ে দিচ্ছে সিগারেটের প্যাকেট, কেউ এগিয়ে দিচ্ছে চা। আমাদের পিছনে ও সামনে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। বিপরীত দিক্ থেকে এগিয়ে এলা নার্গিস ও নুরুন্নাহার, আমাদের সঙ্গেই দাঁড়ালো। আমাদের বাঁ পাশে মেরুন রঙের গাড়িতে এক পরিবার। রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে এলো 'বাদল' ক্যামেরা হাতে। আমাদের ডান দিকের নীচু দেয়ালের উপরে বসে পুচকে ছেলেরা বঙ্গভবন থেকে রেডক্রস যে সব খাকীদের উদ্ধার করে এনেছে তাদের উদ্দেশ্য করে চীৎকার করছে। সেকি গালি! অকথ্য গালি! ময়মনসিংহ রোডের পশ্চিম পাশ দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে খাকী পোশাক পরা লিক্‌লিকে চেহারার আধা-সামরিক বাহিনী বন্দুকের মুখ শূন্যে তুলে মুখ নীচু করে বন্দুক জমা দিতে যাচ্ছে, বোধহয় রাজারবাগের দিকে। এরই নাম Surrender।

আমরা অপেক্ষা করছি জেকব কে দেখবো বলে। এর মধ্যে ছোকরা ছেলেরা ওদেরকে গালাগালি করছে 'শালা, শুয়োরের বাচ্চা।' তখন ওরা ব্ল্যাংক ফায়ার করেছে। আর যায় কোথায়। জীপ থেকে মুক্তিবাহিনীর বেশ কিছু গুলি ছুটলো আধা সামরিক বাহিনীর দিকে। গোলাগুলি আরম্ভ হলো। গেটের দুপাশে দাঁড়ানো আমরা সবাই কোন বাধা না মেনে ভেতরে চত্বরে ঢুকে যে যেখানে জায়গা পেলাম শুয়ে পড়লাম। আমি কোন রকমে দু'জন লোকের জুতো সরিয়ে মাঝখানে আমার মুখটা গুঁজে থাকলাম। দোলার হাতটা ধরে থাকলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম বলতে পরবো না, যখন আমার খেয়াল হলো গোলা গুলীর শব্দ নেই, চেয়ে দেখি আমি ছাড়া আর কেউ সে চত্বরে শুয়ে নেই। আমার মেয়েও না। হায়রে, ন'মাস এত কষ্ট করে এই এখন মেয়েটাকে হারালাম। আমি দৌড়ে হোটেলের কোনের ঘুপচি জায়গায় গেলাম, দেখি অনেকেই সেখানে! সবুজ ছোট লনে মহিলারা হৈ চৈ করছে। আমি মেয়েকে খুঁজছি। মিসেস জাফর বললেন, দোলা ভাল আছে। হেনরীর পিঠে গুলী লেগেছে - ওকে রেডক্রসের এমারজেন্সিতে নিয়ে গেছে। হায়রে! আমাদের ন'মাসের যাযাবর জীবনের শেষ আশ্রয় হেনরী! আমি এখন কি করি?

কিন্তু নিজের কথা ভাববার সময় এটা নয়। একটি সাত আট বছরের ছেলের চিৎকারে সবাই অস্থির। ওর কোমরের নীচে ডান দিকে গুলী লেগেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে । ও গালাগাল করছে কাদের উদ্দেশে কে জানে। সামনে বসা সেই নুরুন্নাহার। তার পরনে চওড়া সবুজপেড়ে সাদা শাড়ি। ওর শাড়ির নীচের পাড়টা একটানে ছিড়ে আমরা ছেলেটিকে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। ওখানেই দেখলাম ডঃ জাহানারা রাব্বীকে – ওর কাছেই জানলাম ১২ তারিখেই নাকি তার স্বামী ডঃ ফজলে রাব্বিকে নিয়ে গেছে।

এরমধ্যে আমাদের হোটেলের দোতলায় ওঠার অনুমতি এলো। বাপরে মেয়ে পুরুষ কার আগে কে উঠবে, যেন দৌড়ে দোতলায় উঠলো। পেছনে তাকাবার সময় নেই। এমনি করেই হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা এগিয়ে যায় পাশের হত সৈন্যসহচরদের ফেলে। আমরা দৌড়ালাম প্রাণের দায়ে। দোতলায় বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসে কতক্ষণ বসে থাকার পর ওয়্যারলেস হাতে এলেন নীলচে ছাই রঙের পোশাক পরা একজন মিলিটারী অফিসার, তাঁর দু'পাশে দু'জন বাঙালী ছেলে। কেউ কেউ বললো ইনিই জেকব, যাকে দেখার জন্য আমরা গেটে অপেক্ষা করছিলাম। এই অফিসারকে দেখে বয়স্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন, আমরা অনেকক্ষণ আটকে আছি। গোলাগুলী বন্ধ করুন।' সে নীল চোখ গৌরবর্ণের অফিসার ইংরেজীতে যা বললেন, তার অর্থ এই, 'কেন? এ রকম তৎপরতা আগে দেখাতে পারেননি? আপনারা সবাই মিলে দেশের ভেতর থেকে সাহায্য করলে আমাদের পৌছানো ত্বরান্বিত হতো। আমার কত সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, পথে পথে আমরা তাদের সৎকার করে এসেছি, এ দু'জন ছেলের সাহায্যে। তখন বাইরে থেকে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ হলো, অফিসার আবার আদেশ দিলেন, আবার চললো গোলাগুলী। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর একদম নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পর অফিসার 'অল ক্লিয়ার' বলে আমাদের বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন। নীচে নামতেও সেই হুড়োহুড়ি কার আগে কে বাড়ি যাবে। নীচে নেমে আমরা কয়েকজন হেনরীর খোঁজ নিতে রেডক্রসের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে গেলাম। হেনরীর ব্যাণ্ডেজ প্রায় শেষ। ওর বাঁ দিকে পেছনের ব্রেইডে লেগেছে। গুলী, ভেতরে ঢোকেনি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আরো কয়েকজনকে বসিয়ে রেখেছে, সেই ছেলেটিকে দেখলাম না। যখন আমরা হোটেলের গেটের বাইরে এলাম দেখি চারিদিক জনশূন্য, নীরব। গেটের কাছে যে মেরুন রঙের গাড়িটা ছিল, তার একটি কাঁচও আস্ত নেই, ক্যাপ্টেন নেই, শুধু আছে ট্যাংকটি। পরে শুনলাম সেই ক্যাপ্টেন বিজয়ের শেষ মুহূর্তে নিহত হয়েছেন। হায়রে নিয়তি।

মেরুন গাড়িটি ছিল ওয়াপাদার চীফ ইনজিনিয়ারের, আহত ছেলেটি তাঁর। পরে –কয়েক বছর পরে আমার প্রতিবেশী নিতীয়ার চাচা তপনের কাছে শুনলাম ছেলেটি সে রাতে মারা গিয়েছিল। আমাদের গাড়িটা ছিল রেডিও অফিসের কাছে, দেখি ওটার কি অবস্থা, ইউকি কেমন আছে? পথে যেতে দেখলাম আরো একটা লাশ পড়ে আছে পশ্চিম দিকে। আমাদের গাড়িটা অক্ষতই ছিল, ইউকি বহাল তবিয়তে আছে। গোলাগুলী শুনে পেছনের সীটের

পা দানীতে মাথা গুঁজে পড়ে ছিল। হেনরীর সাহেব বন্ধু গাড়ি চালাতে চাইল। তা অন্যের সাহায্য নিতে হলো না। হেনরী চেষ্টা করে এক হাতে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে ধানমণ্ডির বাসায় নিয়ে এলো। তখন বেলা প্রায় তিনটে। আনন্দ বিষাদে ভরা আমাদের মন। তবুও একটু খেতে হলো। তখন এলেন হলিক্রস কলেজের সিষ্টার টেরেসা আর মেরী জোনস্ এবং বটমলি হোমের সিষ্টাররা। হেনরী ওঁদের নিয়ে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ নিতে বেরিয়ে গেল। আমরা মা–মেয়ে লনে পায়চারী করতে লাগলাম। উল্টো দিকের বাড়ির জাপানীরা চলে গেছে কোথায় যেন। তাদের বাবুর্চি–মালীরা জানালো, "রায়ের বাজার ইটের খোলায় অনেক লাশ পড়ে আছে, লোকেরা সেদিকে যাচ্ছে। আমরাও যাবো। আপনি যাবেন, আম্মা?"

অসম্ভব। নয় মাস ধরে যে যুদ্ধ করেছি ঢাকায় থেকেই, আজ এই বিজয়ের দিনে এত দুঃসংবাদ পেয়ে শরীর মন ঝিমিয়ে আসছে। একবার গোলাগুলীতে পড়ে বেঁচে এলাম আর এ অসহনীয় দৃশ্য দেখতে চাইনে। আমাদের দু'পাশের বাড়িতে থাকেন যে দুই ব্যাংকের ম্যানেজার – ডাইনে বিহারী, বাঁয়ে বাঙালী, এর মধ্যে জেনেও ফেলেছি এরা দুজনেই নাকি দালাল। বাঙালী জন কোথা থেকে একটা বাংলাদেশের পতাকা এনে টাঙিয়ে দিলেন, বললেন তাঁদের নিজের বাড়িতে মাটির তলায় পোঁতা ছিল। হবেও বা। আর বিহারী জনের চেহারা ক'দিন থেকেই দেখতে পাইনি। হয়তো নিজেদের মহল্লায় চলে গেছে, নয়তো রেডক্রসের আশ্রয়ে আছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে আছি লনে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে পলার ঢলঢলে মুখ (ডঃ মূর্তজার স্ত্রী), লিলির মিষ্টি হাসির মুখ (মুনীরের স্ত্রী), মোফাজ্জলের স্ত্রীর অসহায় মুখের ছবি, সন্তোষ বাবুর স্ত্রী আর মেয়ের মুখ। ওরা এখন কোথায়, কার কাছে আছে? দুই বন্ধু — আনোয়ার পাশা ও রশিদুল হাসান – তাদের পরিবার কোথায়, কেমন আছে, কে জানে। হায়রে। কী অবস্থায় ডঃ মিসেস জাহানারা রাব্বী হোটেল ইন্টারকনে এসেছিলেন। এদিনেও তিনি ঘরে থাকতে পারেননি।

এদের কথা শুনে তাই আর যেতে পারিনি সেই আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে। সে তো ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস। আমার প্রয়োজন নেই সেখানে যাবার। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারদিকে। আবার গভীর রাতে অন্ধকারে শেয়ালের ডাক বুকে আঘাত দিলো। আজ এত বছরেও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালায় অংশ নিতে পারিনি। যেতে পারিনি কখনও ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বা মীরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্প অর্পণ করতে। যাইনি কখনও কবিতা পাঠের আসরে। বিজয় দিবসে দেইনি কখনও সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য।

১৬ই ডিসেম্বর "বিজয় দিবসের" রাতটি বড়ই মর্মান্তিক। ঘুমও আসে না, রাতও শেষ হয় না। উল্টো দিকের জাপানীদের বাড়ির বাবুর্চির মুখে রায়েরবাজারের কাহিনী শুনে মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। ঐ দিকেই ১৪ তারিখে রাত ১১টা ১২টা দিকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল। ঐ বাবুর্চিরা বলছিল 'বিহারীরা' নাকি মীরপুর মোহাম্মদপুর থেকে সবাই এদিকে

এগিয়ে আসছিল। সে হৈ চৈ থেমেছিল আধঘন্টা পরে। কিন্তু শেয়ালের ঝগড়া চলেছিল সারা রাত। ওদের রাতের উৎসব, 'নরদেহ' নিয়ে চলছিল কাড়াকাড়ি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই হতভাগ্যরাও ওদের ভোজের সামগ্রী হলো? ভাবলেই হাত-পা শক্ত হয়ে যায়, ঝিম ধরে যায়।

১৭ই ডিসেম্বরের সকালটা বিষাদে ভরে গেল। গতকালের তরুণদের বিজয়ের আনন্দ উল্লাস ঝিমিয়ে গেল। কি করি, কোথায় যাই! বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সাতজনকে ধরে নিয়ে গেছে, তাঁদের খবর জানতে মন ছটফট করছে। কিন্তু এ পাড়ায় যাবার সাহস নেই একা একা। হেনরীকে নিয়েও ভেতরে ঢোকা যায় না। তাই গেলাম হাজারীদের ১৬ই ডিসেম্বরের বাসায়। ১৬ই ডিসেম্বরের কাহিনী, হোটেল ইন্টারকনের গোলাগুলী বিনিময়ের কথা বলছিলাম, হাজারী বললো, "আপনার গুলী খেয়ে মরাই উচিত ছিল। জানেন না। ১৬ তারিখে কার্ফিউ ছিল?"

ওখান থেকে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। হেনরী আমাকে বৃটিশ কাউন্সিলের ওখানে ছেড়ে দিলো। আমি প্রথমে গেলাম উদয়ন স্কুলের পাশের ফ্ল্যাটগুলোতে। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জলের পরিবার তো তাঁদের ফ্ল্যাটে ছিলোই না, তাঁদের পরিবারের কেউ এখানের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন নি। রাশিদুল হাসান, আনোয়ার পাশার পরিবার তো এক সঙ্গেই থাকতো। তারা গেল কোথায়? পাড়ায় জিজ্ঞেস করে জানলাম, বুলু ও তার মাকে রেজিস্ট্রার নুরুদ্দিন সাহেব নিয়ে গেছেন তাঁর বাসায়, সন্তোষ বাবুকে তুলে নেওয়ার পরেই। রেজিস্ট্রার সাহেবের উপরে আমরা একটু রাগ ছিল। সন্তোষ বাবুর স্ত্রী ও মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন জেনে আমার রাগটা জল হয়ে গেল। একটা মানুষ দু'চারটা খারাপ কাজ করলেও একটা ভাল কাজ করেই অনেক বড়, অনেক শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে কতলোককে কতভাবে চিনলাম। বিপদে না পড়লে বন্ধু চেনা যায় না।

এপাড়া থেকে বৃটিশ কাউন্সিলের পাশের পাড়ায় গেলাম। পলা -রা কোথায় সেদিনও ফেরেনি। সেখানে যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা অবাক হলেন, কোন ভালমন্দ কথা বললেন না। শুনলাম গেণ্ডারিয়ার প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে এসেছে। মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে তারা ক্যাম্প খুলেছে। নিশ্চয়ই কমিটির সদস্যদের অনুমতি নিয়েছে, অনুমতি না-ও নিতে পারে। বন্যার সময়ে দুর্গতদের নিজের দাবীতে ওরা আশ্রয় দেয়। এটা পাড়ার স্কুল, ওদের বোনরা পড়ে, কাজেই ওদেরই স্কুল। নয় মাসের যুদ্ধ চলাকালীন যারা বাড়িতে আসতে পারেনি, যে সব স্থানীয় অনুচর পাড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে দুর্গতির মাত্রা বাড়িয়েছিল, তাদের প্রতি ক্রোধ প্রতিশোধ স্পৃহা এক ক্ষমাহীণ সংকল্পে পরিণত হয়েছিল। শুধু এখানেই নয় অন্য পাড়ায়, গ্রামেগঞ্জে নিপীড়িত দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ঘৃণাও ক্রোধ প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে দেখা দিল। তখন তো ঘরে ঘরে মুক্তিযোদ্ধা, ঘরে ঘরে অস্ত্র গোলাবারুদ - তা নিয়ে এরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই রাজাকার আল-বদর আল-শামসদের

অনুকরণে আমাদের স্থানীয় অনুচরদের উপর। যারা চালাক, তারা বিজয় দিবসেই উধাও। যারা হতভাগ্য, তারাই ধরা পড়েছে এদের হাতে। তরুণদের উতপ্ত রক্ত নতুন করে রক্তে, প্লাবন বইয়ে দিল। রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা। বিজয়ের পর পরই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রাতে শুয়ে ভাবছি এবার আমার শেষ পালা – বদলের পালা। কিন্তু ১৮ই ডিসেম্বর সকালে রায়ের বাজারের ইটের খোলায় শতাধিক লাশের খবর শহরবাসীকে উদভ্রান্ত করে তুললো। আপনজন ও আত্মীয়–হারা সবাই ছুটলো ঐ দিকে। আমি এখন গেণ্ডারিয়ার স্কুলে যাই কেমন করে? কেমন করেই বা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পেই বা থাকি? তবুও যেতেই হবে। সকালে দোলাকে নিয়ে নিউ বেইলি রোডের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে গিয়ে আমার কিছু টুকিটাকি জিনিস নিয়ে গেণ্ডারিয়ায় গেলাম। গেটে গিয়ে দেখি ওরাই গেট পাহারা দিচ্ছে। ওদের লম্বাচুল, দাড়িও আছে কারো। হাতে বুলার, নয়তো বন্দুক। আমাকে দেখে গর্বের সঙ্গে সালাম দিলো। আমার টুকিটাকি আমার কোয়ার্টারে রেখে, স্কুলে আমার অফিস রুমে গেলাম। 'টমি' তো আমার খাটের তলায় থাকে। ছেলেগুলোর দৌরাত্মে টমির আধিপত্য কমে গেছে, ওর মন খারপ। রমজান দাই আমার অফিস রুম খুলে দিয়ে বললো, "আপা নীচের তলার সব রুম অরা দখল কইরা রইছে। বাকী কেরানী সাবের রুম, আর আপনার রুম।" স্যারদের রুম গেটের কাছে, সেটা হয়েছে ওদের অফিস রুমে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

" আমার পাশে আপাদের রুমটা ওরা নিয়েছে?"

"তবে? হেইটাইতো ওগো আসল অফিস। কইত্থে কইত্থে মানুষ ধইরা আনে, আবার রাইতের বেলায় কইজানি লইয়া যায়। আমরা এইখানে রাইতের বেলা থাকি না।"

আমি ভাবছি তাহলে আমিতো মেয়ে নিয়ে এখানে থাকতে পারবোই না।

আমি স্কুলে এসেছি জেনে ক্যাম্প লীডাররা দেখা করতে এলো। ওরা স্কুলে সারাক্ষণ থাকে না। যারা থাকে তারা পালা করে থাকে। পাশের ঘর থেকে একটি ছেলে এসে আমাকে বললো, "আপা, কয়েকটা ম্যাগাজিন দেবেন?"

"কি। ম্যাগাজিন দিয়ে কি করবে?"

বলে, "ওদের পড়তে দেবো,"

বললাম, "সে কি ওদের কি কোন ম্যাগাজিন পড়ার মনের অবস্থা আছে?"

আমি বুঝতেই পেরেছিলাম, ওরা কারা। ইচ্ছা না থাকলেও গেলাম ওদের ঘরে। দেখলাম তিন জন মাঝবয়সী পুরুষ কাচু মাচু হয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে। তাদের আমি চিনি না। ঐ ছেলেদের একজনকে ডেকে এনে বললাম, "আইন কি তোমরাই হাতে নিলে? ওদের থানায় দিলে কি হতো?" ওরা রাজী হলো না। "থানায় দিলেতো ছেড়ে দেবে, আপা! আমরাই শাস্তি দেবো।"

"বিচার না করে, বিনা প্রমাণে শাস্তি দেবে কোন আইনে?"

ছেলেটি চলে গেলে দাই বললো, "জানেন আপা, মাইয়া মানুষও ধইরা আনছিল। ইয়া লম্বা। ঐ যে গোঁফওয়ালা সাবের বইনরে। স্বর্ণর কাছে চলেন, সব শুনবেন।"

ঘর তালা দিয়ে রান্নাঘরে স্বর্ণর কাছে গেলাম। স্বর্ণ বললো, "স্বাধীন অইছে পর থিকা আমরা যে কি ঝামেলা পোহাইতাছি। সাড়ে পাঁচফুট লম্বা এক মহিলারে লইয়া আমরা হয়রানি হইছি। আপনার দাইরাতো রাত্রে থাকে না। কেবল সুভদ্রা আর আমি তারে ধইরা ব্যাথরুমে নেই। মহিলা নাকি ছাদের থিকা লাফ্ দিছিল। পা-ও ফুইলা কলাগাছ। সে খালি কান্দে, কিছু খায়না। তারপর পাড়ার সাহেবরা কইয়া বুইলা তারে ছাড়াইয়া নিছেন।"

ঐ ছেলেদের থেকে জানলাম সে মহিলার বাসায় প্রচুর লুটের মাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বাংলা বাজারের ডাক্তার বর্ধনের বাসনের দোকান থেকে যাবতীয় মালপত্র ছোটবড় সব পাওয়া গেছে। মাটির তলায় একটা বিরাট বড় টোক্নায় ভরা কয়েকশ' কাজল লতা, পিতলের ধুপদানী, প্রদীপ। বড় থালা বাসন, কলসী তো আছেই। ওরা আমাকে ঘর খুলে দেখালো। বর্ধনদের বাড়ির রেশন কার্ডও এনেছে। ওরা বর্ধনের বাড়ি দখল করেছিল। 'বিজয় দিবসে' ছেড়ে এসেছে। শুনলাম রাজা মিয়াকেও চোখ বেঁধে জুরাইনের কাছে নিয়ে কোতল করেছে। মবিনেরও খোঁজ পাওয়া যায় নি আর। কোথায় আছে কে জানে? যারা চালাক তারা আগেই সরে গিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সাধনা ঔষধালয়ের কাছে এক অবাঙালী পূর্ণবাবু-সুধীর বাবুদের সব জিনিস পত্র নিয়েই ভেগে গিয়েছে। পাড়ার প্রবীণরা একজনকে অনেক কষ্টে এ. আই. জি. হাকিম সাহেবকে ধরে (তিনি সেদিন গেণ্ডারিয়ায় ছিলেন) জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষা করলেন। সেদিন আমি দোলাকে নিয়ে হেনরীর বাসায় ফেরত গেলাম।

১৯ তারিখে সকালেই সুরাইয়ার বাসায় হাজির , আমি একাই তার বাসায় গেলাম।

সুরাইয়ারা গতকাল গেণ্ডারিয়া থেকে পোস্তগোলা দিয়ে জুরাইন হয়ে টিকাটুলী দিয়ে ধানমণ্ডী ৩ নম্বরের বাসায় এসেছে। আমার খবরের সঙ্গে সুরাইয়ার দেখার মিল ছিল। আসার পথে সুরাইয়ারা জুরাইনের ওখানে দেখেছে এদিক ওদিক লাশ ছড়িয়ে পড়ে আছে। এগুলো যে সব দালাল, রাজাকার বা আল-বদর ছিল, তা নয়। ব্যক্তিগত ক্রোধ, পারিবারিক ঝগড়াও একটা কারণ হতে পারে। যে সব বাড়িগুলো পঞ্চাশ সালে বিহারীরা দখল করেছিল, সে বাড়িগুলো এখন বাঙালীরা পেয়েছে। সুধীর বাবুর বাড়ি যারা এপ্রিলে দখল করেছিল, তারা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যাবতীয় আসবাবপত্র, ফ্যান ও পূর্ব পুরুষের বাসনকোসন সব নিয়ে বাড়ি সাফ্ করে চলে গেছে। এদিকে আমার একাত্তরের দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা তার ভাড়াটে ফ্লাট ছেড়ে দিলু রোডে পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর বাড়ি দখল করে বসে আছে। হয়ত তার উপর ভার দিয়ে যুদ্ধ লাগার আগে শেষ ফ্লাইটে সেই ব্যবসায়ী পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিল। এ সময়ে কে ভালো কে মন্দ বোঝা গেল।

২০শে ডিসেম্বর হেনরীর বন্ধু ডেভিড আমাদের লাঞ্চে দাওয়াত দিলো। আমরা যখন যাদের বাড়ি থাকি তাদের সঙ্গেই দাওয়াত খেয়ে বেড়াই। অবশ্য এটা দাওয়াত খাওয়ার সময় নয়। কিছু দিন আগে, বোধহয় নভেম্বরের শেষে হেন্‌রীর কোয়েকার বান্ধবী Joie–র বাসায় ডিনার খেয়েছিলাম। Joyie বলে ছিল ফিলাডেল্‌ফিয়াতে একটা স্কলারশীপ দিয়ে আমাকে ও দোলাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার যে পাশপোর্ট তাতে আমি যেতে পারবো না। হাকিম সাহেব জানিয়ে ছিলেন এ পাশপোর্ট থাকলে আমাদেরকে ওরা এ্যারেস্ট করবে। একটাই পথ আছে, পালিয়ে বর্ডার পার হয়ে ওপারে যাওয়া। তবেই যেতে পারা যাবে। Joyie যখন টিকিট নিয়ে দিল্লী আসে তখন আমাদের বিজয় হয়ে গেছে।

২২ বা ২৩ তারিখে সুরাইয়ার সঙ্গে আমি গেলাম জগন্নাথ কলেজে। কলেজ তখনও খোলেনি, মানে ক্লাস হয় না। এমনি ঘুরে দেখতে গেল সুরাইয়া। ও দর্শন বিভাগে পড়ায়। পুরানো বিল্ডিংয়ে দোতলায় উঠে বারান্দায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দারোয়ানের সঙ্গে সুরাইয়া কথা বলে নীচে নেমে আস্‌ছে, আমিও। আমাদের সঙ্গে পেছন পেছন নামছে একজন ময়লা লুঙ্গিপরা, ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি গায়ে একজন মাঝবয়সী লোক। তাইতো! এ লোক তো নীচে থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। আমরা নীচে নেমে ভাবছি কোথায় যাব। সুরাইয়া জানে এখানে একটা ঘরে লোক ধরে এনে অত্যাচার করা হতো। ওদের এক সহকর্মীর ভাইকে ধরে এনে ছিল এখানে। সেই সহকর্মীর স্বামী ছেলেটিকে ছুটিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, "সেই ঘরটার যাবেন না, আপা?" ভাবলাম লোকটা কি স্পাই, না পাগল? বললাম, "কোন ঘরটা?" সে বললো, "যেখানে সবাইকে ধরে এনে মেরেছে?"

শিউরে উঠলাম, "আপনি কে?" বললো, "আমি আপনার একজন অভিভাবক। আমার মেয়ে মালতী আপনার স্কুলে পড়তো। আমাকেও এখানে এনেছিল। কেমন করে যেন বেঁচে গেছি।" তখন লোকটির দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। গায়ের রং ফর্সা, তার মধ্যে কালি মেখে যেন থিয়েটারে ষ্টেজে উঠেছে, মুখ গোল চেপ্টা। কোথায় মালতী? তার কি হয়েছে? সে কি নেই? মালতীর বাপ এই নির্জন পুরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন? সে কি পাগল? তখন তাকে বললাম, "আমাদের সে ঘরে নিয়ে চলেন।"

গেটে ঢুকে বাঁ দিকে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার তারপর একটু বাগান। তার পরেই তৈরী হয়েছে লম্বা দোতলা বিল্ডিং। আমরা ফিরে এসে নতুন বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির কাছে এলাম। লোকটি আমাদের নীচের তলার সেই 'লাল ঘরে' নিয়ে গেল। দক্ষিণ দিকে সরু বারান্দা দিয়ে গেলাম। দরজায় তালা ছিল না। লোকটি ধাক্কা দিলে দরজা খুলে গেল। বড় ঘর, কিছু বেঞ্চ হাইবেঞ্চ এলো মেলো, ছড়ানো ছিটানো। মেঝেতে রক্ত, বেঞ্চে রক্ত, হাইবেঞ্চেও রক্তের ফুলঝুরি। সব চাইতে বীভৎস মনে হলো, বোধহয় এক দুর্ভাগাকে বেয়নেট বুকে বিঁধিয়েই তুলে নিয়েছে – তার হৃৎপিণ্ডের তাজা রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে পূর্বের দেয়ালে অনেক উঁচুতে লেগেছে। রক্তের ছিটা তারা বাতির মত ছড়িয়ে রয়েছে দেয়ালে। অভাগার হৃদয়ের রক্ত

প্রবাহের গতি মন্দা হয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে হাই বেঞ্চে – বেঞ্চের উপর দিয়ে তার বুকের কাছে-নেমে জমে গিয়েছে রক্তের ফুলঝুরির ধারা। সেখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। আমরা নীরব দর্শক। আমাদের গাইড সেই মালতীর বাবা তবুও ও বললেন, "দেখেন আপা। লাশ টেনে হেঁচড়ে নিয়েছে দরজা দিয়ে, তারপর সরু বারান্দা দিয়ে মেইন সিঁড়ির কাছে।" সেই একফুট প্রায় মোটা রক্তের দাগ ক্রমেই সরু হয়ে সিঁড়ির কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সেখানে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। আমাদের গাইডের প্রত্যক্ষদর্শীর মতো বলার হয়তো অনেক কিছুই ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করিনি, তাই বলতে পারেনি তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা। আমরা নীরবে এসে গাড়িতে উঠলাম। লোকটি দু'হাত জোড় করে আমাদের নীরব বিদায় দিল। আমার মাথা ঠিক ছিল না, গলা শুকিয়ে কাঠ। থু থু দিয়ে গলা ভিজাতে চেষ্টা করলাম। থু থুও যেন শুকিয়ে গিয়েছে। সুরাইয়ার বাসায় গিয়ে চা খেয়ে গলা ভেজালাম।

এ দৃশ্য দেখার কথা আমার মেয়েকেও বলিনি। দিনে রাতে মালতীর বাপের চেহারা চোখে ভেসে উঠছে। মালতী কোথায়? কেমন আছে? বেঁচে আছে কি? কেন আমি মালতীর কথা, তার পরিবারের কথা আমাদের গাইডকে জিজ্ঞেস করিনি? সে কি আমার কাছে গার্জেন হিসেবে, মেয়ের বাপ হিসেবে মনের দুঃখ বলতে চেয়েছিল? সে কি অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল? আমি কেন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি? আজ ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে ভাবছি সেদিন বোধহয় আমার মাথা খারাপ ছিল। আমি অস্বাভাবিক ছিলাম।

বিজয় হল – আনন্দ নেই, রাতে ঘুম নেই। প্রেসার বেড়ে গেল, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। হেনরীর বাসায় মন টেকেনা। শুধু বাইরে ঘুরে বেড়াতে মন চায়। কোথায় কি হয়েছে জানার অদম্য আগ্রহ। যাদের ধরে নিলো মাটিমাখা গাড়িতে, তারা কোথায় গেল? তাদের আত্মীয়স্বজন পই পই করে খুঁজেও হদিস পাচ্ছে না। এখন শুনছি শুধু ১৪ তারিখেই নয়, ১১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের রাতেও পিশাচদের হত্যা, নিধন চলেছিল রায়েরবাজারের ইটখোলায়, মীরপুরের রাস্তার ধারে, খেতের খাদে-খন্দে। নটরডেম কলেজের কাছাকাছি খালের ধারে ১৮ই ডিসেম্বরে পাওয়া গেছে কত যে লাশ। রায়েরবাজারেই পাওয়া গেছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডাক্তার দু'জনকে – একজন হার্টের ডাক্তার ডঃ ফজলে রাব্বি, যিনি ১৯৬৯ সালে আমার হার্টের চিকিৎসা করেছিলেন, আরেকজন চোখের ডাক্তার ডঃ আলীম চৌধুরী, যিনি পুরানা পল্টনে সুরাইয়ার মায়ের বাড়িতে সপরিবারে ভাড়া থাকতেন। নীচের তলায় ছিল তাঁর চোখের ক্লিনিক। সেখানে সপরিবারে আলবদর লীডার মওলানা মান্নান আশ্রয় নিয়েছিল। আসলে ডাক্তার চৌধুরীর কার্যকলাপে নজর রেখেছিল। এদের দু'জনকেই একই তারিখে একটু সময়ের হেরফের-এ একই ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে নিয়ে অত্যাচার করে রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে একই প্রক্রিয়ায়

হত্যা করে। দু'জনের বুকে অনেক বুলেটের ছিদ্র আর মাথায় কপালে বেয়নেটের ক্ষতচিহ্ন ছিল। পাষণ্ডদের কী আক্রোশ ছিল তাঁদের প্রতি। একটি নয়, দুটি নয় – কত বুলেট খরচ করেছে অযথা। (এঁদের লাশ দেখে বা না দেখে কতজন কতই না রঞ্জিত গল্প তৈরী করেছে। তাঁদের শোকাহত স্ত্রীরা মৃতদেহ না দেখলে সত্য ছবি আমরা পেতাম না।) সেদিন শুনেছি চোখের ডাক্তারের চোখ উপড়ে ফেলে চোখের উপর রেখেছিল। আর হার্টের ডাক্তারের হার্ট বের করে বুকের উপরে রাখা হয়েছিল। মানুষের কল্পনাও কত বীভৎস হতে পারে। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য–কাহিনী শুনে চলে গিয়েছিলাম আমার পরিচিত গেণ্ডারিয়ায়। স্কুলে ছাত্রী নেই, তবুও ছেলেদের কিচির–মিচির। হ্যাঁ, এতদিন পর মনে পড়ছে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন। শিক্ষিকা কৃষ্ণা থাকতো ফরাশগঞ্জের এক গলিতে, ভাগ্যিস ২৫শে মার্চের রাতে ওদিকে হামলা হয়নি। ওরা তাই পালাতে পেরেছিল। ওর স্বামী না নন্দাই জুট রিসার্চে চাকুরী করতো ? ওরা পালিয়ে ওখানকার কোয়ার্টারে ছিল আট ন' মাস। শাঁখা খুলে সিন্দুর মুছে। ওকে দেখে এত খুশি হলাম। বললাম, "কৃষ্ণা তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? সবাই ভালো আছো তো?"

কৃষ্ণা বললো, "ছিলাম লুকিয়ে। জুট রিসার্চের একজনের খালি কোয়ার্টারে। পাশেই ছিল আরেকটি হিন্দু পরিবার। মুসলিম পরিবারও ছিল কয়েকটি। আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। এখন আমরা কলাবাগানে বাসা নিয়েছি। এখন ওখান থেকেই আজ এসেছি।"

আমি বললাম, "থাক্। আর আসতে হবে না। স্কুল খুললে এসো। তোমার জন্যে আমরা অনেক চিন্তা করেছি। আমাদের না জানিয়ে ভালোই করেছ। সেই পুতুলওয়ালা বাড়ির স্মৃতি লেখা –রা কোথায় আছে জান কি?" কৃষ্ণা এখন ফরাশগঞ্জের খবর জানে না।

কেরানী সাহেব বজলুল রহমান রোজই এ বেলা ওবেলা স্কুলে আসেন। তাঁকে বললাম, "এখন তো ক্যাম্প এখানে, তবুও স্কুল তো আমাদের। লুটের মাল উদ্ধার করে এখানে এনেছে। আবার যেন লুট না হয়। বীরবল দারোয়ানকে বললাম লক্ষ্য রাখতে। মিটিং হলে মালগুলো পুরনো বিল্ডিংয়ের দোতলায় তুলতে হবে। ক্লাসরুম খালি করতে হবে।" ১৯ তারিখে শুনলাম মুক্তিযোদ্ধা একটি ছেলে আমার অফিসে দরজার কাছে বারান্দার গুলিতে না রিভলভারে মারা গেছে। জিজ্ঞেস করলে কেরানীসাহেব ও দাইরা বর্ণনা দিল ঃ "লালু বলে ছেলেটি মারাই গেছে। সে ইস্ট এণ্ড ক্লাবে বল খেলতো। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এই খানটায় (জায়গা দেখিয়ে) বন্দুকের কারসাজি দেখাচ্ছিল। অন্য বন্ধুদের হাতে ও রিভলবার ছিল। কাছেই এই বেঞ্চিতে একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় তার ছোটভাইয়ের সঙ্গে বসেছিল।" "তারপর? তারপর কি হলো"? "কেমন করে যে কি হলো, আপা! একটা গুলি ছুটে লালুর গলা দিয়ে মুখের সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা চিৎকার করে উঠলো, 'আরে! আরো এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল।' তখনই বন্ধুরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। লোহার পুলে যেতে না যেতেই লালু শেষ হয়ে গেল, ওর বন্ধুদের সেকি কান্না!"

বললাম, "তারপর কি হলো?" "তারপর বন্ধুরা লালুকে শহীদের সম্মান দিলো।

যেখানে যাই শান্তির জন্য, সেখানেই দুঃখ পাই। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই ১৫ তারিখে ফিরে এসেছিল। ডাক্তার ওয়াহিদ বলেছেন উয়ারীতে তারা ১৫ তারিখে ফিরে এসেছে। সে রাতে রটেছিল বিহারীরা শহরের দিকে হামলা করতে আসছে। আসলে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় – উল্লাস করতে করতে পাড়া সচকিত করে আসছে। উয়ারীর বাসায় বার/তের তারিখে ডাক্তার সাহেব মাগরেবের নামাজ পড়ছেন, হঠাৎ একটা বোমা ময়লার স্তূপেই পড়লে, তাঁর হাতের আঙুলে স্প্লিন্ট লেগেছিল। ভাগ্য ভালো, বিশেষ কিছু হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় বাসায় ফিরে বিশ্রাম নিলাম। আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় যেতেই হবে। রাতে শুয়ে 'রাজামিয়া'র কথা ভাবছি। রাজাকে ওরা শেষ করে দিয়েছে। ওদের খুব আক্রোশ ছিল ওর ওপর। এই রাজা অনেককে ধরিয়ে দিয়েছে। আমারও রাগ ছিল ওর উপর। ওর আত্মীয়–বোনদের পরীক্ষায় প্রমোশন না দিলে আমাকে রাস্তা–ঘাটে চড়াও করতো। অথচ এই রাজা–ই ১৭ই নভেম্বর আমাকে সাহায্য করেছে, শেষের দিকে আমার প্রতি রাগ তার জল হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন প্রথম কাজই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলে নেওয়া শিক্ষকদের খোঁজ নেয়া। যাঁদের ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়েছে, তাঁরা হলেন, এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইতিহাসের সন্তোষ ভট্টাচার্য, তারপর অন্য সাতজন হলেন ইতিহাসের গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ডঃ আবুল খায়ের, দুই বন্ধু যাঁরা একই সঙ্গে থাকতেন, আনোয়ার পাশা (বাংলা), রাশীদুল হাসান (ইংরেজীর); বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার মুর্তজা যাঁর বাসায় মে মাসে আমি দু'তিনদিন গিয়েছি), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ সিরাজুল হক খান ও ফায়জুল মাহী। কিন্তু মুনীর চৌধুরী আর মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (দু'জনই বাংলা বিভাগের) এপাড়া ছেড়ে আগেই সরে গিয়েছিলেন। তাঁদেরও সেই ১৪ই ডিসেম্বরে তুলে নিয়েছে – সেই মুখে কাপড় বাঁধা ছেলেগুলো যারা নিজের পরিচয় গোপন করে মুখ ঢেকে এসেছিল। মুনীরকে নিয়েছে তাঁর বাবার বাড়ি থেকে আর মোফাজ্জলকে নিয়েছে তার ছোট ভাইয়ের বাসা থেকে।

এদের সকলের লাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁদের আত্মীয়স্বজন। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীও। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। 'লাশ' বলছি এ জন্যে – তাঁরা কেউ জীবিত থাকতেই পারেন না। শেষ মরণ ছোবল দিয়েছে বিষাক্ত সাপেরা। ডাক্তার মুর্তজার স্ত্রী 'পলা' আজও 'লাশ শব্দটা শুনলে শিউরে ওঠে, বুকে হাত দেয়। কিন্তু 'Dead Body' শুনলে তার এমন প্রতিক্রিয়া হয় না। এই ডাক্তার মুর্তজা ২৬শে মার্চ ভোরে কত লাশ টেনেছেন, আজ তার লাশ কোথায় গেল? এদের অনেকের সঙ্গেই কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের। সন্তোষ বাবু, হাউস টিউটর দোতলায় থাকতেন। তখন আমার স্বামী একতলার বাসিন্দা। আমার ৪/৫ বছরের মেয়ে সন্তোষ বাবুর ইজি চেয়ারে শোওয়া ভূঁড়ির উপরে বসে দুলতো আর

বলতো, "জ্যেঠুর ভুঁড়িতে দুলতে কি ভাল লাগে।" তাঁর স্ত্রীকে ডাকতো 'মানি'। ওকে ৩ বছরের রেখে বিলেতে পড়তে গিয়েছিলাম। ওদের স্নেহ মমতায় আর আমার বৌদির আদরে পুষ্ট হয়েছে দোলা। আমার মেয়ে মার্চের ১৬ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে যে বীভৎস স্বপ্ন দেখেছিল তা সব সত্য হয়েছে। হায়রে। সন্তোষ বাবু গরমগরম খেতে ভাল বাসতেন। এটাই তাঁর ভোজনবিলাস। বাড়া ভাত ফেলে তিনি কোথায় চলে গেলেন?

এইতো একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাচ্ছিলেন, খালি পায়ে, আমি ড্রাইভারদের গ্যারাজের সিঁড়ির কাছে দেয়াল ধরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম – মুনীর আর মোফাজ্জল পাশাপাশি যাচ্ছিলেন। আমাকে বললেন, 'কোই, যাবেন না?' আমি বলেছিলাম, "আমি তো, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না?" মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা। বিলেতে আমাকে মোফাজ্জল তিন দিন বাসায় নিয়ে ভাত খাইয়েছেন, একদিন 'বল্‌শয়' ব্যালে দেখিয়েছেন।

এইতো আগস্ট সেপ্টেম্বরে যে ক'দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে গেছি, ততদিন ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকদের রুমে বসে গল্প করেছি। ওঁদের যদি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়, তাহলে কি কি করতে হবে বলেছি। ওঁরা সব কোথায় গেলেন?

ভুতুড়ে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমার মাথাটায় ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। চলে গেলাম সুরাইয়ার বাসায়। ওখানে ঠাণ্ডা হয়ে, দোলাকে নিয়ে হেনরীর বাসায়। ২৫ ডিসেম্বরে এবার আমাদের সাহেব বন্ধুরা বড়দিনের উৎসব করলো না। তাই আমরা জেলীর বাসায় দিন কাটালাম। রাতে হেনরী ড্রিংকস্ ও স্ন্যাকস দিলো। সিস্টাররা ও এসেছিলেন।

২৬ তারিখে তো রবিবার, ছুটির দিন। ঘরে বসে থাকার মন নেই। আরো বন্ধু-বান্ধব, যারা প্রাণের দায়ে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল, তারাও এসে যাচ্ছে। তাদের তো খোঁজ-খবর নিতে হয়। হেনরী ২৯ তারিখে দিল্লী যাবে জানালো। আমাদেরও বললো, "তোমরা আত্মীয় আপনজনদের দেখে আসতে পারো। যাবে কলকাতায়? এখন তো আগের পাসপোর্টে যেতে পারবে না। স্পেসাল পারমিশন্ নিতে হবে।"জানি, হাকিম সাহেব বলেছেন। সেক্রেটারীয়েটে তাঁর অফিসে যেতে হবে। কিন্তু যাবো কাদের দেখতে? তাদেরই তো আমাদের খোঁজ নিতে আসার কথা। কই! বাপের কূল, শ্বশুরকূলের কেউতো এলো না, আমরা কেন যাবো? দুঃখ পেলাম। সে দুঃখ চাপা দিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হলাম মনে মনে। পরে শুনেছি আমার ভাই পো, বিশু, যশোর শত্রুমুক্ত হলে ওখানে আসতো গাড়ির তেল নিয়ে। আমার শাশুড়ীকে দেখতে যেতে হবে, নিয়ে আসতে হবে তাঁকে। জেলী বলে, "না। তাঁকে আনবেন না। ছেলেকে দেখ্‌তে পেলেন না। এখন এসে কী হবে?" আমি বলি, "মা হয়ে পুত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর শোক তাঁর সহ্য করা অসম্ভব ছিল। উনি থাক্‌লেই আমাদের অসুবিধে হতো। উনি কাঁদতেন, আমরা মা -মেয়ে তো কাঁদি নি। এখনও আমাদের চোখের পাতা ভেজেনা। উনি থাকলে এত সহজে লোকের বাড়ি আশ্রয় নিতে পারতাম না।"

গেলাম সুরাইয়ার বাসায়। ওর মায়ের পুরানা পল্টনের বাড়িটার, যে বাড়িতে ডাক্তার আলীম চৌধুরী ছিলেন, যার নীচের তলায় আলবদর সর্দার মওলানা মান্নান আশ্রয় নিয়েছিল জুলাই মাসের ১৫ তারিখে, সে বাড়ির সমস্যা অনেক। মওলানা তাদের বিপদে সাহায্য করে অে না-ই, বরং ১৬ই ডিসেম্বর শহীদ ডাক্তারের পরিবারে আশ্রয় নিলো। তারপর জয় বাংলা ধ্বনি শুনে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করার আগেই কোন ফাঁকে পালিয়ে বাঁচলো । তারপর তার মালপত্র সব লুট হয়ে গেল। দুয়ারে দুটো গাড়ি ছিল মওলানার (অন্যের গাড়ি), মুক্তিযোদ্ধারা একটা নিয়ে নিলো, আরেকটা হাকিম সাহেব সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন।

আমাদের স্কুলে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হয়েছে, তেমনি ধানমণ্ডি গার্লস্ স্কুল যেখানে পাকিস্তানী জান্তার, ঐ নরপশুদের ক্যাম্প হয়েছিল, এখন হয়তো নিয়তির খেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের হয়েছে। এ রকম অনেক স্কুল, বাড়ি ক্যাম্পে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই হাকিম সাহেব তাঁর শাশুড়ির অনুরোধে শহীদ আলীম চৌধুরীর নিচের তলায় বসবাস করবেন ঠিক হলো। তাতে শ্যামলী চৌধুরীদেরও সুবিধে হবে। সুরাইয়া ও আমি তো এ বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছি কয়েক মাস আগেই, যখন ডাক্তার তাজুল হোসেনের পাঁচ মাসের ফেলে যাওয়া মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিলাম তাজুলের শ্যালকের বাড়িতে। ইস্! কোলের বাচ্চাটাকে ফেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন! যাক, অনেক দুঃখ কষ্টের ন'মাস কাটিয়ে আবার স্বাধীনতা ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি! মন্ত্রীরা ও সচিবরা হয়তো এর মধ্যে ফিরে এসেছেন। ওদের খবর নিতে হবে। বাচ্চাটা বোধহয় এখন আর মা-বাপকে চিনতেই পারবে না, হয়েছিলও তা -ই।

একটি বাচ্চার জন্যে দুঃখ করতে গিয়ে আমার নিজের শোক উথ্‌লে উঠলো। এতো সে শোক নয়— চোখ দিয়ে জলের ধারা বহে না। এ শোক বুকের ভিতরে মোচড় দেয়। সন্তান আমাদের একটি মাত্র মেয়ে। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে, দুজনের মিলে, অনেক। তারা কতজন নেই, কে জানে। বুকের ভিতরটা গরম হয়ে গেল। ফিরে এলাম বইয়ের চিন্তায়। বইগুলোও তো আমাদের সন্তানের মতো।

৩৪ নং রোডের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে। নতুন সুন্দর দামী বইগুলো ডাক্তার তাজুল হোসেনের সিটি নার্সিং হোম থেকে রমনা থানায় চলে গিয়েছিল। তখন ওরা বাড়িটা আলবদরের হেড্ কোয়ার্টার বানিয়ে ছিল। আর কি পাওয়া যাবে সে সব বই? আমি তো জানি যা একবার থানায় যায়, তার অর্ধেকের বেশি হারিয়ে যায়। এখন আমি থানায় গেলেও কোন লাভ হবে না। ওখানে তো আমার পরিচয় নেই। পরিচয় আছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেলের। আর রমনা থানাও তো এখন বাংলাদেশ সরকারের, দুই সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে তো লুট্‌পাটের রাজত্ব। আমাদের কয়েকটা বই যখন 'বলাকা' সিনেমা হলের ফুটপাথে বিক্রি হয়েছে, তখন কি আর কোন বই থানায় পড়ে আছে? কথায় বলে, 'বই চুরি আর ফুল চুরি নাকি চুরি নয়'। হবে হয়তো। আমাদের স্কুলে

একটি বাইরের বালক না বলে ফুল নিচ্ছিল। আমি তাকে চোর বলেছিলাম। সে সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। সে আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললো, "কই। আমাগো গ্রামে তো ফুল ছিঁড়লে কেউ চোর বলে না?"

আমি বললাম, "কোনদিন বইয়ে পড় নি অন্যের জিনিস না বলে নিলে চুরি বলা হয়?" তবু সে নির্বিকার। যাক সে কথা। এরপর থেকে সকালে বা বিকেলে আমি 'বলাকা' সিনেমা হলের ধারে, ঢাকা ষ্টেডিয়ামের নীচের তলায় গোল বারান্দায়, সদরঘাটের মোড়ে পুরানো বই খুঁজে বেড়াই। নতুন বই কোথাও দেখিনে — সেগুলো দোকানে বিক্রি হবে বা হচ্ছে।

ব্রাহ্ম সমাজের 'রাজা রামমোহন' লাইব্রেরীর বইগুলো লুটের পর বিহারীরা ওজন দরে বিক্রি করেছে। তার মধ্যে ভাওয়ালের মহারাজার বাড়ির দানের বইগুলোও ছিল। আমাদের এক পরিচিত ব্যক্তি বেছে বেছে অনেক বই কিনেছিলেন। (পরে আমিও পেয়েছিলাম তার থেকে একখানা বই – 'Dictionary of English Slang', যখন ডঃ সুজাতা রায় বাংলাদেশ দেখতে এসেছিলেন, তখন সেই ভদ্রলোক সুজাতাকে তাঁর স্বামী ডঃ এস. এন. রায়ের (ঢাঃ বিঃ) থিসিসখানা দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনাদের মেয়ে ফুল্লরা যেন এর পরবর্তী অংশটা নিয়ে Thesis করে।' ফুল্লরাও দিল্লীতে Lady Miranda কলেজে ইংরেজী পড়ায়। কথায় কথা বাড়ে, এ শহরে ও অন্য শহরে এক বাড়ির বই 'অন্যবাড়ি চলে গিয়েছে। অনেক শখের জিনিসও বেহাত হয়ে গিয়েছে। অনেক, অনেক কিছু উধাও হয়েছে। তবুও বিজয়ের পরে অনেকে ফিরে পেয়েছে নিজের বাড়ি। অনেকে তা–ও পায়নি। ঢাকেশ্বরী মিলের জেলার সুনীল বসু যেমন পাননি। তিনি টানা সাতবছর কোন না কোন কারণে জেল খাটার পর দেশ স্বাধীন হলে ১৭ই ডিসেম্বর ছাড়া পান। বাইরে থেকে আটা ও তেল আনিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর সারারাত ধরে পিঠা বানিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর জেলের সতীর্থদের সেই পিঠা খাইয়ে বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন, তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এসেও তাঁর বাড়িটা আর ফেরত পান নি।

সব ক্ষতি ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু স্বজন হারানোর ক্ষতি তো ভোলা যায় না। সে ক্ষত নিজের বুকের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্থলে বাসা বেঁধেছে। তেমনি অবস্থা নাঈমার।

নাঈমা জহির আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছে তার বিয়ের পরে। সংসার পেতেছিল গেণ্ডারিয়াতেই। তার স্বামী (শহীদ) জহিরুল ইসলাম প্রগতি বাদী কথাশিল্পী ছিলেন। নিজের কাজ — মানে দলের কাজ, দলের কর্মীদের সাহায্য করে বেড়াতেন। সেই মার্চের সাতাশ তারিখ থেকে কারফিউ ভাঙার ফাঁকে ফাঁকে বন্ধু–বান্ধবরে খবর নিয়ে, সাহায্য করে ফিরতেন। এদিকে ঘরে তাঁর আসন্ন সন্তান–সম্ভবা স্ত্রী। তবুও ১লা এপ্রিল (?) না খেয়ে ঘর ছেড়ে নদীর ওপারে গেলেন পাড়ার বন্ধু মনিরুল ইসলাম বাদল ও অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে। স্ত্রীকে বলে গেলেন ফিরে এসে খাবো। আর তো এলেন না। ২রা এপ্রিল সকাল থেকে জিঞ্জিরায় বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে গোলা–গুলীবর্ষণ হচ্ছিল। তখন হয়তো অন্যবন্ধুদের সঙ্গে

দৌড়ে ছিলেন। হয়তো কিছুদূর গিয়েছিলেন বা যাননি। তিনি বেঁচে থাক্‌লে তার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই খবর পাঠাতেন। নাঈমাকে ফেলে তিনি কি যেতে পারেন? নাঈমারও পশ্চিমবঙ্গে বাবার বাড়ি, স্বামীর বাড়িতে খোঁজ নিলো। এই অবস্থায় বাসা ছেড়ে নারিন্দায় চলে গেল বড়বোনের বাড়িতে। সেখানে তার একটি মেয়ে হ্‌লো খুব সম্ভব ৫ই মে। তার নাম দিলো 'তিতাস',এ ন'মাস বড় আশায় বুক বেঁধে ছিল নাঈমা, তার স্বামী ফিরে আসবে। পাড়ার হিন্দু–মুসলমান পলাতকরা সব ফিরে এলো। পাড়ার মুক্তিযোদ্ধারাও ফিরে এলো। কই! নাঈমার স্বামী তো এলেন না। স্বামীর বন্ধুর কাছে গিয়ে জানলো — সত্যিই জহিরুল আর ফিরবে না। নাঈমা এখনও বলে, "যার সঙ্গে সে চলে গিয়েছিল, তাকে দেখলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনে।"

নাঈমার খোঁজ নিতে স্কুলে গেলাম সেদিন ছিল ২৭ শে ডিসেম্বর সোমবার। গেলাম স্কুল ও গেণ্ডারিয়া পাড়াটার খোঁজ নিতে। প্রথমেই গেলাম আমার কোয়ার্টারে। মাসীমা, স্বর্ণ ভালো। গোপালও এখন স্কুলে থাকে, বীরবল তো আছেই। টমিকে এখন স্কুল পাহারা দিতে হয় না। মুক্তিযোদ্ধারাই পাহারা দেয়। ওরা রাত দশটায় গেটে তালা লাগায়। টমি যেন রিটায়ার করেছে। যে টমি সরস্বতী পূজার আগের রাতে আর ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাতে কোন ফুল গাছের পাতা–ডাল নড়লে 'ঘেউ' করে ছুট দেয়, আর ছেলেরা পড়ি–কি–মরি দেয়াল বেয়ে পালাতে গিয়ে পিছলে পড়ে, সেই টমি নিস্তেজ। কিন্তু প্রকৃতিগত অভ্যাস যায় না। গেট বন্ধ হলে বেশি রাতে বন্দুক হাতে ওরা গেট বেয়ে ঢুকলে টমির সহজাত স্বভাব চাড়া দিয়ে ওঠে। 'ঘেউ' করে বিকট চিৎকার দিয়ে ওদের পা পেঁচিয়ে ধরে। একরাতে এক যোদ্ধা টমির পায়ে গুলী করে। টমি বেঁচে যায়। সেই থেকে টমি লম্বা চুল ওয়ালা ছেলেদের দেখতে পারে না। এখন দিনের বেলায়ও স্কুলের ভেতরে ওদের পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

রহমান সাহেব জানালেন, "মিতা চক্রবর্তীরা ফিরে এসেছে। ওরা সবাই বেঁচে আছে, ভালো আছে।" শুনে আমি গেলাম ওদের বাসায় — সাধনা ঔষধালয়ের কাছে। মিতা তখন আমার স্কুলে পড়ে। ওর বাবা হেমেন্দ্র চক্রবর্তী সরকারী স্কুলে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। মিসেস আনোয়ারা বাহারের সময়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মিতারা তিন ভাই দুই বোন। ওরা বড়দা, বড় বৌদি, বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবেন ২৮শে মার্চ? সেদিন সকাল থেকে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে খবর, 'আজ সাধনা, আক্রমণ করবে'। ২৭শে রাতে লোহার পুলে এগারজনকে ব্রাশ্‌ফায়ারে মেরেছে। তাই গেণ্ডারিয়ার হিন্দুরা বেশি আতঙ্কিত, দিশেহারা হয়ে অন্যের আশ্রয়ের আশায় এ বাড়ি – ওবাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মিতারা দুবোন ও বড় বৌদি আশ্রয় পেল এক জনের বাসায় যার ছেলেরা পালিয়ে যাচ্ছিল। বল্‌লো, "আমরা চলে যাচ্ছি। আমার বুড়ো আব্বা থাক্‌বেন। আপনাদের মেয়েদের থাকতে কোন অসুবিধে হবে না।" ওখানে একদিন থেকে ওরা কাইয়ূমের বাসায় উর্দু রোডে গেল। ওখানে দু'দিন থাকার পর সোওয়ারী ঘাট দিয়ে কাইয়ুম ওদের নদী পার করেছিল। তার দু'দিন পরে নদীতে

গোলাগুলি হবার সময় মিতার বড়দা সন্তোষ চক্রবর্তী তো দুশ্চিন্তায় অস্থির। কাইয়ুম—সেই ঢাকাইয়া ছেলেটি—ওপারে খবর নিয়ে জানালো তারা গোলমালের সময় জিঞ্জিরা থেকে আরো দূরে চলে যেতে পেরেছে। সন্তোষ বাবু বললেন, "আমিও দনিয়া ছিলাম। বাবা বাড়ি ছেড়ে গেলেন না। সাধনার যোগেশ চন্দ্র ঘোষকে মারার পরে বাবাকে আমি নিয়ে গেলাম। পরে আমরা সবাই একত্রিত হয়েই আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়িতে ছিলাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনি কি যোগেশ ঘোষ মশায়ের মৃতদেহ দেখেছিলেন?"

তিনি বলেলেন, "না"। আমি বললাম, "তিন চারদিন পড়ে ছিল এবং আমাদের স্কুলের দাইরা গিয়ে দেখেছে। বেচোর মা-ও দেখে এসেছে। আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে ঠ্যালা গাড়িতে তো ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির লোকরা লোহার পুলের দিকে নিয়েছে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তখন তো পোস্তগোলা দিয়ে যাত্রাবাড়ী যেতে হতো। পোস্তগোলা শ্মশানে তো তখন মড়া পোড়ানো যেতো না, মিলিটারীরা দখল করে ছিল। চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন সাহেব এ বিষয়ে ভালো জানবেন। তিনি তো এখন এখানে নেই।" কেন? তিনিও কি গা ঢাকা দিয়েছেন? তিনি তো ভালো লোক ছিলেন। তিনি সাহায্য না করলে পাড়ার জোয়ান ছেলেরা কি একটাও থাকতো? এখন আমি বুঝতে পারছি কেন লোকের বাড়ির দরজায় উর্দু ভাষায় সুরা বা কোন বাণী লেখা থাকতো। গাড়ির কাচে উর্দুতে কি সব লেখা থাকতো। যারা বেপরদা চলতো তারাও বোরখা পরতো, নয়তো বিশেষ রকমের চাদর দিয়ে আব্রু বজায় রাখতো। গেণ্ডারিয়া পাড়াতেই নাকি আমার স্কুলের কাছে বসন্তের দোকানের মোড়ে (এখন কেউ বসন্তের চেনে না, বসন্তের দোকানও নেই, দোকানের নাম লেখা কখনও ছিলনা।) কারা সব ২৭শে মার্চের পরে পাকিস্তানের কল্যাণ কামনা করে ঘটা করে মিলাদ পড়েছিল।

২৮শে ডিসেম্বর আমি বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় আবার টহল দিলাম। জগন্নাথ হলের অফিস এখন রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে। গোপালরা হলের এ্যাসেম্বলী বিল্ডিংয়ে প্রভোস্টের অফিসে কাগজ-পত্র খুঁজতে আসে। ভারতীয় সৈন্যদেরও একটি অফিস চলে বিল্ডিংয়ে। বিদ্যুৎ যোগাযোগতো বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ২৫শে মার্চ থেকেই। ভারতীয় সৈন্যরা অনেক বৈদ্যুতিক তার নিয়ে এসেছে, তাই আলো জ্বলছে, পাম্পের পানি পাচ্ছে। আমার ৩৪-এ নম্বরের ফ্ল্যাট তো অন্যকে দিয়ে দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই এ দিকটায় আর গেলাম না। উদয়ন স্কুলের পাড়ায় গিয়ে দেখলাম পাঁচটি পরিবারের কেউ ফিরে আসেনি ফ্ল্যাটে। গোপালের কাছে খবর পেয়েছি রেজিস্ট্রার নুরুদ্দিন সাহেব ভারতীয় মিলিটারী প্লেনে সন্তোষ বাবুর একমাত্র ছেলে পিন্টুকে (প্রদীপ) আনার ব্যবস্থা করছেন। মেয়ে বুলুও তার মা এখনও রেজিস্ট্রার সাহেবের সঙ্গেই আছে। লিলি চৌধুরী ফেরেনি। গেলাম বৃটিশ কাউন্সিলের পাড়ায় ১৪ নম্বরে। মোফাজ্জলের স্ত্রী দুই বাচ্চা ছেলে নিয়ে ফেরেনি বাসায়। ফিরবে কেমন করে? দুটি বাচ্চা ছেলে নিয়ে ফ্ল্যাটে একা থাকবে কেমন করে? ঢুকলাম ডাক্তার মূর্তজার

বাসায়। মে মাসে শেষ দেখা, দোলার জন্যে ঔষধ নিতে এসেছিলাম। পলা শুয়ে আছে। ঘরে যারা আছে তাদের সবাইকে চিনিনে। ওরা তো বি. ডি. আর, পুলিশের কাছে হন্যে হয়ে ঘুরছে। খবর কারোর তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই যে ১৫ তারিখে এপাড়ায় বোমা পড়েছিল হাসান জামানের বাসায়, তারপরই পলারা বোর্ড অফিসে সালাম সাহেবের কোয়ার্টারে ছিল। ওরা ১৮ তারিখে ফেরত এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। কিন্তু কারোর কোন খবরই পাচ্ছে না। পলা জিজ্ঞেস করেছে মোফাজ্জলের কাজের ছেলেটাকে, "বলতো, তোকে যখন মাটি মাখা গাড়িতে তুললো, তখন তুই গাড়ির ভেতরে ক'জনকে দেখেছিস?" ছেলেটি বলেছিল, "চোখ বান্ধা একজন লম্বা সাহেবকে। তারপর আপনাগো ডাক্তার সাহেবরে তুললো, আমার তো চোখ বাইন্দা ফালাইলো, আমি আর কিছু দেখি নাই।" পলা বললো, "প্রথমে গিয়াসুদ্দিন সাহেবকেই তুলেছে তা হলো।" আমি বলেছি "ডঃ সিরাজুল হক খানও তো নাকি খুব লম্বা ছিলেন? তিনিও হতে পারেন।" পলা বললো, "না! ওনাকে নিয়েছে ১৬ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে যখন ঐ কাজের ছেলেকে ফেরত দিয়ে গেল। গাড়িটা দ্বিতীয় বার ফুলার রোডের গেট দিয়ে ঢুকেছিল।"

পলার কথাই ঠিক হবে। এসবকথা বলতে কী যে কষ্ট। তবুও ওকে বলতেই হচ্ছে! বলাটা হৃদয় বিদারক, জিজ্ঞেস করাও বেদনাদায়ক। তবুও লোকে প্রশ্ন করে, পলাও উত্তর দেয়। পলা আরো বলেছে, " মিতির খেলার শাড়িটা (লাল) দিয়ে মিতির আব্বার চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। সাড়ে তিন বছরের মেয়ে সেদিন সে দৃশ্য বর্ণনা করেছিল। আজ আর সে স্মৃতি মিতির মধ্যে নেই। চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার তাৎপর্য কি, মিতি সেদিন তা বোঝেনি। এরা কোথায় গেলেন? হারিয়ে গেলেন এমন করে। এই ছোট দেশের মধ্যে?

২৮শে ডিসেম্বর ময়না হাসানের (আগাখানী মহিলা) আমিনাবাদ কলোনীর ফ্ল্যাটে জেলী, হাজারী, হেনরী, দোলা, ও আমার দুপুরের লাঞ্চের দাওয়াত ছিল। গিয়ে দেখি ওখানে কয়েকজন বিদেশী সাহেব ও একজন মেম সাহেব। হেনরী আর ওর দুবন্ধু ওদেরকে চিনলো বা আগে থেকে চিনতো। খাবার আগে পরে যে অনেক কথা, হলো তার মূল কথা এখানে ওরা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করবে। সমাজের কল্যাণ তো অনেকভাবে করা যায়। ওরা কি করবেন? ওরা একটা খৃষ্টান দল, 'ছোট পরিবার পরিকল্পনার' থেকে এসেছে। ওরা এখানে আমাদের নির্যাতিতা মেয়েদের চিকিৎসা করবে। প্রয়োজন হলে Abortion করবে। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের দায় থেকে নারীকে মুক্তি দেবে। কিন্তু গর্ভধারণ সাতমাস অতিক্রম করলে তারা abortion করবে না — এটা তাদের ধর্মীয় ও মানবিক বিধিনিষেধ। এরকম রমণীরাই পরে 'বীরাঙ্গনা' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। মনে হচ্ছে এ দলের সঙ্গে একজন ভারতীয় ডাক্তারও ছিলেন, যিনি ওপারেও আমাদের অত্যাচারিত মেয়েদের উদ্ধার করেছেন। এদের নিয়ে ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা চলতে লাগলো। সংগঠনের নামটা বোধহয় "CONCERN" আয়ার্ল্যাণ্ডের।

ময়না হাসান পরে আমেরিকায় চলে গেলেন। এটা যেন তাঁর বিদায়ী আপ্যায়ন, আমার তাই মনে হয়েছিল। তিনি ছিলেন হাসনা হাজারীর (জেলী) বিজনেস পার্টনার। তাঁর এই ফ্ল্যাটটিও জেলীর কাছে বিক্রি করতে চেয়ে ছিলেন। হাজারী রাজী হয়নি। বলেছে, "যে চোখের জল ফেলে এ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে, তার বাড়ি নেওয়া উচিত হবে না।" মনটা আমার ভারী হয়ে গেল। তিনি তো কোন অন্যায় করেননি?

ফেরার পথে বিজয় নগর দিয়ে গুলিস্তান ঘুরে এলাম ইন্দিরা রোডে। বিজয়নগরের মোড়ে এলে আমি হেনরীদের দেখালাম তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িগুলো, যেখানে ভারতীয় নাগরিকরা প্রায় বন্দীদশায় ন'মাস কাটিয়েছে। মে মাসে ক্যাপ্টেন আহমেদ আমাকে দেখিয়েছে। তখন ওরা কোন জানালাও খুলত না। ওদের বাজারও পুলিশরা করে দিতো।

২৮শে বিকেলে আমাদের যাযাবর জীবনের শেষ আশ্রয় ইন্দিরা রোডে হাজারীর বাসায় ফিরে এলাম। ২৯শে ভোরে জেলীকে নিয়ে বিমানবন্দরে হেনরীকে তুলে দিয়ে সোজা গেলাম সেক্রেটারিয়েটে হাকিম সাহেববের অফিসে। সেখানে দেখা হলো একজন ভারতীয় অফিসার, ক্যাপ্টেন(?) ভোরার সঙ্গে। তিনি ছিলেন লিয়াজোঁ অফিসার – Police, Special Branch Military Advisor তিনি গুজরাটি ব্রাহ্মণ হবেন। তাঁর নানী ছিলেন চাটগাঁর খাস্তগীরদের পরিবারের মেয়ে। তাই তার চাটগাঁ ভালো লাগে। সারাক্ষণ পান নয়তো পানবাহার খেয়ে যাচ্ছেন। ভারতে যাবার অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। ভিজিটার রুমে অনেক চেনা মুখ, তরুণই বেশি। ইংরেজীর ছাত্র জিয়া হায়দারও ছিলেন। আমাকে দেখে ছাত্ররা ২৫শে মার্চের রাতের কথা জানতে চাইল। আমিও যেন টেপকরা কথার মত বর্ণনা দিয়ে গেলাম। 'অনুমতিপত্র' পেয়ে চলে গেলাম হোটেল পূর্বাণীতে। তখনও ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্য়ের অফিস খোলেনি। বাংলাদেশের কোন প্লেন নেই তখন। পাকিস্তানীরাতো ৪ঠা ডিসেম্বরের আগেই (১লা ডিসেম্বর?) ওদের প্লেন নিয়ে পগার পার। হোটেল পূর্বাণীতে IAC-র একটি অফিস খুলেছে। ছোট্ট একটি অভ্যর্থনা খোপ। একটি ছোট টেবিলের চারপাশে বসে আছে কয়েক জন মহিলা। একজন সন্ন্যাসিনীর (মতন) পিছনে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী—মনে হলো বাঙালী—ইংরেজীতেই কথা বলছেন। সন্ন্যাসিনী কলকাতা থেকে এসেছেন — আবার চলে যাবেন। মেয়েটি তাঁর গাইড। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। "ইনি কে?" মেয়েটি বললো, "ইনিই মাদার টেরেসা।" আমি যেন স্বর্গ দেখলাম। তাঁর পাশে বসে তাঁর হাত দুটি স্পর্শ করলাম। কী শীতল সে দুটি হাত। পরণে তাঁর দেশী সিস্টারদের মত মোটা সুতি শাড়ি, নীল পাড়ে দুটো নীল ডুরি। মাথায় ঘোমটা টানা। ফুলহাতা ব্লাউজ। মুখের ও হাতের পাতার চামড়া পুরু ভারী বয়সের ছাপ পড়েছে তাতে। মুখে ভাঁজ পড়েছে, হাসলে ভারী মুখে মোটামোটা রেখা ফোটে, মনে হয় শিল্পীর আঁকা। নদীর পাড়ে বালুর চরায় ঢেউ এসে চলে গেলে যেমনটি দাগ থেকে যায়। হ্যাঁ! এই সংসার ত্যাগী মহিলার একটা হোম আছে ঢাকায়। তিনি হয়তো বীরাঙ্গনাদের অবাঞ্ছিত নবজাতকদের আশ্রয় দেবেন।

২১শে ডিসেম্বর গেণ্ডারিয়ার স্কুলে গেলাম ক্যাম্প কেমন চলছে দেখতে। ক্যাম্পের কর্মীরা বেশ সহযোগিতা করছে আমার সঙ্গে। ক্যাম্পের লীডার কবীর, আজিজ ও প্যাটেলকে ডেকে বললাম "দেখ বাবারা, স্কুল আমাদের খুলতে হবে ৫ই জানুয়ারী (১৯৭২)। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর মিটিং হবে। তোমরা আমাদের নীচের ক্লাসরুম, আপাদের ও স্যারদের বসার ঘর দখল করে রেখেছো, এগুলো ছাড়তে হবে। তোমাদের বোনরা-ই তো পড়াশুনা করবে। তোমাদের অফিসের জন্য গেটের কাছে স্যারদের রুমটা দেবো, আর তার দোতলায় লুটের মাল রাখবো। মালিক ফিরে এলে বুঝিয়ে দেবো। স্যাররা সবাই আমার অফিস ঘরে বসবেন কিছুদিন।"

ওরা সবাই আমার কথায় রাজী হলো। তবে আজিজের ঐ এক কথা, "আপা। ২১শে ফেব্রুয়ারীর ফুল যেন ঠিক মতো পাই।" ওদের ভলান্টিয়াররা এসে আবেদন জানালো, "আপা, আমাদের অফিসের ঘরে ও বারান্দায় কিছু দিন থাকতে দিন। আমাদের জন্যে রেডক্রসের সাহায্য আসবে।" আমি হেসে বললাম, "তোরা তো মায়ের কোলে ফিরে এসেছিস। এখন আর পরের সাহায্য কেন নিবি? মায়েরাই তো তোদের সব কিছু দেবেন।" সবাই হেসে উঠলো। প্যাটেল বললো, "আপা, বয়েজ স্কুলের হেড স্যারের নাতি অনু (অনিমেশ) ফিরে এসেছে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। ওরা সবাই বেঁচে আছেন।"

এখবর পেয়ে আমি তখনই গেলাম সুধীর বাবুদের বাসায়। সাধনা ঔষধালয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে গেল। এত বিখ্যাত বৃদ্ধ লোকটিকে তো হত্যা করেছে, তাঁর ফ্যাক্টরীর সব লুটপাট করেছে। এখন আওয়ামী লীগের কর্মী লুৎফর রহমান সাহেব চেষ্টা করছেন ফ্যাক্টরী খোলার। কর্মচারীরা ফিরে এসে কাজ পাচ্ছে না। অথচ এসব ঔষধ হাজার হাজার লোকে ব্যবহার করে। পরের বাড়িটাই অনুদের অর্থাৎ হেড স্যার সুধীর বাবুর। অনুর কাছে শুনলাম পাড়ার সব ছেলেরা, কর্মীরা, প্রবীণরা—সবাই কী খুশি অনুকে দেখে। " আমরা ফিরেছি শুনে কত লোক যে দেখা করতে এসেছে, ভাবতে কী যে ভালো লাগছে। এ ন'মাস কত যে কষ্ট করেছি। সব কষ্ট দূর হয়ে যেন আনন্দে ভরে গেল। আমি একাই এসেছি এখন। বাড়িঘর ঠিক করে পুতুলকে আনবো। পুতুলের বাবা ও জ্যাঠা মশায়কে আনতে দেশে লোক পাঠালাম।"

দেখলাম রাজ ওস্তাগাররা সবাই এসেছে। সব ঘর খোলা শুধু হেড স্যারের কোঠায় তালা দেওয়া। "কেবল তাজ আহমেদ সাহেবের চেষ্টায় দাদুর (হেড স্যার) কোঠাটি অক্ষত রয়েছে, তালা ভাঙতে তিনি দেননি। এমনকি শান্তি কমিটিকেও সে ঘরের চাবি দেননি তিনমাস। ওনার সাহায্য না পেলে আমরা কিছুই পেতাম না। অন্যান্য সব কোঠা, ঘর লণ্ড ভণ্ড। তিন চার পুরুষের বাসন কোসন কিছুই নেই। – যাক্ গে! দুর্গা পূজা না হলে তো আর ওসব বাসন কাজে লাগে না। আর বিয়ে শাদিতে তো ক্যাটারার, নয় তো কমিউনিটি সেন্টার।" যাক! ওদের দুঃখের দিনগুলোতো পেরিয়ে এসেছে, সবাই ফিরে এসেছে নিজের

বাড়িতে। অনু সাধনা ঔষধালয়ে ঘুরে ফিরে দেখে এসেছে। অনু বললো, "তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা আছে। উনি কারোর সঙ্গে মিশতেন না, যেঁচে কথা বলতেন না, বেশি চাঁদা আদায় করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু রায়টের সময় যারাই দৌড়ে আসতো, তারাই আশ্রয় পেতো। দু'তিন দিন নিজে শত শত/হাজার লোককে খাওয়াতেন, যতদিন না সরকার দায়িত্ব নিতেন।"

আমি বললাম, "আমি তো '৬৪ সালের রায়টে আমার ভাইয়ের পরিবার আরও দুই পরিবারের বৌ, মেয়ে ও বাচ্চাদের নিয়ে একটি কোঠায় ২৫ জন ছিলাম ১৩ দিন। তখন দেখেছি উনি দু'পদ মাছও খেতেন না। ওনার একপদ মাছ আমাকে দিতেন তাঁর ঠাকুর।"

অনু বললো তখন দেখেছি সব পুলিশ, মিলিটারীরা প্রতি রাতে এক বোতল ক'রে 'মৃতসঞ্জীবনী সুধা' পেতো। আমাদের একজন মুরুব্বি লোককে ওরা বিনা দোষে হত্যা করলো।"

অনু এত অল্প সময়ে ওদের অভিজ্ঞতার কথা আর কি বলবে। তবুও বললো, "আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করতে পারিনি জীবনযুদ্ধেই ন'মাস কাটিয়েছি, গ্রাম থেকে গ্রামে। শুধু কি ডাকাতি? তার চেয়ে বেশি ভয়ের ছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের হামলা। ওরা যখন গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আমাদেরও এক আস্তানা থেকে আরেক আস্তানায় যাবার হয়রানি। এত দুঃখের মধ্যেও এখন ভাবলে হাসি পায়। বান্দুরায় একদিন দুপুরে সবাই তাস খেলছিলাম বাইরে বসে। এর মধ্যেই কোন দিকে ফুট্‌ফাট্‌ গুলীর শব্দ। অমনি পাড়ার সবাই, যে যেদিকে পারে, সামনে দৌড়। ছিলাম ধলেশ্বরীর পাড়ে, ছুটলাম একদিকে তারপর ইছামতি নদী পেরিয়ে ওপারে। এখন ভাবি কীসব দিন — ভয়ের দিন গেছে?"

আজ থেকে (২৯শে ডিসেম্বর '৭১) আমার ও দোলার আশ্রয় জেলীর বাড়ি ইন্দিরা রোডে। দিনের বেলা বাইরে যাই, স্কুলের কাজও করি। অফিসে যাই, এতদিন যারা ভয়ে ভয়ে কথা বলতেন, তাঁরা এখন হেসে কথা বলেন। কিন্তু আমার স্বামীর কথা তুললে আমি এড়িয়ে যাই। এখন আমার কারো সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। রাতে সকলের ন'মাসের দুঃখের জীবন আলোচনা করি। কিন্তু হেনরী না থাকাতে আর, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গাওয়া হয় না। দায়িত্বের কাজ সবই করতে হচ্ছে। ৩০ তারিখে স্কুলের রেডিও লাইসেন্স করা হলো। স্বর্ণকে দিয়ে মোচার ঘন্ট রান্না করিয়ে নিয়ে এলাম হাজারী সাহেবের জন্যে — হার্টের জন্যে মোচা ভালো। জেলী চেষ্টা করেও শিখতে পারে নি। ওদের বাড়ি ছেড়ে আসার পরে টেলিফোনেই শেখাতাম। যে কাছে থেকে শিখেনি, সে টেলিফোনে শুনে কি করে শিখবে? রিমোট কনট্রোলে এয়ারপোর্টে প্লেন ফিরিয়ে আনা সহজ, কিন্তু জেলীকে নিরামিষ মোচা রান্না শেখানো সহজ নয়।

স্কুল থেকে ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় গেলাম পলারা ডঃ মোর্তজার জন্যে থানা পুলিশ, আই. বি — কত বা খোঁজাখুঁজি করে বেড়াচ্ছে। কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। যাবে

কি করে? নিয়ে গেছে ১৪ তারিখে পাকিস্তান আমলে (দখলদার বাহিনী?)। বাংলাদেশের পুলিশের সাধ্য কি ওদের খুঁজে পাওয়া? বাংলাদেশের মধ্যেই আছে পাকিস্তানের খণ্ড অংশ সেটা হলো মীরপুর—বিহারীদের এলাকা। ওদের তো ভারতীয় সৈন্যরা ঘেরাও করে রেখেছে। আরো আছে বাঙালী পাকিস্তানী, তারা তো ভোল বদলে ফেলেছে। ভয় তো ওখানেই। দেশী ভাইয়েরা মুখোশ পরে অচেনা সেজে বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে গেছে – তারা মুখোশ খুললে তারা যারা তখন দেখেছে, তাদের চিনবে কেমন করে? চুল, দাড়ি, গোঁফ সবই তো বদলেছে। কিছুটা চেনা যায় চোখ দেখলে। কিন্তু ওদের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পেরেছে কে? আপন জনদের অন্তরাত্মা তো তখন ভয়ে কম্পমান। মুনীর চৌধুরী যখন মাটি মাখা গাড়িতে উঠতে ইতস্ততঃ করছিলেন তখন ওরা বন্দুকের মুখটা পিঠে ধরে ছিল, আর মুনীর ভাইয়ের পিঠের পেশী কেঁপে উঠেছিল। ঐ দেখেই তো স্ত্রী লিলি চৌধুরীর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এ দৃশ্য বর্ণনা করতে আজও তার শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে, চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কী নিদারুন অভিজ্ঞতা। কী অসহায় অবস্থা। বিজয়ের দু'দিন আগেও এদেশের মানুষ কত অসহায় ছিল।

৩১ তারিখে স্কুলের মিটিং হয়ে ঠিক হলো ৫ই জানুয়ারী স্কুল খুলবে। লুটের মাল যা মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করে এনেছে, সেগুলো সব পুরানো দালানের দোতলায় রাখা হবে। মালিক ডাঃ বর্ধন ফিরে এলে মাল বুঝিয়ে দিতে হবে। দাইরা সবাই ফ্যান পরিষ্কার করবে। তারপর গুনতে হবে। প্রধান শিক্ষিকা সব স্কুলের সম্পত্তি বুঝে নেবেন। যেসব কর্মীরা স্কুলে থাকে, তারা স্কুল চলাকালীন স্কুলে থাকবে না। এখন রেডক্রসের দান আসছে, সেগুলো আমাকে সই করে নিতে হচ্ছে।

ফেরার পথে সন্তোষ বাবুর স্ত্রীর (বুলুর মা) খবর নিতে রেজিস্ট্রার নুরুদ্দিন সাহেবের বাসায় গেলাম। বুলুর মা বললো, "বাসন্তীদি, আমাকে নিয়ে আমার বাসায় চলুন। একা যেতে কেমন যেন লাগে। চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। সবই ঠিকঠাক আছে, 'কেবল এবাড়ির প্রাণকেন্দ্র' মানুষটি নেই। তাঁর প্রিয় ইজি চেয়ারটা শূন্য পড়ে আছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, " টাকা পয়সা লাগবে কি?" বুলুর মা বললো, "ওনারা তো আমার থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছেন না কিছু।" তখন বুলুর মা ড্রয়ার খুলে ব্যাংকের কাগজপত্র দেখালো। ওনাদের কোন 'জয়েন্ট' এ্যাকাউন্ট ছিল না। ফিকসড্ ডিপোজিটও জয়েন্ট নেই, NITও সন্তোষ বাবুর নামেই। আমি পাশ বই, চেক বই, অন্যান্য কাগজপত্র ঘেটে দেখলাম টাকা তোলার কোন ব্যবস্থাই নেই। বুলুর মা কি তাহলে ধরেই নিয়েছে তার স্বামী আর ফিরে আসবে না? ভাবতে তো পারেই। রায়েরবাজারের ইট খোলায় ছড়ানো ছিটানো অনেক লাশের মধ্যে তো ডাক্তার রাব্বি ও ডাক্তার আলীম চৌধুরীর ক্ষত বিক্ষত লাশও পাওয়া গেছে। কাগজে ছবি উঠেছে, কে না দেখেছে? একজন বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক, তার স্বামী আর 'বাড়া ভাত' খেতে আসবেন না। সে বুঝে নিয়েছে। তার একমাত্র

ছেলে পিন্টু ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ভারতে, ভারতীয় মিলিটারী প্লেনে এসে যাবে মায়ের কাছে। এসেছিলও তাই, তবে একাত্তরে নয়, বাহাত্তরের পয়লা জানুয়ারী। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে যে আটজনকে তুলে নিয়েছে ইয়াহিয়ার শকুন গৃধিনীরা, তাঁরাও ফিরে এসেছেন, তবে জীবন্ত নয়, মীরপুর থানার ট্রাকে চড়ে বাক্সবন্দী লাশ হয়ে। ইয়াহিয়া ভুট্টোর নীল নক্‌শার শিকার এরা। আসন্ন বিজয়ের মুহূর্তে বিহারী বাঙালী আলবদর দোসররা বিষাক্ত সাপের ফণা তুলে মরণ ছোবল দিয়েছে আমাদের মুক্তবুদ্ধির প্রতিভাধরদের।

নীল নক্‌শার রেখাঙ্কন শুরু হয়েছিল একাত্তরে পয়লা মার্চের আগেই —সত্তরের ১৭ই ডিসেম্বর গণভোট বা তারও অনেক আগে উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় থেকেই, কিংবা বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে। ভাষা আন্দোলন প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধিকার আন্দোলনের, তার থেকে রূপ নিয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন। যত আমাদের আন্দোলন তীব্র হয়েছে, ততই ওদের নীল–নক্‌শার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা বুঝিনি তখন। বুঝলে এমন নিরস্ত্র অবস্থায় সমরে নামতাম না। কিন্তু ওরা প্ল্যান করে যুদ্ধে নেমেছে। যুদ্ধ তো নয়, কেবল নিরস্ত্র মানুষকে নিধন। প্রথমে ওদের এলোপাতাড়ি মারা, তারপর বেছে বেছে ধনী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী নিধন শহরে গ্রামে. গঞ্জে, নদীতে, খালে। মিল ফ্যাক্টরীতে দলে দলে তরুণ থেকে প্রবীণদের মেরেছে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে। ডিসেম্বর থেকেই বেছে বেছে তালিকা মিলিয়ে কসাইরা নিয়ে গেছে বুদ্ধিজীবীদের । ১২ তারিখ থেকে ১৫ ও ১৬ তারিখ পর্যন্ত ওদের ছদ্মবেশী গাড়িগুলো পাড়ায় পাড়ায় হানা দিয়েছে বার বার। সকল বাড়ির আত্মীয়দের কাছে জেনে হিসাব করলে দেখা যায় প্রায় দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে তাদের তুলে নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় ডাক্তার মূর্তজাকে, তার আগে একজনকে গাড়িতে চোখ বাঁধা দেখা গিয়েছিল। বিজয় দিবসেও বেলা দশটা পর্যন্ত হায়েনার মত ওরা খুঁজে বেড়িয়েছে শিকার। ওদের আপ্রাণ চেষ্টায়ও পারেনি তালিকার সব কটি নাম মুছে দিতে। ওদের কী আপসোস !

সেই নিদারুণ দুঃখের দিনটির কথা বলি কেমন করে? চৌদ্দ তারিখে যাঁদেরকে তুলে নিল, তারা যখন কেউ ফিরে আসেনি পরের দিন মুস্তাফিজুর রহমানের ভাইয়ের মতো। তাঁরা কেউ জীবিত নেই এ বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হলো। জানুয়ারী ২ তারিখে (১৯৭২) পাড়ায় খবর এসেছে মীরপুর থানা থেকে শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে কিছু লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। আগামীকাল সকালে (৩–১–৭২) নিখোঁজদের আত্মীয় স্বজন সেখানে যেতে পারেন। নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাড়ে আটটায় শিয়ালবাড়িতে অনেকেই গেল লাশ সনাক্ত করতে। ২০ দিন পরে কী করে সনাক্ত করবে লাশ? এতো সাধারণ মৃত্যু নয়, এযে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

আমার বর্তমান প্রতিবেশী ওমর হায়াত সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক —ডাক্তার মূর্তজার লাশ সনাক্ত করতে গিয়েছিলেন। মীরপুর থানায় জীপে আরো

যারা ছিল তাদের মধ্যে সন্তোষ ভট্টাচার্যের ছেলে পিন্টু, ডঃ সিরাজুল হক খানের ছেলে পিয়ারু। আরো অনেকে ছিল হায়াৎ সাহেব আজ ১৮ বছর পরেও সে দুঃসহ অভিযানের কথা বলতে হাঁপিয়ে ওঠেন, কতবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "পুলিশের জীপে প্রথমে আমরা মীরপুর থানায় যাই। সেখানে খোলা জায়গায় ভারতীয় আর্মিরা বিহারীদের ও পাকিস্তানীদের নিরাপত্তার জন্য কর্ডন করে রেখেছিল। থানা থেকে পুলিশের জীপে সনাক্তকারীরা বধ্যভূমির দিকে চললো। মীরপুর দরগার কাছাকাছি যেখানে এখন বুদ্ধিজীবী, স্মৃতিসৌধ তার পাশ দিয়ে কাটা ধানের ক্ষেতের মধ্যে চলে গেছে কাদাময় রাস্তা। আমরা হেঁটে চলেছি। আমাদের সামনে ভারতীয় আর্মি, পিছনে বিডিআর।" তিনি একটু দম নিয়ে বললেন, "আর্মিরা আমাদের বললো, 'খুব সাবধানে আমাদের অনুসরণ কর, আমরা যেখানে পা ফেলি সেখানে পা ফেল। এখানে অনেক মাইন পোঁতা ছিল। আমাদের একজনের একটা হাত উড়ে গেছে। আমরা সব মাইন সরিয়েছি।' আমরা নিঃশব্দে চলেছি। কিছু দূর গিয়ে সৈন্যরা দেখে এলো মাটি খোঁড়া হচ্ছে লোক দিয়ে। আমরা কাছাকাছি —খুব কাছে নয়—গিয়ে দেখলাম, তখনও মাটি খোড়া হচ্ছে। পাশাপাশি দুটা গর্ত ছিল –বোধহয় একটাতে চারজন ক'রে ফেলে ছিল।"

আবার দম নিয়ে হায়াত সাহেব, আমার বর্তমানের পাশের ফ্ল্যাটের নিকটতম সুহৃদ, বর্ণনা দিলেন, "গর্তটায় সবচেয়ে উপরে ছিল ইতিহাস বিভাগের সন্তোষ ভট্টচার্যের কঙ্কাল — হ্যাঁ কঙ্কালই বলা চলে —লুঙ্গি পরা। তারপর মনে হয় ডঃ সিরাজুল হক খানের। তাঁর ছেলে চিনলো কোমরের বেল্ট আর প্যান্ট দেখে।"

আমি ভাবছি পিন্টু তো বাপকে দেখেনি, তবে ওর মা ওকে নিশ্চয় বলে দিয়েছে, তার স্বামীর পরনে শেষ পোশাক কি ছিল। কঙ্কাল দেখে ও চিনতে পারেনি। আমি পরে পিন্টুকে (প্রদীপ) জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কিরে পিন্টু! বাবা চিনলি?" ও উত্তর দিয়েছিল, চিনতে হবে, তাই চিনেছি। মা বলে দিয়েছিলেন।" জানি, মা বলে দিয়েছিলেন। কারণ কোন স্ত্রী সেদিন সেই শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে যেতে পারেনি, কোন মেয়ে তা পারে না।

ওমর হায়াত আবার বলতে থাকলেন, "এর মধ্যে পলার স্বামী ডঃ মুর্তজার শরীরটাই চেনা গিয়েছিল। তার তো ডন-কুস্তি করা পেটানো পোক্ত শরীর। তাছাড়া দু'জনের নীচে ছিল তাঁর লাশটা! তার পায়ে ছিল এক পাটি জুতো, পরনে লুঙ্গি, তাঁর চোখ বাঁধা ছিল তাঁর সাড়ে তিন বছরের মেয়ে মিতির লাল শাড়ি দিয়ে, মনে হচ্ছিল গামছাই বুঝি! বুকে কত যে গুলীর ছিদ্র আর কপালে গায়ে বেয়নেটের দাগ, গোনার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার।" আর কাউকে তিনি বিশেষ করে চিনতে পারেননি। তাঁর কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

তবুও তিনি যা দেখেছেন তার বর্ণনা দিলেনঃ

"ইতিহাসের অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিনকে চেনার তো উপায় ছিল না। যাঁরা সনাক্ত করলেন, তাঁরা বললেন –হ্যাঁ এইতো দারোয়ানের গামছা দিয়ে হাত পিছনে বাঁধা, পরনে

বোনের বর্ণিত ডোরা-কাটা লুঙ্গি, বোনের বোনা সোয়েটার কঙ্কালের গায়ে। উহুঃ কী যে দৃশ্য দেখলাম, দিদি।"

দুই বন্ধু আনোয়ার পাশা (বাংলার) আর রাশীদুল হাসান (ইংরেজী)কে চেনার উপায় না থাকলেও চেনা যায়, তাদের আপন জনের বর্ণনায়। একই ফ্লাটে (৩০ নং) দু'বন্ধুকে একই সঙ্গে পাষণ্ডরা তুলে নিলো একই বাসে। সন্তোষ বাবুর স্ত্রীর মতে 'ওদের দুজনকে নিয়ে, পিন্টুর বাবাকে নিতে এলো। ওদের দু'জনের গায়ে একই রকম চাদর।' ওমর হায়াত বললেন, 'হ্যাঁ, একজনের পরনে লুঙ্গি ও হাওয়াই শার্ট (আঃ পাশা), আরেক জনের পরনে পায়জামা পাঞ্জাবী। দুজনের গায়ে প্রায় একই রকমের চাদর। চেনার উপায় তো এসব দিয়েই।" তিনি আর কিছু মনে করতে পারলেন না।

ইতিহাসের ডঃ আবুল খায়ের তো ১৪ই ডিসেম্বর সকালে বাইরে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলেন শাল গায়ে দিয়ে, শালটাই তাঁর পরিচয় দিয়েছে। আর শিক্ষা ও গবেষণার ফয়জুল সাহেবকেও জামা কাপড় দিয়েই চেনা গেছে। তবে বুকের পাঁজরে যাদের মাংস ছিল না, বা মুখে চামড়া ছিল না, তাঁদের আঘাত দেখা যায় নি। তারা কি অক্ষত ছিলেন? না। তাদের কাকে কতটা অত্যাচার করেছে ঐ নরপশুরা সে শুধু তারাই জেনে গেছেন। তাঁরা আজ সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতির বাইরে, সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় অত্যাচারের উর্ধ্বে।

ওমর হায়াত বললেন, " আমরা ঐ পরিবেশে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমাদের কর্তব্য শেষ হলে পুলিশের জীপ আমাদের পৌঁছে দিল। আর কিছু জানিনে।"

শুনেছি সেদিন বিকেলে আটটা কফিনে করে লাশ ঢাকা মেডিক্যালের মর্গে এসেছে। অনেকে দেখতেও গেছে। পরের দিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় ট্রাকে কফিন এসেছিল। পরে সব কফিন বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের প্রাঙ্গনে রাখা হয়। ডাক্তার মুর্তজার ছোট মেয়ে মিতি দৌড়ে এসে, তার মা 'পলা'কে বলেছিল, 'জানো মা! আব্বুর চেয়ারও ঐ গাড়িতে ছিল। সবাই বলছিল, 'ঐটা ডাক্তার মুর্তজার।" আসলে প্রত্যেক কফিনে চারটা করে হাতল ছিল। মিতিল কল্পনায় এগুলো চেয়ারের হাতল। আজ মিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সাড়ে তিন বছর বয়েসের স্মৃতি তার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এখন তার শোনা কথার স্মৃতি। আর মিতির ভাই নীলিম! তারতো কোন স্মৃতিই নেই, তার যে একাত্তরে জন্ম! সন্তোষ ভট্টাচার্য ছাড়া বাকী সাত জনের দাফন হলো বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের কোনায়। সন্তোষ বাবুর মরদেহ — না গলিত লাশ—গেল পোস্তগোলার শ্মশানে। সঙ্গে গেল জগন্নাথ হলের দারোয়ান ধীরেনদা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার চাপরাসী, গোপাল, দু'জন হাউস টিউটর গোপাল বাবু, ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া (সদ্য প্রয়াত)। একমাত্র ছেলে পিন্টু মুখাগ্নি করেছিল কিনা কেউ দেখেনি। সে শ্মশানেও যায়নি। শ্মশানবন্ধু যাঁরা গিয়েছিলেন

তাঁরাই মুখাগ্নি করেছেন। তারপর তাঁরাই কফিনের ঢাকনা খুলে, হাতল ধরে আগুনে ঢেলে দিয়ে বাকসটি চাপা দিয়ে দিলেন। গলিত মাংস কিছু ছিল তো। সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া সারাক্ষণ ধূপ, কর্পূর ঢেলে হাওয়া সুগন্ধী করেছেন। পিন্টুর মাও শাঁখা ভাঙলেন না। সিঁথির সিঁদুর মুছলেন না। পরে গঙ্গায় গিয়ে ধর্মীয় কাজ করে এলেন।

কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি। একাত্তরের ৩০শে মার্চ থেকে যাযাবরের পথ বেছে নিলাম। গোপাল বলেছে চারদিন লাশ মেডিক্যালের বারান্দায় ছিল। তারপর আর আমাদের সাহস ছিল না মর্গে গিয়ে খোঁজ নেবার। তখন তো হিন্দুরা শ্মশানে যেতেই পারতো না। তবুও বিজয়ের পরে বন্ধু ডাক্তার শহিদুল্লাহকে নিয়ে একদিন মর্গে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করা মাত্র ওরা বলেছিল, "ওঃ অধ্যাপক? হিন্দু? আমরা তাকে লালবাগের শ্মশানে পোড়াই দিছি।"

তখন কি কোন হিন্দুর 'মড়া' লালবাগ কেন, কোন শ্মশানেই পোড়ানো গেছে? জগন্নাথ হলের ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী চিক্‌বালি বলেছে আমাকে, "মা। আমি মর্গের লোকদের বলেছি – এটা আমাদের বাবু। তাকে এখানে কবর দিয়া রাইখো। আমি একটা ক্রস চিহ্নও দিয়া আইছিলাম।" এই তো কিছুদিন আগে ন্যাপের মোনায়েম সরকার —গৌরাঙ্গ প্রসাদ মিত্রের বন্ধু, আমাকে বললেন, তিনি পরে হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছিলেন। হলের ডোম, ঝাড়ুদাররা বলেছে টাকার জন্যে ওনাকে দাহ করা যাচ্ছে না। তখন মোনয়েম বোধহয় চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আমি চিকবালী কে প্রশ্ন করেছি, কোন্‌টা সত্যি — কবর দেওয়া না লালবাগ শ্মশানে পোড়ান?" চিকবালীর এককথা, "সত্য কথা কয়বার কওন যায়?" ওমর হায়াত সাহেব সবশেষে বলে দিলেন, "দিদি। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জেলের সম্বন্ধে বলার আগে এই আটজনের খোঁজ পাওয়ারও কোন উপায় ছিল না, যদি না ঘাতক গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে গিয়ে মীরপুর থানায় আত্মসমর্পণ করতো। ঐ ড্রাইভার আমাদের সঙ্গে ছিল।"

আমি ভাবছি অন্য গাড়ির ড্রাইভাররা কি বিহারী ছিল? না, নৃশংস বাঙালী বেইমান ছিল? জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বাংলাদেশের মাটিতে, নয় আকাশে বাতাসে — পঞ্চভূতে মিশে আছে। তার হৃদয়টা বাংলা দেশের বাঙালী হৃদয়ে মিশে থাক। বাংলার মুনীর চৌধুরী, আর মোফাজ্জলকে যে পাওয়াই গেল না। অনেক সাংবাদিক সাহিত্যিকের লাশও তো খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁদের পেতে হলে সারা বাংলাদেশের মাটি চষতে হতো। নদীতে তো লাশ এক জায়গায় থাকে না। তাদের কংকাল কি তাহলে নদীমাতৃক বাংলাদেশ ছেড়ে নীল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে? অসীম নীল আকাশের নীচে নীল জলে তলিয়ে গেছে? এই কি নীল নক্‌শার পরিণতি?

* * *